প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৫৫

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক
পুলিনচন্দ্র বেরা
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা ৬

শ্রীমান মনোরঞ্জন রায়

শ্রীমান রণজিৎ প্রামাণিক

স্নেহভাজনেষু

আমুখ

১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে যখন আমি 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান' বইটি প্রকাশ করি তখন মনে আশংকা ছিল, বোধহয় বিষয়টি পাঠকপ্রিয়তা লাভ করতে পারবে না। আশ্চর্য যে আমার আশংকাকে অমূলক প্রমাণ ক'রে বইটি তার বিষয়গত অভিনবত্বেই প্রধানত বাঙালী পাঠকের বিপুল সমাদর পায়। সব কটি বিশিষ্ট পত্র পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনায় একবাক্যে সকলের প্রশংসা জোটে। আরও আশ্চর্য যে, এমন এক বর্জিত প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা বই এমনকি বাণিজ্যিক সফলতা পায়। তাই এবারে প্রকাশ করতে উৎসাহিত হলাম বর্তমান বই: 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান'।

হিসেব ক'রে দেখছি এ-বই লেখার প্রস্তুতিপর্ব অন্তত পনেরো বছরের। কেননা এ তো পুথিপড়া বই নয়। এর অনেকটাই সংগৃহীত হয়েছে পায়ে-হেঁটে, ঘুরে-ঘুরে, মুখে-মুখে। বলাহাড়ি বা বলরামী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা প্রথম জানতে পারি ১৯৬৬ সালে, যখন আমি সাহেবধনীদের ব্যাপারে নানা গ্রামে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। কিন্তু যেহেতু সে সময় বলাহাড়িদের উৎসক্ষেত্র ও প্রধানকেন্দ্র মেহেরপুর ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত, তাই তখন সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। কেবল উনিশ শতকীয় বাংলা সাময়িক পত্র 'সোমপ্রকাশ' এবং ১৮৭০ সালে ছাপা অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে বলরামীদের বিষয়ে সামান্য প্রতিবেদন প'ড়ে মন উশখুশ করছিল তাঁদের সম্পর্কে আরও জানতে। হঠাৎ ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক পালাবদলে পূর্ব পাকিস্তান হ'য়ে গেল স্বাধীন রাষ্ট্র, আমিও সুযোগ পেয়ে পরপর দু-বছরে দুবার চলে গেলাম মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ায়। আবছাভাবে জানা কিছু বিবরণ এবারে পেল জলমাটির শুশ্রূষা, বলরামীদের উষ্ণ সংযোগ আর সজীব তথ্যের মেরুদণ্ড। তাঁদের কাছে খবর পেয়ে আমার অনুসন্ধানের বৃত্ত ক্রমশ বড় হতে থাকলো। নদীয়া জেলাতেই 'ঘর হতে শুধু দুই পা' ফেলে পেয়ে গেলাম অভিমানী অথচ বলিষ্ঠ এই প্রতিবাদী সম্প্রদায়কে। সেই বৃত্ত একদশক পরে ছড়িয়ে গেল এমনকি বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার উপজাতি সমাজেও। অনেক অধ্যাবসায় ও ধৈর্যে সংগৃহীত হলো বলাহাড়িদের দুশো-তিনশো গান, তাঁদের অত্যাশ্চর্য জাতিতত্ত্ব আর সৃষ্টিতত্ত্ব, তাঁদের কিংবদন্তী আর রিচুয়াল। দেখা গেল, বলাহাড়িদের মধ্যে স্পন্দমান হয়ে আছে শুধু বাংলার গৌণ লৌকিক

ধর্মের পরম্পরা নয়, সেইসঙ্গে নিম্নবর্গের এক দর্পিত জীবন বিশ্বাস।

বলাহাড়ি সম্প্রদায় বিষয়ে এই বই এমনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু এই রচনা পড়ার আগে আমার লেখা 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান' বইটি এবং 'এক্ষণ' শারদ ১৩৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে' লেখাটি যদি পাঠক পড়ে নেন তবে ভাল হয়। তাতে এমন কতকগুলি তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ আছে যা পুনরুক্তির দোষ এড়াতে প্রস্তুত বইতে দিইনি। তাতে অবশ্য আলাদাভাবে এ-বইয়ের ক্ষতি হবার কথা নয়। কেননা বলাহাড়িদের ধর্ম যেমন একক ও অভিনব তেমনই তাঁদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কিছুটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করা হয়েছে। বলাহাড়িদের গানগুলিও তাঁদের লোকবৃত্তের পরিধি ভেঙে অনেক বড় তাৎপর্যের দ্যোতক হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি ইতিহাস রচনা ও সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় বেশ কিছু বিদগ্ধজন যে নতুন তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন, যাকে বলা হয়েছে 'a series of fragmentary explorations of popular mentality in particular places and at particular times' এবং যার কাজ হলো 'connceted history of the lower classes'-কে তুলে ধরা, সে বিষয়ে আমি সচেতন। বর্তমান রচনায় সেই তত্ত্বের বেশ কিছু ফলিত নমুনাও হয়ত পেয়ে যাবেন অনেকে, কিন্তু আমি প্রধানত ধরতে চেয়েছি বলরাম হাড়ি নামে এক অভিনব ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতিবাদী ধর্মের ধরনকে। বলিষ্ঠ মানবতাবাদী এমনকি মানুষরূপে পুনর্জন্মবাদী এই গৌণধর্ম আমাকে নানা দিক দিয়ে চমকিত করেছে। আরো আশ্চর্য করেছে এঁদের স্পষ্ট বাংলাভাষায় মন্ত্ররচনার চেষ্টা এবং হাড়ি-মুচি-বেদে-বাউড়িদের মত অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের গান লেখার পরম্পরা। এইসব কিছুর মধ্যে দিয়ে একদল নিম্নবর্গের মানুষের অন্তরের যে অনভিলক্ষ প্রতিবাদের ছক আছে পাঠকের কাছে আমি সেই অন্তঃশীল সূত্রটি ধরিয়ে দিতে চাই। সাহেবধনীদের মত বলরামীদেরও আমি স্পর্শ করতে পেরেছি গানের ভিতর দিয়ে। এছাড়া বোঝাতে চেয়েছি বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের নানা জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর ভেতরকার সমাজতত্ত্ব, তাঁদের সৃষ্টিতত্ত্বের বিচিত্র বিশ্বাসের অন্তর্বর্তী উচ্চ-বর্ণবিদ্বেষের গূঢ়তা এবং যৌনসংস্কারের অভ্যন্তরে তাঁদের অসহায় সামাজিক অবস্থানকে। এখন কাজ সাঙ্গ ক'রে লেখকের পক্ষ থেকে অন্তত এমন বিনত দাবী করা বোধহয় সংগত যে, অক্ষয়কুমার দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও দীনেন্দ্রকুমার রায় যে-বলরামীদের বৃত্তান্ত সামান্যমাত্র দিতে পেরেছিলেন তা এতদিনে পেলো তত্ত্বগত রূপ এবং তথ্যগত সম্পূর্ণতা।

বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের কথা প্রথমে খুব সংক্ষেপে আমি লিখি দিল্লীর 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ' সংস্থায় এক প্রকল্প-প্রতিবেদন রচনার সূত্রে, ১৯৭৮ সালে। সেখানে 'মাইনর রিলিজিয়াস সেক্টস্ অব নদীয়া' শিরোনামে জমা-দেওয়া মনোগ্রাফের একটি অধ্যায় হিসাবে বলাহাড়িদের বিবরণ লেখা হয়েছিল। পরে ১৯৮৪ সালে অভিজাত 'এক্ষণ' (শারদ ১৩৯১) পত্রিকায় 'মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে' শিরোনামে আমার লেখা বলাহাড়িদের ঘনিষ্ঠ বৃত্তান্ত পড়ে বাঙালী বিদ্বজ্জন চমকিত হন। প্রধানত তাঁদের অনুকূল প্রতিক্রিয়া এবং বহুশ তাঁদের অনেকের পরামর্শে এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখার জন্য একান্তে প্রস্তুতি শুরু করি।

সুদীর্ঘ পনেরো বছরে নানা অবসরে বলাহাড়ি সম্প্রদায় সম্পর্কে নানা চিন্তা-ভাবনা গড়ে উঠেছে। বিশেষ এই লোকধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত তাত্ত্বিক ও দীক্ষিত গায়ক বলতে যাঁদের সাহচর্য পেয়েছি, গানের সন্ধাভাষার আড়াল ভেঙে যাঁরা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তার মর্ম, তাঁদের অনেকেই আজ প্রয়াত। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় নিশ্চিন্তপুরের পূর্ণ হালদার আর বিপ্রদাস হালদার, ধাওয়াপাড়ার চারুপদ মণ্ডল এবং মেহেরপুরের বৃন্দাবন হালদার। জীবিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহেবনগরের ফণী দরবেশের নাম।

সামগ্রিক অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজে অনলস সাহচর্য, গান সংগ্রহ, অনু-লিখন এবং অন্যতর যেকোন সামান্য প্রয়োজনে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে আমাকে সাহায্য করেছে স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন রায় এবং বর্তমান ছাত্র শ্রীমান্ রণজিৎ প্রামাণিক। মনোরঞ্জন বাংলাদেশেও আমার সহযাত্রী ছিল আর রণজিৎ সম্পন্ন করেছে বিশেষ ভাবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার শ্রমসাধ্য ক্ষেত্রানু-সন্ধান। এই বই যদি কোনো গুণগৌরব দাবী করে তবে তাতে আমার এই দুই ছাত্রের ভূমিকা হবে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বইটি তাই তাদের হাতে উৎসর্গ করতে পেরে ভাল লাগছে।

বইটির তথ্যানুসন্ধান পর্ব থেকে পাণ্ডুলিপি পঠন-পর্ব পর্যন্ত উৎসাহ দিয়ে ও বিচার বিতর্ক ক'রে সাহায্য করেছেন শ্রীঅজিত দাস। পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া প'ড়ে কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ ও সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীঅশোক সেন ও শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়। বাংলাদেশ থেকে একটি মূল্যবান আলোকচিত্র ও কিছু জরুরী তথ্য এনে দিয়েছেন বন্ধু শ্রীমোহিত রায়। হাড়িদের জাতিতত্ত্ব বিষয়ে কিছু নৃতাত্ত্বিক তথ্য জোগাড় করে দিয়েছেন শ্রীতপন সান্ন্যাল। সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ দাস বলাহাড়িদের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন শ্রীসমেন অধিকার। নিশ্চিন্তপুরের আলোকচিত্র তুলেছেন শ্রীসত্যেন মণ্ডল। কিছু গানের প্রেস কপি করে দিয়েছেন স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক শ্যামল রায়। নিশ্চিন্তপুরে গবেষণার পর্বে সংযোগসাধন করে দিয়েছেন সহপাঠী বন্ধু শ্রীনীরেন গাঙ্গুলী। সাহেবনগরে আশ্রয় ও সহায়তা দিয়েছেন পলাশীপাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস। সাহেবনগরবাসী ঐ গ্রামেরই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাসও আমাকে আশ্রয় ও সাহায্য করেন গবেষণার প্রথম পর্যায়ে। সাহেবনগরে গবেষণাসঙ্গী ছিলেন উৎসাহী শ্রীরবি বিশ্বাস। এঁদের সকলের ভালবাসার ঋণ অপরিশোধ্য।

বলাহাড়িদের বিষয়ে পাণ্ডুলিপি রচনা যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে তখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসে পুরানো 'আর্যাবর্ত' পত্রিকার পাতা থেকে বলরাম হাড়ি সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের এক বহু আকাঙ্ক্ষিত অথচ দুষ্প্রাপ্য লেখার জেরক্স কপি পাঠিয়ে সাহায্য করেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায়। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে প্রুফ আনানেওয়ার দায়িত্বপূর্ণ কাজটি হাসিমুখে পালন করেছেন শ্রীআশিস ভট্টাচার্য। সব শেষে ধন্যবাদ জানাই 'পুস্তক বিপণি'-র সাহিত্যমনস্ক নবীন বন্ধুগোষ্ঠী এবং উদ্যমী তরুণ প্রকাশক শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দারকে। সাহেবধনী সম্প্রদায় বিষয়ক বই তিনিই সাহস করে ছেপেছিলেন এক বছর আগে, বলাহাড়ি সম্প্রদায় সংক্রান্ত বইটি ছেপে তিনি সম্পূরক দায়িত্ব পালন করলেন।

সুধীর চক্রবর্তী

প্রসঙ্গক্রম

আঠারো শতকের নদীয়ার ধর্মকেন্দ্র

জেলা মুর্শিদাবাদ

গোপীনাথপুর

পলাশীপাড়া

নিশ্চিন্তপুর

বার্নিয়া

নাকাশীপাড়া

বলাহাড়িদের উদ্ভব ও বিকাশকেন্দ্র
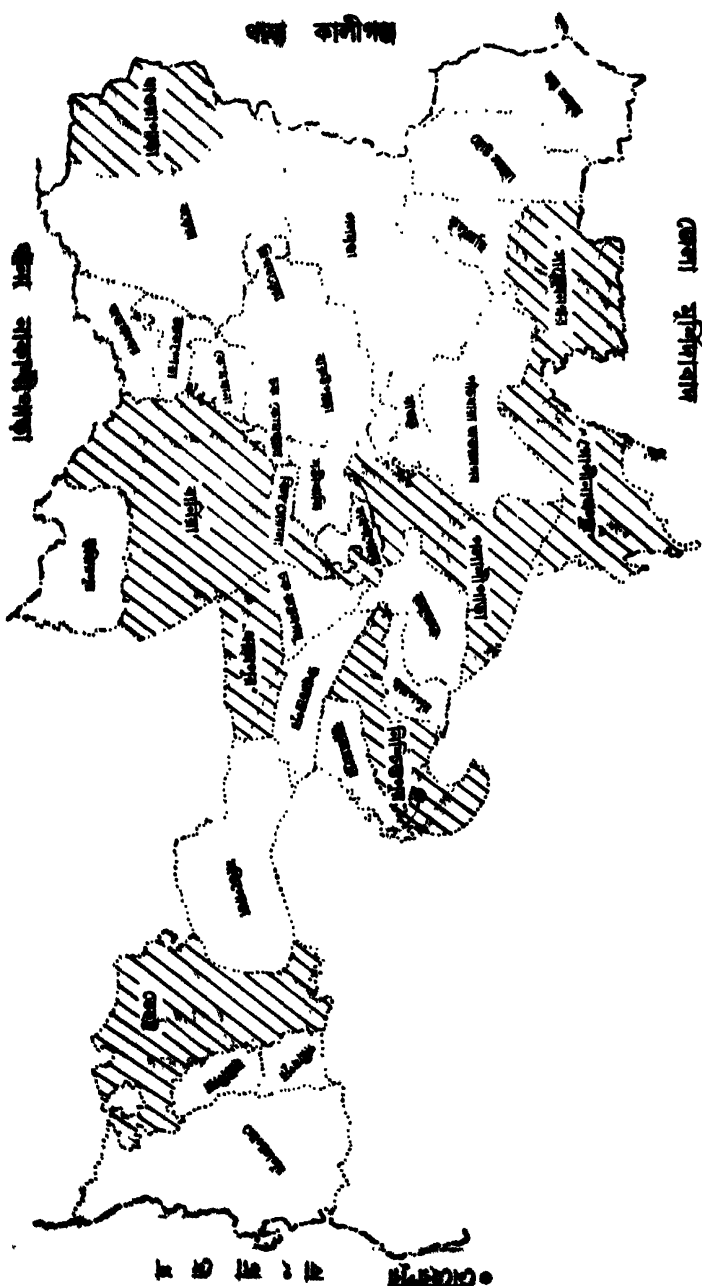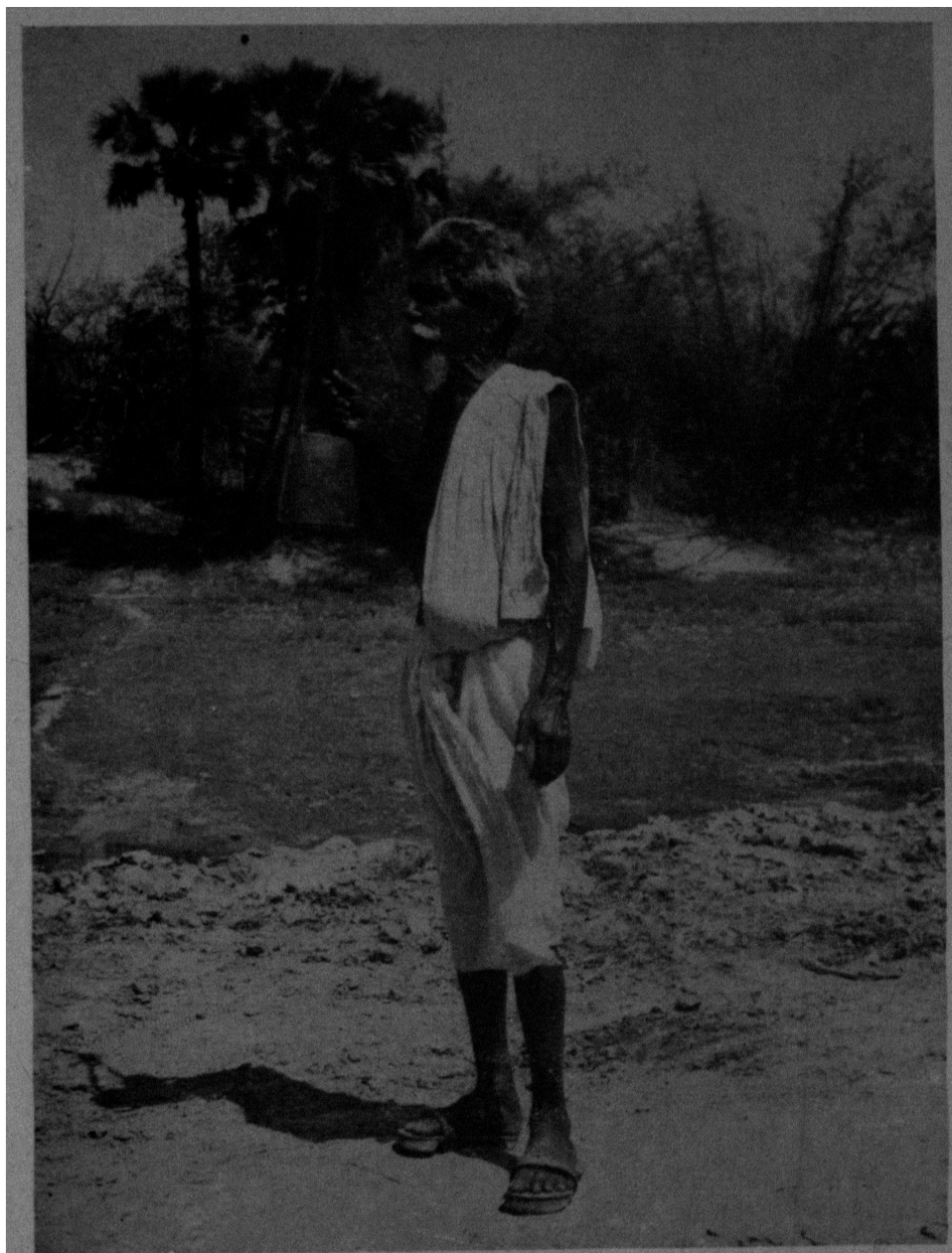
নিশ্চিন্তপুরের বিপ্রদাস হালদার
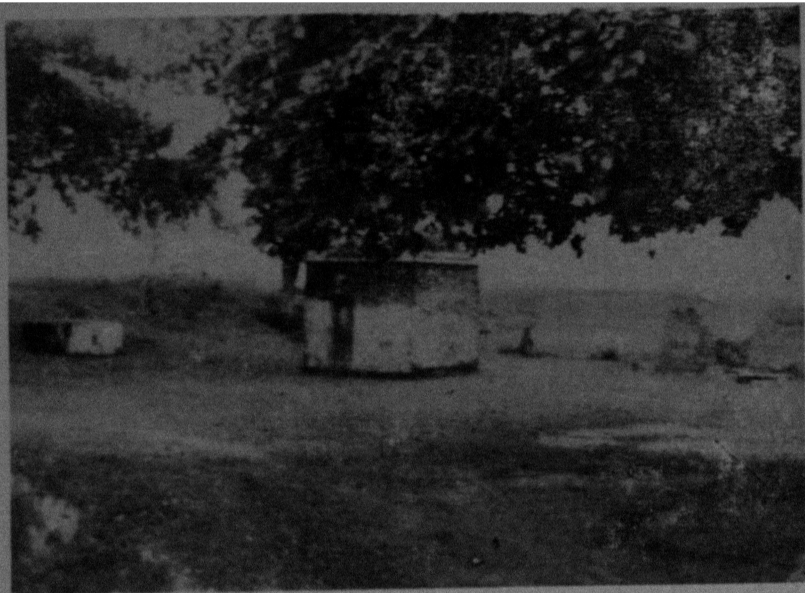
দৌকিয়ারির বলাহাড়ি আশ্রম
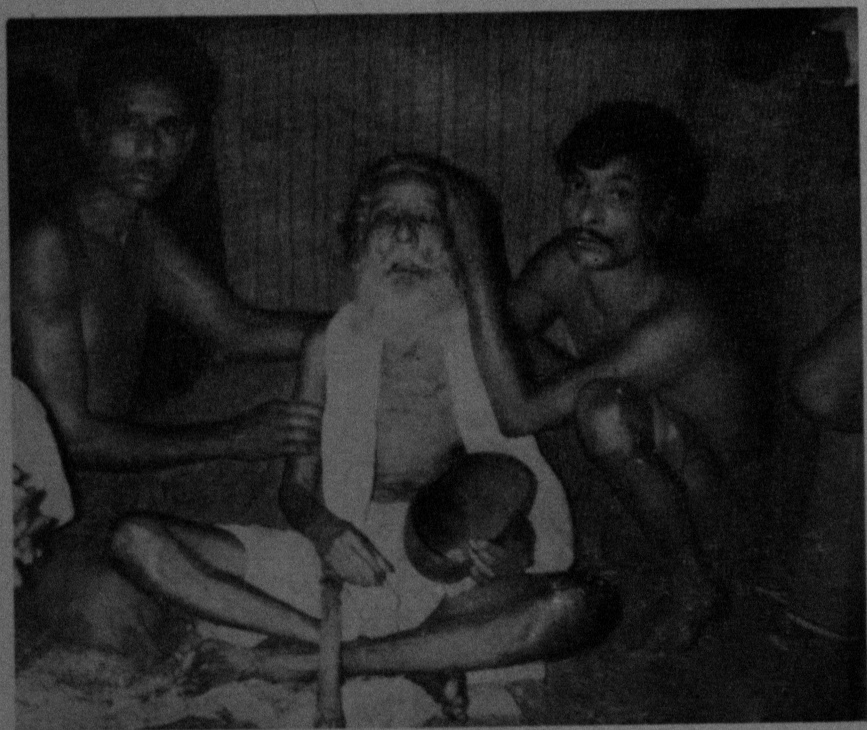
বৃন্দাবন হালদারের অন্তিম মুহূর্ত
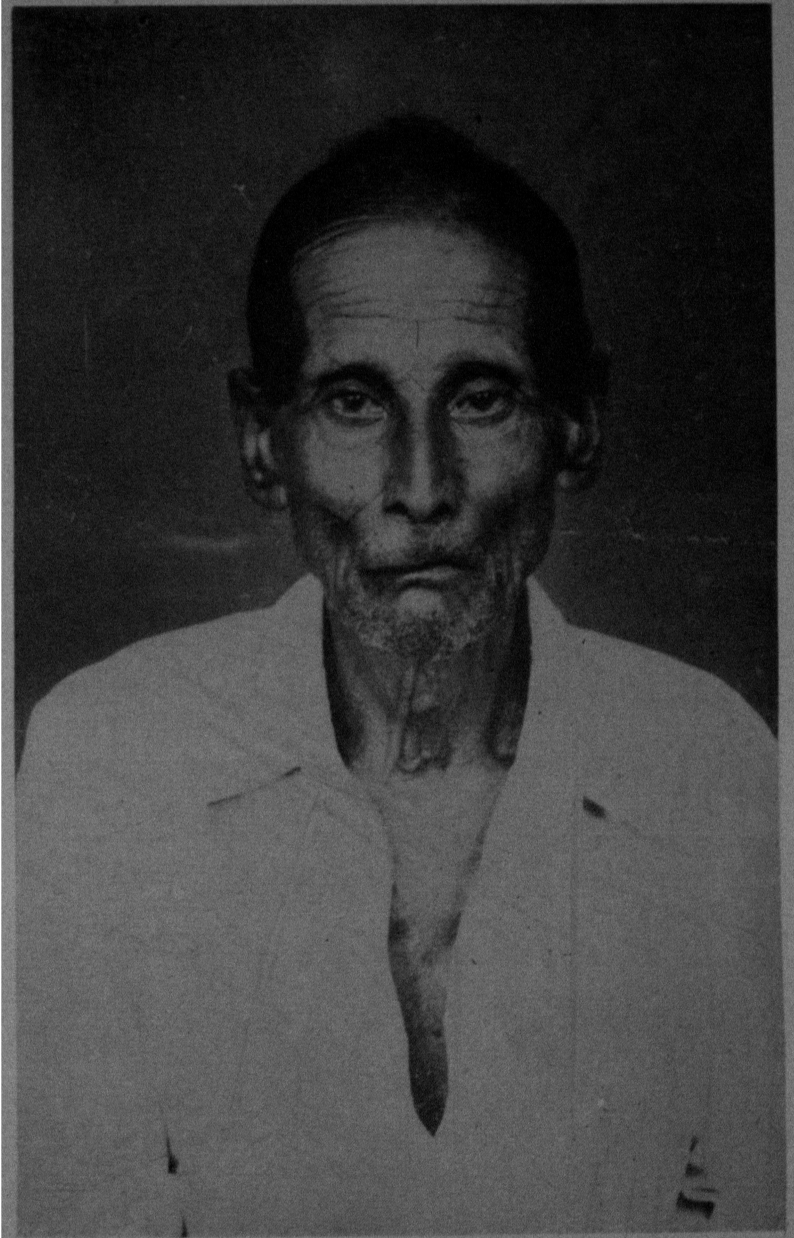
সাহেবনগরের ফণী দরবেশ
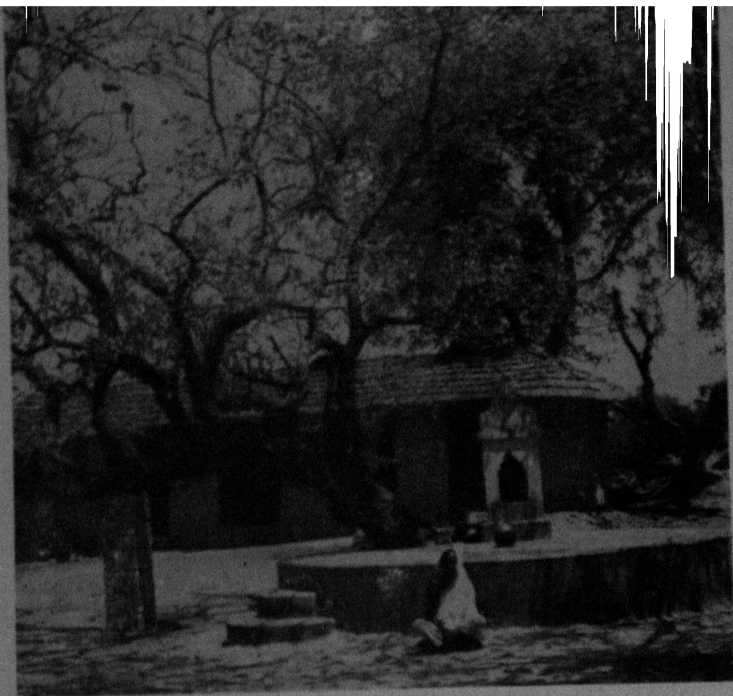
নিশ্চিন্তপুরের বেলতলার সামনে রাধারাণী

'কলিকালে মেহেরপুরে পূর্ণমানুষ'

আঠারো শতকের শেষের দিকে নদীয়া জেলার মেহেরপুরে (এখন মেহেরপুর বাংলাদেশের অন্তর্গত এক উপজেলা) জন্মেছিলেন এক অন্ত্যজ নেতা। নাম : বলরাম হাড়ি বা বলাই হাড়ি। পরবর্তীকালে তিনি প্রবর্তন করেন এক লৌকিক গৌণধর্ম যা ক্রমেই বেড়ে ওঠে এবং ছড়িয়ে পড়ে বাংলার নানা অংশে, বিশেষ করে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে। বলরাম-প্রবর্তিত এই বিশেষ সম্প্রদায়টির পাঁচরকম নাম আমরা পাই : 'বলরামী', 'বলরামভজা', 'বলরামচন্দ্রের ধর্ম', 'বলাহাড়ির মত' এবং 'হাড়িরাম সম্প্রদায়'। অন্ত্যজ বর্গের মধ্যে প্রচারিত এই ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে ছাপার অক্ষরে প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৮৬২ সালে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্র 'সোমপ্রকাশ'-এর ২৬শে ফাল্গুন ১২৬৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যায়। একজন প্রতিবেদক ঐ বছরের ১৩ই ফাল্গুন মেহেরপুর যান এবং সরেজমিন দেখে শুনে সম্প্রদায়টি সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর প্রতিবেদনে জানা যায়, 'প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল, বলরাম হাড়ি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে'। এ থেকে বলরামের জীবৎকাল বিষয়ে একটা স্বচ্ছ ধারণা হয়।

পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইয়ের প্রথম খণ্ডে (১৮৭০) বলরামের আরেকটু বিস্তৃত পরিচয় দেন এবং উল্লেখ করেন, '১২৫৭ সালের ৩০এ অগ্রহায়ণে অনুমান ৬৫ পঁইষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।' মেহেরপুরবাসী বিখ্যাত লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : 'বাঙ্গালা ১১৯০

বা ১১৯১ সালে···বলরামের জন্ম হয়'। মোটামুটি সব দিক বিচার ক'রে বলরাম হাড়ির আনুমানিক জন্মসাল ১৭৮০-র সামান্য আগে বা পিছে ধরাই সংগত। সুতরাং বলা যায় যে, উনিশ শতকের গোড়ায় বলরামীদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। ১৮৭২ সালে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষদিকে এই সম্প্রদায়ে যে বিশ হাজার মানুষ ছিলেন তারও নিশ্চিত সাক্ষ্য আছে। সেই সঙ্গে বাড়তি দুটি তথ্য এখানে জেনে নেওয়া জরুরী। এক, বলরামী সম্প্রদায় সংখ্যাল্প হ'লেও এখনও তাদের গূঢ় আচার-আচরণ পালন ক'রে বেঁচে আছে। দুই, এই সম্প্রদায়ই সম্ভবত বাংলার একমাত্র লৌকিক ধর্ম যাঁরা সম্প্রদায় সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের নিম্নবর্ণের শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতি ও উপজাতি ছাড়া আর কাউকে কোনদিন তাঁদের বিশ্বাসের গণ্ডীতে প্রবেশ অধিকার দেননি। হাড়ি, ডোম, বাগাদ, মুচি, বেদে, নমঃশূদ্র, মুসলমান, মালো এবং মাহিষ্য এঁদের সংগঠন শক্তির ভিত্তি।

এই দ্বিতীয় বিষয়টাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। কেননা, কর্তাভজা থেকে আরম্ভ করে বাংলার বেশিরভাগ গৌণধর্মে কোন-না-কোন পর্যায়ে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ অথবা বৈষ্ণব জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার ফলে ক্রমশ শোধিত হয়েছে ঐসব গৌণ ধর্মের মূল প্রস্তাবনা ও বিশ্বাস। সেই বিচারে স্পষ্টভাবেই বলা যায়, বলরামী সম্প্রদায় বাংলার অন্যতম এক অপরিশোধিত ও মৌলিক লোকধর্ম। কথাটা জোর দিয়ে এবং আলাদা ক'রে ঘোষণা করতে হ'ল এইজন্য যে, অক্ষয়কুমার দত্তের মত পণ্ডিতজন বলরামের ধর্মমতকে ভুল করে 'চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখা' ব'লে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের দ্বাদশভাগে বলা হয়েছে, 'বলরামভজা, একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়।' এইচ. এইচ. রিসলি তাঁর প্রসিদ্ধ 'The Tribes and castes of Bengal' বইয়ের প্রথম খণ্ডে লিখে গেছেন : 'Balarami, a subcaste of Tantis in Bengal'। এ সমস্তই অস্পষ্ট ও ধূসর মন্তব্য। কিন্তু কেন এমন ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠলো এবং প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতবর্গ কেন এমন ভ্রান্ত মন্তব্য লিখে গেলেন তার কারণ অনুমান করা চলে। সেই অনুমান বাংলার সমাজ-ইতিহাস থেকেই বার করা যায়।

বাংলার বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস ভাল করে পড়লে দেখা যাবে, মহাপ্রভুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণব ধর্মে নানা রকম বিচ্ছিন্নতা ও তত্ত্বগত বিভিন্নতা এসে গিয়েছিল। সেইসময়ে অদ্বৈত ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না নিত্যানন্দের

জীবনযাপনের ধরনধারণ। নিত্যানন্দ একদম পছন্দ করতেন না নরহরির 'গৌরনাগরবাদ' এবং গদাধর পণ্ডিতের 'গদাই-গৌরাঙ্গ' সাধনা। এই প্রসঙ্গে শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল লিখেছেন :*

> It was the common devotion of all to Chaitanya which held the diverse groups together. After the demise of the Master, the different groups drifted away from each other to establish distinctive identities. Thus there emerged distinct group led by Nityananda, Advaita, Narahari Sarkar, Gadhadharadasa, Hridaya-Chaitanya and Bansibadana. The relation between the groups was marked by indifference and even animosity.

চৈতন্য-তিরোধানের পর বাংলার বৈষ্ণবসমাজে স্পষ্টত দুটি বিভাজন ঘটে। একদল হয়ে পড়েন বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী ও তাঁদের অনুশাসননির্ভর, আরেক দল বৃন্দাবন এবং সেখানকার গোস্বামীদের প্রাধান্য না দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন নবদ্বীপ ও গৌরপারম্যবাদে উৎসাহী। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা কোনভাবেই গৌরপারম্যবাদ মানেন নি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সে সময় বাংলার বৈষ্ণবসমাজে ছোট উপদলও কয়েকটি ছিল। নবদ্বীপে ছিল গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক দল, শ্রীবাস পণ্ডিতের শিষ্য সমাজ, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের রসরাজ সাধনার দল। এই সময়কার বাংলার বৈষ্ণব সমাজের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন পাওয়া যায় শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তীর রচনায়।*

> কোনো কোনো বাঙালি বৈষ্ণব বৃন্দাবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন। ষড় গোস্বামী বাংলা দেশে আসেননি। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবা দেবী, 'গোপাল' উদ্ধারণ দত্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত এবং পরমেশ্বর দাস,

---

* দ্র. 'Trends of change in the Bhakti movement in Bengal'. Occasional Paper No. 76. Centre for Studies in Social Sciences. Calcutta. July 1985. pp. 16-17.

* দ্র. 'চৈতন্যের ধর্মান্দোলন'। বারোমাস। এপ্রিল ১৯৮৬

যাজী গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, গোপীবল্লভপুর-ধারেন্দার শ্যামানন্দ, রাজশাহী-খেতুরির নরোত্তম দত্ত এবং বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র, রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজও বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।

এই তথ্য থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বৃন্দাবনের তত্ত্ব আনার জন্য বাঙালি বৈষ্ণবরাও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে জাহ্নবা দেবী অগ্রণী ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ষোড়শ শতকের শেষ দিকে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দত্ত এবং শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে রচিত বহু পুথি শকটবাহিত অবস্থায় বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।

বস্তুত বৃন্দাবনে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এই ত্রয়ী নেতা শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ ষোড়শ শতকের উপান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বৈষ্ণব উপদলকে একত্র করবার জন্য একাধিক বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। সবচেয়ে বড় মহাসম্মেলন হয় নরোত্তমের চেষ্টায় রাজশাহীর খেতুরিতে ১৬১০ থেকে ১৬২০ সালের মধ্যে কোন সময়ে। এই সম্মেলন সর্বাত্মক হয়নি। যেমন জানা যায়, নিত্যানন্দের সন্তান বিখ্যাত নেতা বীরভদ্র যোগ দেননি এই সমাবেশে। ইতি-মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মে এসে পড়ে গুরুবাদ, ফলে মহান্তগিরির কায়েমী স্বার্থ বৈষ্ণবীয় শুদ্ধ পরিমণ্ডলকে বেশ কিছুটা গ্রস্ত করে। অবশ্য বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবৃত্ত তিন নেতা নতুন ক'রে সারা বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে মন দিলেন। বীর হাম্বীর, সন্তোষ দত্ত এবং অন্যান্য বহু রাজন্য ও সামন্ত এ ব্যাপারে সহায়তা করতে লাগলেন। তবু শেষপর্যন্ত আঠারো শতকের আগে গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব-নেতৃত্ব তার প্রসার ও কর্তৃত্ব দ্রুত হারাতে লাগলো। তার কারণ, সারাদেশে ইতিমধ্যে একটা অন্য হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। আসন্ন এক রাজনৈতিক পালাবদলের আভাস ফুটে উঠছিল। দেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে আসছিল ভাঙনের চিহ্ন। সাহিত্যে আভাসিত হচ্ছিল পুচ্ছানুগ্রাহিতা ও কুরুচি। নানা শাখায় বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণব দল শ্রীচৈতন্যের সজীব প্রেরণা ও প্রাণধর্মের আবেগ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে কেবলই অবলম্বন করতে চাইছিল শাস্ত্রীয় বিধিবদ্ধতাকে। প্রবহমান বৈষ্ণব পদাবলী উক্ত জীবনানুবর্তনের বদলে আশ্রয় করছিল আলংকারিকতা ও গৌড়ীয় তত্ত্ব দর্শনের কাঠিন্যকে। বৃন্দাবন-প্রণীত বৈষ্ণব-সন্দর্ভ ও ধর্মীয় বিধিবিধানকে

অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছিল। তার ফলে অনুভবের চেয়ে ক্রমেই গুরুত্ব পেল আচরণবাদ, শূদ্রের চেয়ে বড় আসন পেলেন ব্রাহ্মণ, ভক্তের চেয়ে বড় জায়গা নিলেন গুরু-মহান্তরা। গৌড়বঙ্গে কোন কেন্দ্রীয় বৈষ্ণব সমাজ বা সংগঠন ছিল না। তাই যে-কোন তাত্ত্বিক সমস্যা বা বিরোধ-বিদ্বেষে বাঙালী বৈষ্ণব নেতা নির্দেশ নিতে ছুটতেন বৃন্দাবন। কালক্রমে এই সতেরো শতকেই প্রয়াত হন রূপ ও সনাতন গোস্বামী। তারপরে শ্রীজীব। এরপর থেকে বাংলার বৈষ্ণবগুরু ও নেতারা একদিকে যেমন বৃন্দাবন-নির্ভরতা থেকে বঞ্চিত হ'লেন কিন্তু অন্যদিকে তেমন আত্মনির্ভরতাও এলো না। ফলে দলে-উপদলে বিচ্ছিন্নতা ও অসহিষ্ণুতা পৌঁছালো চরম পর্যায়ে। যে যার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনামত সমাজ চালাতে লাগলেন। ফলে এই সুযোগে সহজিয়া বৈষ্ণবরা তাঁদের উষ্ণ দেহবাদী আহ্বানে বৈষ্ণবদের একটা বড় অংশকে আকর্ষণ ক'রে নিলেন। অন্যদিকে বৈষ্ণবদের মধ্যেকার ব্রাহ্মণ-অংশ অনেক বেশি এগিয়ে গেল স্মার্ত হিন্দুর বিধি-বিধানের দিকে। আরেকদিকে মোগল রাজশক্তি ও মুর্শিদাবাদের নবাব বংশ প্রাসাদ-রাজনীতি ও ভোগবাদে হ'তে লাগলো হীনবল। মারাঠা বর্গীরা হানা দিতে লাগলো এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ পর্তুগীজরা নানাভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো বাংলায়। সাধারণ শূদ্র সমাজ এ সময় আদর্শ নেতৃত্ব না পেয়ে বেশি ক'রে লিপ্ত হয়ে পড়লো বহুরকম অপদেবতা পূজা ও নানা কুসংস্কারের জালে। বৈষ্ণবদের মধ্যে শেষ উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। তাঁদের সংগঠন ও নেতৃত্ব সর্ববাদীসম্মত ও ব্যাপক ছিল না। দেশের রাজশক্তি বিশেষত নদীয়ার রাজবংশ চৈতন্য পূজার বিরোধিতা করলেন প্রকাশ্যে। এই রকম সময়েই তো গুহ্য আচরণবাদী উপধর্মগুলি জেগে ওঠার অনুকূল অবসর। এই কাল পরিবেশই তো শুদ্ধ ধর্মে বিকৃতি আনে। কাজেই সব রকম ঘটনা ও অবস্থার যোগাযোগে আঠারো শতক বরাবর বাংলার অগণন গৌণ ধর্ম সম্প্রদায়গুলি একে একে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করলো।

আচার্য সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড অপরার্ধের ৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> ষোড়শ শতাব্দ শেষ হইবার আগেই বৈষ্ণব ধর্ম অবৈষ্ণব গুহ্য সাধকদের —অর্থাৎ যোগী-তান্ত্রিক-সুফীদের—আকর্ষণ করিতে শুরু করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দে এমন কোন কোন সাধক-সম্প্রদায় বাহ্যত বৈষ্ণব বৈরাগীর আচার ও আচরণ অবলম্বন করিলেন। প্রধানত ইহাদের মধ্য দিয়াই চৈতন্যের ক্রমবর্ধমান আচার-বিচার ও সেবাপূজা ইত্যাদি বিধিভুক্ত পদ্ধতির বহিরঙ্গতা এড়াইয়া দেশের অন্তর্ভূমিতে নামিয়া গিয়া সর্বত্র প্লাবিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে লাগিল। প্রধানত এই অনুরাগমার্গী সমাজবহির্ভূত সাধকদের মধ্যেই চৈতন্যের মনোধর্মের সজীব বীজটুকু প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছিল।

আচার্য সেনের এই দিকনির্দেশক মন্তব্য থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি সমাজ বহির্ভূত অন্ত্যজ মানুষরা কেন ও কীভাবে গৌণধর্মগুলি সৃষ্টি করেছিল এবং কেনই বা তারা তাদের নিজ পরিচয় রাখতো গোপন ক'রে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাদর্শ কেবলই চেয়েছে বৃন্দাবনের পাঠানো শাস্ত্র শাসন থেকে মুক্ত থাকতে। এ ব্যাপারে সংগ্রাম চলেছিল রাগানুগা পদ্ধতির সাধনার সঙ্গে লোকায়তিক অনুরাগ মার্গের। শাস্ত্র নির্দেশের জটিল কূটত্ব ও আচরণের গুরুতার সঙ্গে ভক্তের আন্তর নির্দেশের আর্দ্রতার। ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করবার জন্য এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা দরকার।

আঠারো শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে দক্ষিণ দেশের এক কট্টর দ্রাবিড় ভক্ত তোতারাম বাবাজী ন্যায় শাস্ত্র পড়তে আসেন নবদ্বীপের টোলে। তারপর ভজন সাধনে লিপ্ত হয়ে চলে যান বৃন্দাবনে। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে (বোধহয় নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ-সংক্রান্ত কোন উদ্বেগজনক খবর পেয়ে) তিনি আবার চলে আসেন নবদ্বীপ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ৬ বিঘা নিষ্কর ভূমি দেন আখড়া পত্তন করবার জন্য। তোতারাম সেখানে গড়ে তোলেন তাঁর প্রসিদ্ধ 'বড় আখড়া', কিন্তু তাঁর নৈষ্ঠিক জীবন প্রণালী ও বিনয়ী ব্যবহার নানা ভাবে ব্যাহত হ'তে থাকলো, কেননা তখন বাংলার নানা স্থানে ও নবদ্বীপে বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়গুলি প্রবল বিকৃতিসহ ব্যাপকভাবে জনসমাজে তরঙ্গ তুলেছিল। তাদের ক্রমবর্ধমান জনাদর দেখে হতাশ ও ক্ষুব্ধ তোতারাম ঘোষণা করেন :

আউল বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখীভাবকী স্মার্ত জাত-গোসাই ॥
অতি বড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি ॥

লক্ষ করবার বিষয় এইটাই যে, তোতারাম যে-তেরোটি গৌণ ধর্ম সম্প্রদায়কে অপ সম্প্রদায়ভুক্ত করেছেন তারমধ্যে রয়েছে গৌর নাগরী ও জাত-গোঁসাইয়ের উল্লেখ। এর থেকে বোঝা যায়, আঠারো শতকের মাঝামাঝি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অসহিষ্ণুতা ও ছুৎমার্গ এতটাই প্রবল হয়েছিল এবং সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি এমন জাঁকিয়ে বসেছিল যে আপন ধর্মসমাজের অন্তর্গত মানুষদেরই তাঁরা অস্পৃশ্য করতে চেয়েছিলেন মূল ধারা থেকে। কথাটি বোঝাবার জন্য গৌরনাগরবাদ ও জাত গোঁসাই সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার আর তাঁর ভাইপো রঘুনন্দন চৈতন্য প্রয়াণের পরে গৌরনাগরবাদ প্রচার করেন। চৈতন্য-পূর্ব ভক্তি-আন্দোলনে নরহরি ও তাঁর অগ্রজ মুকুন্দ খুব বড় ভূমিকা নেন। কবি রায়শেখর এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিনী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।

তারমানে নরহরি চৈতন্য জন্মের আগেই কীর্তন করতেন। পরে মুকুন্দ-নরহরি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ হন। মুকুন্দ বাস করতেন শ্রীখণ্ডে, নরহরি নবদ্বীপে। নরহরির ঘনিষ্ঠতা ছিল শ্রীচৈতন্য ও গদাধরের সঙ্গে। তিনি তত্ত্বগতভাবে চেষ্টা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে গুরুত্ব দিতে এবং নবদ্বীপকে ঐশীভূমিরূপে বৃন্দাবনের উপর স্থাপন করতে। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, রঘুনন্দন, লোচনদাস, পুরুষোত্তম, বাসু ঘোষ, কৃষ্ণ দাস, গদাধর পণ্ডিত, গদাধর দাস, শিবানন্দ সেন ও কবি কর্ণপুর।* এঁদের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য ও বিশেষত নিত্যানন্দের খুব তত্ত্বগত বিরোধ ছিল। নরহরি 'শ্রীভক্তিচন্দ্রিকাপটল' নামে শ্রীচৈতন্য-পূজায় একটি বিধিসন্দর্ভ লেখেন। এমনও শোনা যায় যে, তিনি শ্রীখণ্ড, গঙ্গানগর ও কাটোয়ায় মহাপ্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বোঝা যায়, মহাপ্রভুর মৌল ভাবমণ্ডলে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

কিন্তু মহাপ্রভুর প্রয়াণের পর অদ্বৈত-নিত্যানন্দের নেতৃত্বের সঙ্গে নরহরি-গদাধরের নেতৃত্বের ভাবসংঘর্ষ বাধে। নরহরি-গদাধর বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী ও তাঁদের শাস্ত্র 'হরিভক্তিবিলাস'কে খুব মান্য করেন নি। গদাধর সরাসরি নিজেকে

---

* দ্র: **Vaisnavism in Bengal : Ramakanta Chakravarti. XI Chapter: pp 190-193**

চৈতন্য-প্রেমিকারূপে ভেবে 'গদাই-গৌরাঙ্গ' সাধনা শুরু করেন। তেমনই নরহরি শ্রীচৈতন্যকে নদীয়া-নাগররূপে ভেবে ভক্তকে তাঁর প্রেমমুগ্ধ নাগরীরূপে ভেবেছেন। একেই বলা হয়েছে 'গৌরাঙ্গ নাগরী' মত। শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল লিখেছেন :*

> গৌরনাগরবাদ রাগবর্ত্ম্য-পদ্ধতির সাধনা। রাগবর্ত্ম্য-পদ্ধতিতে কাম উত্তরণের কথা আছে। এই উদ্দেশ্যে এক ধরণের সাধকগোষ্ঠী পুরুষাভিমান বর্জন করে স্ত্রীভাব অবলম্বন করতেন এবং সেইভাবে পরমপুরুষকে পরম প্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ বলে ভজনা করতেন। ...শ্রীখণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক নামকরা কবি, গায়ক, বাদক, নর্তক ও সাধক ছিলেন। এঁদের হাতে গৌরনাগরবাদ পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের বাইরেও গৌরনাগরবাদের যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল। চৈতন্য পরিকর বিখ্যাত পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ এবং চৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক সংস্কৃত স্তোত্রকাব্য-প্রণেতা প্রবোধানন্দ সরস্বতী গৌরনাগরবাদী ছিলেন। ...গৌরনাগরবাদের এতই প্রসার হয়েছিল যে, এই মত অনুসারে চৈতন্যদেবের জীবন ও সাধনার ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই কারণে শ্রীখণ্ড পাটের শিষ্য লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন।

এহেন প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত এক বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনাকে তোতারাম যে অস্পৃশ্য মনে করেছেন তাতে আঠারো শতকে উদার বৈষ্ণব মতের অবক্ষয়ের সূচনা প্রমাণ করে। মৌলবাদী বৈষ্ণবদের এই অনুদারতা ও সংকীর্ণতাই কি পরবর্তী সহজিয়া ও অন্যান্য গৌণধর্মের উদ্ভবের কারণ?

চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবদের অনুদারতার আঘাত আরো বেশি অভিমানী করেছিল জাত-বৈষ্ণবদের। এই জাত বৈষ্ণব কারা? যাঁরা মহাপ্রভুর আদর্শে পূর্বসমাজ ত্যাগ ক'রে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছিলেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে শূদ্ররাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। বলতে গেলে মহাপ্রভু মূলত এই সব অমানী জাতপাতকে মান দেবার জন্যই তাঁর বৈষ্ণবধর্মের পরিকল্পনা করেছিলেন। ত্রাণ করেছিলেন তাঁদের, দিয়েছিলেন আশ্রয়। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের দমন পীড়ন থেকে বাঁচাতে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ এই সব ব্রাত্যকে স্থান দেন বৈষ্ণবতার ছত্রতলে। কিন্তু তাঁদের প্রয়াণের পর বৈষ্ণবধর্ম হয়ে গেল বৃন্দাবনমুখী এবং ব্রাহ্মণ্যবর্গের প্রতি অনুরক্ত। ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রম থেকে বেরিয়ে-

* দ্রঃ 'চৈতন্যদেব এবং বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি'। বারোমাস। এপ্রিল ১৯৮৬

আসা জাত বৈষ্ণবরা আবার ব্রাত্য হয়ে গেল বৈষ্ণবদেরই চোখে। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅজিত দাস লিখেছেন* :

> জাত-বৈষ্ণব সমাজ বিপন্ন। বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রচারকদের প্রচারে মুগ্ধ হয়ে তারা নিগ্রহের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ ও সামাজিক ও মানবিক মান মর্যাদা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নিজ সমাজ ও জাত গোত্র বর্ণ ছেড়ে এসে বৈষ্ণব পরিচয় মাত্র সার করে নিজেদের ধন্য মনে করেছিল। আর নিজেরা একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ক্রমে দেখল প্রচারকগণ, নেতাগণ, ওদের পাশ থেকে পলাতক। তারা কেউ ওদের সঙ্গে হাত মেলায় নি। যে যার নিজের সমাজ ও বর্ণের মধ্যে স্থিত হয়ে বৈষ্ণব গুরুরূপে পূজা নিচ্ছে। ওদের কাণ্ডারীহীন দশা। ওরা দরিদ্র, অজ্ঞ, পতিত। উদ্ধার পেতে এসে আবর্তে পতিত। ফেরার পথ নেই আর। তারা উচ্চবর্ণীয় সমাজ ও ব্রাহ্মণের কাছে হয়ে গেল ঘৃণার পাত্র।
>
> বিপিনচন্দ্র পাল মশায় বলেছেন, ওরা জাতিচ্যুত।
>
> উচ্চবর্ণের বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবদের চোখে ওরা হরিজন বৈষ্ণব। এ বিষয়ে তারা কয়েকটি কারণ দর্শায় :
>
> ১ ওরা ব্রাহ্মণের কাছে অস্পৃশ্য
>
> ২. ওরা ব্রাহ্মণ্য আচার পালন করে না
>
> ৩. ওদের মালাচন্দনে বিয়ে সারা হয়
>
> ৪. ওরা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলনে অভ্যস্ত
>
> ৫. অবৈধ বা জারজ সন্তানে ওদের সমাজ ভর্তি
>
> ৬. ওদের অধিকাংশই ভিখিরি
>
> ৭ অধিকাংশই নিম্নবর্গ থেকে আগত
>
> ওরা আর অগ্রসর হতে পারল না। বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি বৃত্তিহীন বর্ণে পরিণত হয়ে গেল।

এই অবমানিত ও বঞ্চিত জাত-বৈষ্ণবরা পরবর্তীকালে গৌণধর্মের সংগঠনে একটা বড় ভূমিকা নেয় নি কি?

তোতারাম কিন্তু তেরোরকম অপসম্প্রদায় বিষয়ে তাঁর উষ্মা ও ছুৎমার্গ

---

* দ্র: 'জাত বৈষ্ণবের কথা'। বারোমাস। এপ্রিল ১৯৮৬

প্রকাশ ক'রে তাদের ঠেকাতে পারলেন না। বরং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও গ্রাম গ্রামান্তে ব্যাপক প্রসার দেখে শংকিত তোতারাম এবারে খেদ করে বললেন :

পূর্বকালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়।
তিন তেরো বাড়লো এবে ধর্ম রাখা দায় ॥

তেরো থেকে বাড়তে বাড়তে বৃহৎবঙ্গে যে উনচল্লিশটি গৌণ ধর্ম সম্প্রদায় গজিয়ে উঠলো তার নাম ও তালিকা খুব চিত্তাকর্ষক।*

কিশোরীভজা ভজন খাজা কত বলি হায়।
শুক্রভোগী শুক্রত্যাগী আরও যে বাহিরায় ॥
অসীমাতাজা প্রণতিমজা আর বাসুদেবী থল।
দারী-সন্ন্যাসী শিষ্যা-বিলাসী গুরু-প্রসাদী দল ॥
উপনয়নত্যজা পরমহংসসাজা সঙ্করবর্ণ যত।
অসৎসঙ্গ দ্বিপাদভঙ্গ সেবাপরাধী তত ॥
রামদাস হরিদাস হরিবোলিয়া মত।
নিতাই-রাধা গৌর-শ্যাম বর্ণিব বা কত ॥
সীতারামিয়া রাধাশ্যামিয়া শাউড়ির দল আর।
ঘরপাগলা গৃহী বাউলা সব চিনে উঠা ভার ॥
বর্ণবিরাগী আশ্রমরোধী গৈরিকবিরোধী মণ্ড।
ধামাপরাধী নামাপরাধী বৈষ্ণবপরাধী ভণ্ড ॥
অদ্বয়বাদী মধ্ববিরোধী এসব পাষণ্ড।
কান্তপ্রিয়া নাথ-ভায়া অকাল কুষ্মাণ্ড ॥
গৌড়েশ্বর বংশীধর উলাইচণ্ডীবাদ।
স্মরণপন্থী-অধোমন্থী যুগলভজন সাধ ॥
দাদা ও মামা ক্ষেপা বামা আর যত অপসম্প্রদায়।
দেশে বিদেশে সাধুর বেশে ঘুরছে ফিরছে হায় ॥

এই রোমাঞ্চকর গৌণধর্মের নাম ও তালিকা আঠারো শতকের বাংলার গৌণধর্মগুলির বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার ইঙ্গিত বহন করছে। তখন এতসব উপধর্মের বিবরণ ও আচার আচরণঘটিত স্বাতন্ত্র্য লিখে রাখেননি কেউ, তাই আজ

---

* এই তালিকা-শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে শ্রীননীগোপাল গোস্বামীর লেখা 'চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব' (১৩৭২) বইয়ের ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা থেকে।

অনেককিছুই জানা যাবে না। অবশ্য অনুমান করা যায় যে, এ সব মতের অধিকাংশই ছিলেন গুহ্য সাধক এবং গোপন যৌন-যোগাচারে তাঁদের উৎসাহ ছিল খুব বেশি। কালের নিয়মে এমন সব বিচিত্র শীর্ণ ও খণ্ড গোষ্ঠী আজ হয় আত্ম-গোপন ক'রে আছে অথবা লুপ্তপ্রচল হয়ে গেছে। তবে একটি কথা সত্য যে, অবক্ষয়িত ও সংরক্ষণপন্থী মৌল বৈষ্ণবধর্মের অনুদারতাই গৌণধর্মসম্প্রদায়গুলির উদ্ভবের প্রধান কারণ। তারসঙ্গে পরবর্তী নানা সময়ে যুক্ত হয়ে যায় বৌদ্ধতান্ত্রিক কিছু দেহযোগ, কিছুটা নাথপন্থের ধারা এবং সুফীপ্রচারকদের ভাবনা ও সাধনার সংক্রাম। এই সময়েই কোন কোন গ্রাম্য পরিমণ্ডলে হিন্দু-মুসলমান ভাব-সমন্বয়ের একটি প্রয়াস দেখা যায়। তারফলে কর্তাভজা, সাহেবধনী ও খুশি বিশ্বাসী এই তিনটি গৌণধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। তাদের উৎসে একজন-না-একজন মুসলমান প্রবর্তকের চিহ্ন আছে। এই আঠারো শতকেই হিন্দু-মুসলমান ভাবসমন্বয়ের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ পরিকল্পনায়।

এখানে অবশ্য প্রশ্ন ওঠে যে, আঠারো শতকে এতগুলি গৌণসম্প্রদায় বিকাশ ও বিস্তারলাভ ক'রে আবার উনিশ শতকের মধ্যে এর বেশিরভাগ কেন আত্ম-গোপন করলো বা বিনষ্ট হলো? তার একটি কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদ ও স্মার্তধর্মের প্রবলতা, সামন্ত ও রাজন্যবর্গের শাক্তধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং দেশব্যাপী ব্রাহ্ম-সমাজের উত্থান। আর একটি কারণ, খৃষ্টধর্মাবলম্বী পাদ্রীদের দ্বারা দরিদ্র ও গৌণধর্মাশ্রয়ী মানুষদের ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ।* গৌণধর্মসম্প্রদায়গুলি এইসব প্রতিরোধে বিধ্বস্ত ও ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়লেও একধরণের আত্মচেতনা ও স্বয়ম্ভরতার সূচনা তারা করেছিল অন্ত্যজ মানুষদের মধ্যে। উচ্চবর্ণ ও উচ্চধর্ম যাদের আশ্রয় দেয়নি এমন সব অসহায় ও দরিদ্রমানুষ ঐ সব গৌণধর্মের প্রেরণায় ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায় গড়বার চেষ্টা করে। বলাহাড়ি সম্প্রদায় এমনই এক দর্পিত দল যার জন্ম উনিশ-শতকের সমৃদ্ধ উচ্চধর্ম বিশেষত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিস্পর্ধী-রূপে। সেই জন্যই এঁদের গৌরব ও গুরুত্ব বেশি। ব্রাহ্মণ্য, শাক্ত ও ব্রাহ্ম ধর্মের সমৃদ্ধ ও শুদ্ধ আবহে কেমন করে নিতান্ত ভদ্রেতর কিছু মানুষ এক স্বতন্ত্র ধর্মসমাজ সংগঠনের দুঃস্বপ্ন দেখার সাহস পেলো তা ভাবলে এখন অবাক লাগে।

* ধর্মান্তরকরণের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Eugena Stock এর 'The History of the Church Missionary Society, its Environment, its men and its work London. 1899.

আশ্চর্য যে বলরামী সম্প্রদায়কে অক্ষয়কুমার দত্তের মত পণ্ডিতব্যক্তি 'চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখা' ব'লে ভুল ক'রে চিহ্নিতকরণ করেছেন। এতে দুটি ভুল হয়েছে। প্রথমটি ঐতিহাসিক ভুল, কেননা যে-উনিশ শতকে বলরামীদের উদ্ভব সে সময়ে চৈতন্য সম্প্রদায়ের নানা শাখা ও উপদল আসলে হীনবল হ'য়ে যাচ্ছিল, আত্মগোপন করছিল বা একেবারে লুপ্ত হয়ে পড়ছিল। এমন সময়ে একটি নতুন চৈতন্য-সম্প্রদায় প্রত্যন্ত এক গ্রামে নতুন ক'রে গজাবেই বা কেন? অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় ভুলটি ঘটেছে বলরামীদের সম্পর্কে সরেজমিন অনুসন্ধান করেন নি ব'লে। অনুসন্ধান করলে তিনি জানতে পারতেন বলরামীরা প্রকৃতি-সাধনা বা পরকীয়াবাদে উৎসাহী ছিলেন না। অথচ চৈতন্য সম্প্রদায়ের সমস্ত শাখার সামান্যলক্ষণ হলো পরকীয়াবাদ ও গুরুর নির্দেশে প্রকৃতি-সাধনা। মনে রাখা দরকার, বৈষ্ণব সহজিয়া ও অন্যান্য লোকায়ত বৈষ্ণব শাখার ব্যাপক জন-প্রিয়তা ও প্রত্যন্ত গ্রামের প্রচ্ছন্ন অঞ্চলে সমাবেশের অন্যতম কারণ এই নির্বিচার পরকীয়া যৌন-যৌগিক সাধনার আকর্ষণ। যথার্থ শুদ্ধতার অভাবে এবং গ্রামীণ গুরুর বিকৃত ব্যাখ্যায় কালক্রমে এই পথেই গৌণ ধর্মের অনেকগুলি শাখা পথভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে। উচ্চবর্ণের মানুষের সমর্থন ও প্রশ্রয়ের বদলে তারা অর্জন করে উপেক্ষা ও ঘৃণা। বলরামীরা যে উনিশ শতকে উদ্ভূত হয়েও বিস্তৃত হ'তে পেরেছিল তার একটি কারণ হ'ল তাদের সদাচারী জীবনযাপন ও পরকীয়াবর্জন, আর একটি কারণ তাদের সম্প্রদায়ে গুরুবাদ-বিহীনতা। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বলরামীরা মানেন একমাত্র বলরামকেই। তাই বাউল, সহজিয়া বৈষ্ণব বা ফকির দরবেশ সাঁইদের তাঁরা খুব একটা পছন্দ করেন না। গুরু বা মুর্শেদ কোনটাতেই তাঁদের আস্থা নেই। গুরুকে বাদ দিয়ে এই অত্যাশ্চর্য লৌকিক সম্প্রদায় যে কেমন ক'রে আত্মনির্ভরতা লাভ করলো এবং থাকতে পারলো আত্মবশীভূত তার কারণ বুঝতে গেলে অনেকগুলি তথ্য জানতে হবে। অনুধাবন করতে হবে বলরাম হাড়ির জীবন কাহিনী, বিশ্লেষণ করতে হবে তাঁর জীবনকে নিয়ে গড়ে-ওঠা জনশ্রুতিগুলি, বুঝতে হবে কোন্ অন্ত্যজ শ্রেণী এ-সম্প্রদায়ের শুদ্ধ নিষ্পাপ পরিমণ্ডলকে আজ পর্যন্ত অবিকৃত রেখেছে। কেন তাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদ বা বৈষ্ণবতার দ্বারা গ্রস্ত হননি কোনদিন। উচ্চবর্গের ও উচ্চবর্ণের কোন মানুষের সমর্থন কেন তাঁরা পান নি, কেন তাঁরা সংসারে থেকেই ধর্মসাধনা করেন এ সবই বুঝতে হবে। পরবর্তী ধাপে বুঝতে হবে, কেন তাঁরা সংস্কৃত-মেশানো মন্ত্র না-বানিয়ে

বাংলা যন্ত্র বলেন, কেন তাঁরা উপাস্য বলরামকে সন্দেশ-রসগোল্লা ভোগ না দিয়ে নিবেদন করেন খানিকটা নিজেদের-হাতে-বানানো গুড়। ক্রমে বোঝা যাবে কেন তাঁরা গঙ্গাজল স্পর্শ করেন না, প্রণাম করেননা কারুর পায়ে হাত দিয়ে। কিন্তু সেই সব গভীর ও বিশ্লেষণযোগ্য অনুপুঙ্খ এখন স্থগিত রেখে প্রথমেই তাঁদের সম্পর্কে লিখিত বিবরণ বা প্রতিবেদনগুলি জানা দরকার। বলরামীদের সম্পর্কে প্রথম মুদ্রিত বিবরণ আমরা পাই 'সোমপ্রকাশ' পত্রে এক প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদনের আকারে। সেটি এইরকম :

> মেহেরপুর। ১৩ই ফাল্গুন ১২৬৯ সাল।
>
> মেহেরপুর প্রসিদ্ধ বলরাম হাড়ির জন্মভূমি। উক্ত ব্যক্তি এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করে। তাহা বলরামচন্দ্রের ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। এরূপ প্রবাদ আছে যে, উক্ত ব্যক্তি, বীরভূম, বর্দ্ধমান, কলিকাতা, নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি অনেক জিলাতে অনেক শিষ্য করিয়া গিয়াছে। প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল, বলরাম হাড়ি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বলরাম প্রথমে অতি সামান্য লোক ছিল। এই গ্রামের চৌকিদারী করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অনন্তর কোন কারণবশতঃ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে। ইহার মৃত্যু বিষয়েও নানারূপ আশ্চর্য্য কথা প্রসিদ্ধ আছে। এই ব্যক্তি মরিবার তিনদিন অগ্রে বলিয়াছিল যে, আমি অমুক দিন এতক্ষণের সময় দেহত্যাগ করিব। তখন ইহার শরীরে কোন রোগের চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। পরে বাস্তবিকও সুস্থ থাকিয়া পূর্ব্বকথিত সময়ে দেহত্যাগ করিল। তাহার মৃত শরীর অগ্নিসাৎ বা জলসাৎ বা মৃত্তিকাসাৎ কিছুই করিতে দেয় নাই। উত্তম পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে নদী তীরে স্থাপন করিয়াছিল। এইরূপে শব রক্ষা করিলে তাহার যেরূপ দশা উপস্থিত হয় তাহা সকলেই বিদিত আছে। সম্প্রতি বলরাম হাড়ির উপপত্নী ভিন্নজাতীয়া ব্রহ্মময়ী নাম্নী এক বর্ষিয়সী তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে।
>
> ভৈরব নদীর ধারে এই ধর্ম্মের একটা আখড়া আছে শুনিয়া আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা উক্ত স্ত্রীলোককে ধর্ম্মবিষয়ে

অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার উত্তর দ্বারা বোধ হইল যে, উহারা বলরামকেই ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে অর্চনা করে। তাহারা পরজন্ম স্বীকার করে, এবং এককালে সমুদয় পৃথিবীতেই যে এই ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইবে এমত আশাও করে। কিন্তু ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করেনা। ইহাদিগের ধর্ম্মে চৌর্য্য, লাম্পট্য, মিথ্যাকথন এবং অত্যন্ত বিষয়াসক্তি সাতিশয় পাপ বলিয়া পরিগণিত। এই ধর্ম্মে ভিক্ষাকেই একমাত্র প্রশস্ত ব্যবসায় বলিয়া থাকে। ফলতঃ ইহাকে গৌরাঙ্গ ধর্ম্মের প্রকার-ভেদ বলিলেও বলা যায়। মৃত্যুর পর ইহারা শবকে দাহ অথবা মৃত্তিকাসাৎ করে না এবং কোনপ্রকার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ারও অনুষ্ঠান করে না। আর পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক আপনাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া ভান করিয়া থাকে।

এই প্রতিবেদন থেকে বোঝা যাচ্ছে বলরামীরা ছিলেন বৈরাগ্যব্রতী ও ভিক্ষা-জীবী। তাঁরা পরজন্ম স্বীকার করতেন কিন্তু জাতিভেদ মানতেন না। কোন মূর্তি, গুরু বা প্রথাবাহিত অবতারকে পূজা না ক'রে তাঁরা বলরামকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করতেন। বোধহয় সেই জন্যই এঁদের আরেক নাম বলরামভজা। এঁদের মৃত্যু-পরবর্তী ক্রিয়াকরণ খুবই মৌলিক সন্দেহ নেই এবং কোন লৌকিক ধর্মের সঙ্গে সেদিক থেকে মিল নেই। প্রথমে সামান্য মানুষ বলরাম কেমন ক'রে যে নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে পেয়ে গেলেন ঐশীশক্তি ও সংগঠন কৌশল, কেন যে বহু মানুষ হলো তাঁর অনুসারী বস্তুত এই জায়গাটা রয়ে গেছে খুব ধূসর। সে কি তাঁর ব্যক্তিত্বের টানে না ধর্মমতের ঔদার্যে? না কি এর মাঝখানে বোনা আছে কোন কল্প-কাহিনী বা গৌরবখ্যাপনের কিংবদন্তী? অথবা এমন অনুমান কি কষ্টকল্পনা হবে যদি আমরা ভাবি যে, আসলে বলরাম অন্ত্যজদেরই এক সমাজনেতা আর ধর্ম তাঁর একটা ছল বা ছদ্মবেশ? 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' নামে এক নিবন্ধে (দ্রষ্টব্য এক্ষণ। বর্ষা ১৩৮৯) শ্রীরণজিৎ গুহ বলেছিলেন: 'বিদ্রোহী চৈতন্যের একটি প্রধান লক্ষণ যে ধর্মচেতনা তাকে উড়িয়ে দেওয়া তো যায়ই না...বরং ধর্মবিশ্বাসকে সেই চৈতন্যের একটি প্রবণতা ব'লে স্বীকার করতে হয়।' এবারে তাহলে বলরামকে একটু অন্যভাবে ভাবার সুযোগ এসে যায় না কি?

কিন্তু তার আগে অন্য একটা সমস্যার কথা তুলতে হয়। সোমপ্রকাশের

প্রতিবেদক বলরামীদের নানা স্বভাবধর্ম ও বিশ্বাসের ·বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ ক'রেও হঠাৎ যে মন্তব্য করেন, 'ফলতঃ ইহাকে গৌরাঙ্গধর্মের প্রকারভেদ বলিলেও বলা যায়' গোলমালটা এখানেই। 'বলিলেও বলা যায়' কথাটির মধ্যে অবশ্য একটু দ্বিধার দোলাচল রয়ে গেছে। কিন্তু গৌরাঙ্গধর্মের কোনো লক্ষণই কি বলরামীদের আচরণে ও বিশ্বাসে আছে? নেই যে তার স্পষ্ট প্রমাণ হল' বলরামীরা বলরামকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। ঈশ্বরের অবতার বা গৌরাঙ্গের অবতার নয়—মৌলিকতা এখানেই। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বৈষ্ণব ধর্ম অবতারবাদ মানেন এবং সেই মতে শ্রীচৈতন্য হলেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার বা তাত্ত্বিক বিচারে কৃষ্ণরাধার মিশ্রিতস্বরূপ যুগলতত্ত্ব।

এখানে আরও উল্লেখনীয় বিষয় হ'ল, চৈতন্য পরবর্তী যেসব গৌণধর্ম বাংলায় গড়ে উঠেছিল তাঁরাও অনেকে মানতেন অবতার তত্ত্ব, তবে পরিশোধিতরূপে। যেমন বীরভদ্রপন্থী লৌকিক ধর্ম বিশ্বাসীরা মনে করেন কৃষ্ণের অবতার চৈতন্য এবং সেই চৈতন্যের অবতার বীরভদ্র। তাঁরা বললেন :

বীরচন্দ্ররূপে পুনঃ গৌর অবতার।
যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক এবার॥

পাছে এই বাংলা পয়ার লোকে না মানে তাই ধ্বনিবহুল সংস্কৃতে লেখা হ'ল :

শ্রীচৈতন্যং প্রভুং বন্দে প্রেমামৃতরসপ্রদং।
শ্রীবীরচন্দ্ররূপেন প্রকটিভূত ভূতলং॥

এই রকম যুক্তিক্রমেই কর্তাভজা সম্প্রদায় তৈরি করলেন আরেকরকম জনশ্রুতি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন গৌরচন্দ্র পুরীর জগন্নাথের মধ্যে লীন হয়ে যান। তারপরে গৃহী মানুষকে বৈরাগ্যধর্ম শেখাতে সেই গৌরচন্দ্র আবার আবির্ভূত হলেন আউলচন্দ্র হয়ে। এ-তত্ত্বের সমর্থক শ্লোক হ'ল :

কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র আউলচন্দ্র
তিনেই এক একেই তিন।

কর্তাভজারা এরপরে নতুন তত্ত্ব তৈরি করলেন যে, আউলচন্দ্র পরে আবার জন্মালেন সতীমা-র গর্ভে দুলালচন্দ্র হয়ে। এবারে নতুন শ্লোক তৈরি হ'ল :

তিন এক রূপ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ও শ্রীদুলালচন্দ্র

এই তিন নাম বিগ্রহস্বরূপ।

ঠিক এই রকমই অবতারবাদের রূপান্তর দেখা যায় সাহেবধনী সম্প্রদায়ে। তাঁরা মনে করেন সাহেবধনী আসলে ব্রজধামের শ্রীরাধার মর্ত্য অবতার। তাই তাঁরা গানে লেখেন :

সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটি শুনি
সেই ধনী এই সাহেবধনী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখারূপে যেসব গৌণ ধর্ম বাংলায় গ'ড়ে উঠেছিল আঠারো শতকে, তাঁরা কোন-না-কোনভাবে ছুঁয়ে গেছেন কৃষ্ণ বা রাধা বা চৈতন্যকে। কিন্তু বলরামীরা এই ক্রমটা তাঁদের ধর্মদর্শনে নেন নি। কেন নেন নি সে বিশ্লেষণ পরে করা যাবে। আপাতত বলা যেতে পারে যে বলরামী সম্প্রদায় এক অন্য ধরনের লোকধর্ম, যাঁদের পূর্ব সূত্রে বৈষ্ণবতা বা চৈতন্যবাদ নেই। বরং বিপরীত টানে এখানে উদ্ধার করা যায় বলরামীদেরই লেখা একটি গান, যেখানে সদানন্দ নামে পদকর্তা লিখছেন :

হাড়িরাম তত্ত্ব নিগূঢ় অর্থ বেদান্ত ছাড়া।
ক'রে সর্ব ধর্ম পরিত্যাজ্য সেই পেয়েছে ধরা॥
ওই তত্ত্ব জেনে শিব শ্মশানবাসী—
সেই তত্ত্ব জেনে শচীর গোরা নিমাই সন্ন্যাসী॥

এখানে কি মূল ব্যাপারটাই বদলে গেল না? বলা হ'ল একটি নতুন তত্ত্ব এই যে, শিব যে শ্মশানবাসী হয়েছেন বা গৌরাঙ্গ নিয়েছেন সন্ন্যাস তার মূলে হাড়িরাম বা বলরামের প্রণোদনা। কথাটা খুব নতুন, বিশেষ করে বাংলার চিরাচরিত লৌকিক বিশ্বাসে। বেদপুরাণ এমন কি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের উপরে এই যে বলরামকে স্থাপন করবার চেষ্টা তা খুব সহজ সরল ভাবনা থেকে হঠাৎ হয়নি। এর পেছনে আছে অনেক বড় পরিকল্পনার ছক, নিম্নবর্গের মানুষের একটা অন্ধ অভিমান কিংবা প্রতিবাদ। সেইজন্যই বলরামী বা এখন যাদের বলা হয় হাড়িরাম সম্প্রদায় তাঁদের বিবরণ লিখতে হবে অনেক সতর্ক বিচারদৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু তার আগে বলরামীদের সম্পর্কে আরেকটি বিবরণ আমাদের পড়ে নিতে হবে। এ বিবরণ লিখে গেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে, যা প্রকাশ পেয়েছিল ১৭৯২ শকে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে।

বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে, এই নিমিত্ত ইহার নাম বলরামী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি। ১২৫৭ সালের ৩০এ অগ্রহায়ণে অনুমান ৬৫ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়। বলরাম ঐ গ্রামের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে চৌকিদারি কর্ম্ম করিত। তাঁহাদের ভবনে আনন্দবিহারী নামে এক বিগ্রহ আছে, ঐ বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে, বাবুরা বলরামকে কিছু শাসন করেন। তাহাতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া, গেরুয়া বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, উদাসীন হইয়া যায় এবং এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় সংস্থাপন করে।

বলরামের শিষ্যরা তাহাকে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু বলরাম স্বয়ং যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল এমন বোধ হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, সে স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বলিয়া আভাসে আপনাকে পরিচয় দিত। তাহার শিষ্যেরা কহে, "বলরাম 'বাচক' ছিলেন এবং সত্য ব্যবহার করিতে বলিতেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি। বাচক শব্দের কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বলরাম বাক্যচতুর ছিলেন এবং সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে নিগূঢ়ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; এই নিমিত্ত তিনি বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এক দিবস তাহার কোন কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল? তিনি উত্তর করিলেন, 'ক্ষয়' হইতে আসিয়াছে। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসিল, 'ক্ষয়' হইতে কিরূপে হইয়াছে? তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, আদিকালে কিছুই ছিল না, আমি আপন শরীরের 'ক্ষয়' করিয়া অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে লইয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। এই নিমিত্ত ইহার নাম ক্ষিতি হইয়াছে। ক্ষয়, ক্ষিতি ও ক্ষেত্র সকলই এক পদার্থ। লোকে আমাকে নীচ জাতি হাড়ি বলিয়া জানে; কিন্তু তোমরা যে হাড়ি সচরাচর দেখিতে পাও, আমি সে হাড়ি নেই। আমি কৃতকার গড়নদার হাড়ি; অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে, তাহার নাম যেমন ঘরামী, সেইরূপ আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া আমার নাম হাড়ী।"

এই পর্যন্ত বিবরণ উদ্ধৃত ক'রে অতঃপর আমাদের কয়েকটি কথা আলাদাভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। বলরামের জন্ম নিতান্ত গরীব পরিবারে এবং তাঁর বাসস্থান ছিল মেহেরপুর গ্রামের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ভৈরব নদীর ধারে জঙ্গলাকীর্ণ অন্ত্যেবাসীদের পাড়ায়। তাঁর বৃত্তি ছিল চৌকিদারী, ধনীর বাড়িতে। নীচ জাতীয় এবং দরিদ্র ব'লেই হয়ত বিগ্রহের অলংকার চুরির দায় তাঁর ওপর গিয়ে পড়ে। উত্তমর্ণের শাসন তাঁকে করে উদাসীন বৈরাগ্যব্রতী। এখানে লক্ষণীয় যে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত বিবরণে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'অনন্তর কোন কারণবশতঃ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়', কিন্তু অক্ষয়কুমার সেই নিরুদ্দেশ বার্তাটুকু দেননি। এ প্রসঙ্গে একটু বাড়তি তথ্য দেন কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর 'নদীয়া-কাহিনী' (১৯১০) বইতে। তিনি লেখেন, 'মল্লিকবাবুদের গৃহবিগ্রহ আনন্দবিহারী দেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় বাবুরা বলরামকে চোর সন্দেহে কিছু শাসন করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া মনের আবেগে বলরাম উদাসীন হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মানুযায়ী যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় গঠন করেন'। অক্ষয়কুমারের বিবরণ অনুসারেই যে কুমুদনাথ তথ্য সাজিয়েছেন তা বেশ স্পষ্ট কিন্তু 'বৌদ্ধ ধর্ম্মানুযায়ী যোগ সাধনা' প্রসঙ্গটি নতুন। এছাড়া অক্ষয়কুমার যেখানে অলংকার চুরির দায় প্রত্যক্ষত বলরামকে দেননি সেখানে কুমুদনাথ স্পষ্টই লিখেছেন 'বলরামকে চোর সন্দেহে' কিছু শাসন করা হয়। ১৯৭১ সালে মেহেরপুর গিয়ে আমি নিজে যখন এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করি তখন স্থানীয় মানুষ জানান 'কিছু শাসন' বলতে প্রকৃত পক্ষে তাঁকে করা হয়েছিল গাছে বেঁধে প্রচণ্ড প্রহার। মেহেরপুরের জনশ্রুতি এমন কথাই বলে। এইখানেই লুকিয়ে আছে বলরামী সম্প্রদায় সৃষ্টির একটি নেপথ্য সূত্র। উচ্চবর্ণের প্রতি প্রতিবাদেই যে বলরামের প্রাথমিক সংগঠন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বাচক বিশেষণ ও মৌলিক চিন্তাভাবনার ক্ষমতা অক্ষয়কুমার তো নিজেই লিখেছেন। একজন প্রতিবাদী নেতার এ দুটো বিশেষ গুণ থাকা তো খুবই জরুরী। বলরামের জাতিচেতনার ব্যাখ্যাটুকুও খুব নতুন। উচ্চবর্ণ অভিজাত সমাজ সম্পর্কে বলরাম যে কতটা বিদ্রূপাত্মক ধারণা পোষণ করতেন তার নমুনা অক্ষয়কুমারের দেওয়া বিবরণের পরবর্তী অংশ থেকে বোঝা যাবে :

> একদিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েকজন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাঁহাদের ন্যায় অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া নদী-কূলে জলসেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটি

> ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলাই তুই ও কি করিতেছিস্ ? সে উত্তর করিল, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, এখানে শাকের ক্ষেত কোথায় ? বলরাম উত্তর করিল, আপনারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন তাঁহারা এখানে কোথায় ? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে, পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদী-কূলে জল সেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল না পাইবে কেন ?

না লিখলেও বোঝা যায় এই বলরাম নবচেতনালব্ধ এক সম্প্রদায়-স্রষ্টা বলরাম, যাঁর ভাবনাধারণা একটু অন্যরকমের এবং সেই ভাবনাকে প্রকাশের ধরনও বেশ ঋজু। তাঁর প্রতিবাদের ভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ। আর যাই হোক, অবক্ষয়ী চৈতন্য-সম্প্রদায়ের আরেক শাখা বিস্তার করতে বলরামের আবির্ভাব হয়নি। অধঃপতিত অবমানিত কিছু শূদ্র মানুষের নেতৃত্ব দেওয়াই ছিল তাঁর স্বারোপিত দায়িত্ব। সে কারণেই তাঁর ধর্মাচরণে প্রধান লক্ষ্য ছিল সদাচার ও জিতেন্দ্রিয়তা। উপভোগ নয়, বৈরাগ্য, অর্জন নয়, ভিক্ষা ছিল তাঁর শিষ্যদের আচরণীয়। অক্ষয়কুমার লিখেছেন :

> এ সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত নাই। ইহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ ; কেহ কেহ উদাসীন। উদাসীনেরা বিবাহ করে না অথচ ইন্দ্রিয়দোষেও লিপ্ত নহে। গৃহস্থেরা আপন আপন কুলাচার মতে উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই ; বিগ্রহসেবাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; গুরু নাই বলিলেও হয়। ব্রহ্ম মালোনী নামে একটি স্ত্রীলোক আছে ; বলরাম তাহাকে ভালবাসিত বলিয়া, সেই একপ্রকার এক্ষণে গুরুর কার্য্য করিয়া থাকে। বলরামী সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত। এক শাখার লোকরা বলরামের মৃত্যু স্থানের উপর একখানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়াছে ; সন্ধ্যাকালে তথায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। দ্বিতীয় শাখার লোকেরা, বলরামের এরূপ আজ্ঞা নাই বলিয়া তাহার মৃত্যু-স্থানের কোনরূপ গৌরব করে না।

উদ্ধৃত বিবরণে ব্রহ্ম মালোনী নামে যে মহিলার উল্লেখ আছে তাঁর ভূমিকা বিতর্কিত। অক্ষয়কুমার তাকে 'স্ত্রীলোক' এবং 'বলরাম তাহাকে ভালবাসিত' এমনতর সুভাষণ অলংকারে ঢেকে দিলেও সোমপ্রকাশের প্রতিবেদক লিখেছেন 'বলরাম হাড়ির উপপত্নী ভিন্নজাতীয়া ব্রহ্মময়ী নাম্নী' ব'লে। শেষোক্ত

প্রতিবেদক প্রত্যক্ষদর্শী ব'লে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু গোলমাল বাধে আরেকটি প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন পড়লে। সেটির লেখক গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সোমপ্রকাশের প্রতিবেদক বলরামের 'উপপত্নী'-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ১৮৬১ সালে, আর যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই মহিলার দেখা হয় ১৮৭২ সালে মেহেরপুরেই। তাঁর 'Hindu Castes and Sects' বইতে (১৮৯৬) যোগেন্দ্রনাথ লেখেন :

The Bala Hari Sect

> This sect was founded about half a century ago by a man of the sweeper caste named Bala Hari.
> His widow inherited not only his position, but all his powers. I met her in the year 1872.

এই বিবরণে দেখা যাচ্ছে গোঁড়া ব্রাহ্মণ যোগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মময়ীকে উপপত্নী বা স্ত্রীলোক বলেননি, বলেছেন বলরামের বিধবা পত্নী।* শুধু তাই নয় সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কিছু প্রশংসাও করেছেন। ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে বলরামীদের তাহ'লে এতটাই পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তাদের সংগঠন মেনে নিয়েছিল বলরামের স্ত্রীর নেতৃত্ব। যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মময়ীর কেমন আলাপচারি হয়েছিল তা উৎসাহী পাঠক পড়ে নেবেন তাঁর বই থেকে। আপাতত পাঠকদের বরং লক্ষ করতে বলবো অন্য এক দিকে। দেখা যাচ্ছে দুজন প্রত্যক্ষদর্শীই 'বলরামী' ব'লে সম্প্রদায়টির পরিচয় দেননি। একজন বলেছেন, 'বলরামচন্দ্রের ধর্ম', আরেকজন বলেছেন 'বলা হাড়ি সম্প্রদায়'। এখানে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কিছু কথা বলা প্রাসঙ্গিক। বলা হাড়ি সম্প্রদায় এখন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুরে। সেখানকার এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বলরামকে বলেন হাড়িরাম, এবং নিজেদের বলেন হাড়িরাম সম্প্রদায়। ব্রহ্মময়ীকে বলেন ব্রহ্মমাতা।

যোগেন্দ্রনাথ তাঁর বইতে হাড়িরাম সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গেছেন। তাঁদের অঙ্গচিহ্ন ও জীবিকা বিষয়ে জানা যায় যোগেন্দ্রনাথের জবানীতে :

---

* হাড়িরাম সম্প্রদায় মনে করেন ব্রহ্মমাতা ছিলেন হাড়িরামের সেবিকা। প্রাসঙ্গিক পদ : 'ব্রহ্মমাতা সঙ্গে এলো হাড়িরাম সেবার কারণ'।

> The followers of Bala Hari have no peculiar sect marks or uniform. Some members of the sect are in the habit of begging for food from door to door. They are known not only by the absence of sect marks on their person, but also by their refraining from mentioning the name of any God or Goddess at the time of asking for alms.

এই বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, হাড়িরামরা নিজেদের জনসমাজে প্রচ্ছন্ন ক'রে রাখতেন। কোন সম্প্রদায়-চিহ্ন বা অঙ্গবাস প'রে নিজেদের বাউল, দরবেশ ফকিরদের মত কিংবা ফোঁটা তিলক ডোরকৌপীন-পরা বৈষ্ণবদের মত নিজেদের জাহির করতেন না। গোপনে নিজস্ব ভজনসাধন ক'রেও মিশে থাকতে চাইতেন নিত্য দিনের জনপ্রবাহের স্বতঃস্রোতে। ভিক্ষাজীবী ছিলেন বটে কিন্তু ভিক্ষা কালে কোন দেবদেবীর নামোচ্চারণে তাঁদের রুচি ছিলনা। এর থেকেই বোঝা যাবে স্বয়ং বলরামও কখনও গৈরিক বাস পরেননি, যেমনটা অনুমান করেছেন অক্ষয়কুমার। যিনি প্রতিবাদী তিনি কেন প্রকাশ্য হবেন? তিনি তো খুব সঙ্গোপনে ছড়াবেন তাঁর অনুভূত বিশ্বাস আর প্রত্যয়ের কথাগুলি। কিন্তু বাস্তব সত্য এমনই যে নিম্নবর্গের চিন্তা ভাবনায় উচ্চবর্গের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদের সঙ্গেই থেকে যায় এক ধরনের সহকারিতাও। সেই তত্ত্ব মনে রেখে এবারে পড়া যাক অক্ষয়কুমারের মন্তব্য :

> দোলের সময় বলরাম স্বয়ং দোলমঞ্চে আরোহন করিয়া বসিত এবং শিষ্যেরা আবির ও পুষ্পাদি দিয়া তাহার অর্চ্চনা করিত।

এই বিবরণ যদি সত্য হয় তবে তার থেকে দোষেগুণে-ভরা বলরাম নামে একটি মানুষই বেরিয়ে আসেন। আপাতদৃষ্টিতে বৈরাগ্যব্রতী, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেদান্তবিরোধী হাড়িরাম যে শিষ্যদের কাছে এমন অর্চনা গ্রহণ করতেন তা ভাবতে অস্বস্তি লাগে। কিন্তু বলরামভজাদের এই নিতান্ত মানবিক উচ্ছ্বাস কি খুব অস্বাভাবিক? বিশেষত তাঁদের উচ্ছ্বাসের উপলক্ষ যখন তাঁদেরই সমাজের দুঃখতপ্ত আরেকজন মানুষ? যে-মানুষ তাঁদের সম্মেলক জীবনে এনে দেন গভীর তাৎপর্য ও বাঁচবার নিরলংকার ব্যাপ্তি?

যোগেন্দ্রনাথ তাঁর সরেজমিন ভ্রমণ থেকে পাওয়া যে-বিবৃতি লিখে গেছেন

তাতে নতুন কিছু মূল্যবান ইঙ্গিত আছে। সেগুলি বোঝবার জন্ম নিচের উদ্ধৃত অংশ মন দিয়ে পড়া দরকার।

> Bala Hari in his youth employed as a watchman in the service of local family of zeminders, and being very cruelly treated for alleged neglect of duty he severed his connection with them. After wondering about for some years, he set himself up as a religious teacher, and attracted round him more than twenty thousand disiples.

এখানে হাড়িরামের জীবন বিবরণে খানিকটা বাস্তবগ্রাহ্য সত্য রয়েছে। সোমপ্রকাশ এবং অক্ষয়কুমারের মন্তব্য পড়লে মনে হয় যেন বলরাম রাতারাতি বনে গেলেন উদাসীন, অর্জন করলেন ঐশীশক্তি ও বাচকত্ব। মেহেরপুরনিবাসী বিখ্যাত লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকার প্রথম বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৭) 'নদীয়া জিলার সিদ্ধযোগী' নামে এক নিবন্ধে বলরামচন্দ্র সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। অক্ষয়কুমার, যোগেন্দ্রনাথ বা কুমুদনাথের মত তিনি নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ লেখেননি। তাঁর তথ্য সমাহারে স্থানিকতা ও কিংবদন্তির এক উষ্ণ স্পর্শ আছে। প্রসঙ্গত এখানে বলরাম সম্পর্কে কিছু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য দীনেন্দ্রকুমারের রচনা থেকে উদ্ধৃত হ'ল :

> যৌবনকালে বলরাম, মেহেরপুরের বৈশ্যবংশীয় জমীদার মল্লিক বাবুদিগের বাড়ীতে বরকন্দাজের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু সে কার্য্য তাঁহার তেমন প্রীতিপ্রদ ছিল না। সেই সময়ে মল্লিক বাবুদিগের বৈষয়িক অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল, কমলার অনুগ্রহে, তাঁহাদের বৈভব ও মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল ; তখন তাঁহাদিগের গৃহে অনেক ভোজপুরী ও পুরুবিয়া ব্রাহ্মণ নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কেহ বরকন্দাজের কায করিত, কেহ প্রহরীর কায করিত, কেহ কেহ বা জমিদারী সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। বলরাম অবসর কালে এই সকল ব্রাহ্মণের নিকটে তুলসীদাসের রামায়ণ, দোঁহা ও নানাবিধ ভক্তিবিষয়ক পদাবলী এবং ভজনসঙ্গীত শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেন। তাঁহার একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া দোবে, চোবে, মিশির ঠাকুরেরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত।

দীনেন্দ্রকুমারের বিবরণ থেকে জানা যায় জমিদার কালক্রমে বলরামকে বর-কন্দাজের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে গৃহরক্ষকের কাজে নিয়োগ দেন। এই কাজে রত থাকাকালে গৃহ বিগ্রহের অলংকার চুরি যায় এবং 'গৃহস্বামী এই চৌর্য্য ব্যাপারে বলরামকেই সন্দেহ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, বলরাম যদি স্বয়ং চুরি না করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও, এই চৌর্য্য ব্যাপার বলরামের অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় নাই।...শুনিতে পাওয়া যায়, এই উপলক্ষে বলরামের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন চলিয়াছিল। বলরাম এইভাবে অপদস্থ হইয়া কলঙ্কভয়ে ক্ষুব্ধহৃদয়ে চাকরী পরিত্যাগপূর্ব্বক উদাসীনবেশে বাসগ্রাম ত্যাগ করিলেন। তাহার পর তিনি বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।'

গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে কতদিন বলরাম বাইরে ছিলেন তার একটি হদিশ দীনেন্দ্রকুমার দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> ইহার পর বলরাম বহুদিন পর্য্যন্ত স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; গ্রামের লোক তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়াছিল, সংসারে তখন তাঁহার আপনার বলিতে কেহই ছিলনা, সুতরাং তাঁহার কথা লইয়া কেহ আলোচনাও করিত না। অবশেষে সুদীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে উদাসীনবেশে বলরাম যখন মেহেরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া সাধারণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

হাড়িরামের তত্ত্ব ভাল ক'রে পড়লে তার মধ্যে যে-গূঢ় মেধাবী বিন্যাস ও যুক্তিক্রম চোখে পড়ে তার থেকে স্বচ্ছভাবে বুঝে নেওয়া যায় বলরাম দীর্ঘদিন অনুশীলন করেছিলেন। সেদিক থেকে যোগেন্দ্রনাথের ভাষায় 'after wandering about for some years' খুব সঠিক অনুমান। ঐ ক'বছরে তিনি যে কেবল পরিভ্রমণ করেন তাই নয়, সম্ভবত করেন খানিকটা মহৎ সঙ্গও। শ্রুতিবাহিত পথে শাস্ত্র ও ধর্মদর্শন সম্পর্কে তাঁর নিশ্চিত কিছু ধারণা জন্মায় নইলে তিনি কেমন ক'রে খাড়া করলেন বলরামী ধর্মের অন্যত্র প্রচলবিহীন ঐতিহ্যবিরোধী মৌলিক তত্ত্বগুলি? এছাড়াও তাঁর ধর্মমতে একটা অন্য আভা ছিল, যার অভ্রান্ত নিশানা টের পেয়ে যোগেন্দ্রনাথ লেখেন:

> The most important feature of his cult was the hatred that he taught his followers to entertain towards Brahmans. He was quite illiterate but he

had a power of inventing puns by which he could astonish his audience whenever he talked or debated.

তুখোড় বাক্‌শক্তিসম্পন্ন এই মানুষটি তর্ক ও বাক্যব্যবহারে ছিলেন কৌশলী। তাঁর বিশ হাজার শিষ্যকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে যুযুধান ক'রে তুলেছিলেন। কীসের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরোধ ?

এর জবাবে বলতেই হয়, বলরাম প্রতিভাবান ও বুদ্ধিমান সংগঠনকর্মী ছিলেন নিঃসন্দেহে কিন্তু নিছক ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষের জন্যই তৈরি করেছিলেন এক ধর্মমত এমন ভাবা অনুচিত। বাংলার সমাজ-ইতিহাসের তথ্য সাজালে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচনা করলে বোঝা যায় আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাঙালী শূদ্রজাতি নানা কারণে অসহায় হয়ে পড়েছিল। তাদের জীবনে সমাজ ও অর্থনীতিগত কোন নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা ছিলনা। যেকোন সময় নেমে আসতো উচ্চবর্ণের দমন পীড়ন ও ফতোয়া, যেমন হাড়িরামের ওপর এসেছিল অত্যাচার, লালনকে ত্যাগ করেছিল তার সমাজ, মারফতী ফকিরদের শারীরিক নির্যাতন করতো মোল্লাতন্ত্র। এই জন্যই ঘোষপাড়ার দুলালচাঁদ, ছেঁউরিয়ার লালন শাহ, বৃত্তিহুদার চরণ পাল, ভাগা গ্রামের খুশি বিশ্বাস এবং মেহেরপুরের বলরাম হাজরা—এঁরা সকলেই আলাদা আলাদা ভাবে ব্রাত্যজনের বাঁচবার জন্য একটা উদার বাতাবরণ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। নিছক প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নয়, টিঁকে থাকাও। তাই সংকীর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক'রে বাঁচা নয়, উদার সমন্বয়ী মানবধর্ম নিয়ে বাঁচা। আঠারো শতকের শেষার্ধের বাংলায় তখন অবক্ষয়িত মূল্যবোধের ভ্রান্তি সবদিকে। সামন্ততন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে তখন, তারা আঁকড়ে ধরতে চাইছেন শাক্ত ধর্মকে, শেষ আশ্রয় ভেবে। স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যমত শাস্ত্রীয় অনুশাসনের জাল বিছিয়েছে সর্বত্র। রাজশক্তির কেন্দ্র-মূলে অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্র। বিদেশী বণিক চালাচ্ছে বাণিজ্য। এই সময়েই তো সমাজে বেড়ে চলবে অলীক কুসংস্কার, অপদেবতা-উপদেবতার বন্দনা, শাস্ত্র সম্পর্কে অন্ধনির্ভরতা এবং আচারসর্বস্বতা। লোকধর্মের নেতারা এসব ভ্রান্তির হাত থেকে ঐ সময় বাঁচাতে চাইছিলেন অজ্ঞ মূর্খ নিচুজাতকে। জাতিবর্ণভেদহীন সমন্বয়বোধ এবং মানবতাবাদের শস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁরা লড়াই করছিলেন মূর্তি পূজা, ঘটপট শিলাপট্ট পূজা, শাস্ত্রশাসন ও বৈদিক মতের বিরুদ্ধে। অকারণ তীর্থভ্রমণ, ব্রাহ্মণনির্ভরতা ও অপদেবতা পূজার তাঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী। বলরাম এসব পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন একক মানুষ নন।

তিনি এই বেদনা থেকে উঠে-আসা এক ব্যথিত মানুষ। শুদ্ধসত্ত্ব ও বৈরাগী, উদাসীন অথচ প্রতিরোধকামী, একজন অবমানিত শূদ্রনেতা। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহৎবঙ্গে। বীরভূম পুরুলিয়া বর্ধমান নদীয়া রাজশাহী পাবনা রংপুর দিনাজপুর এমন কি কলকাতাতেও ছিল হাড়িরামের চেলা। কিন্তু নানা বিরুদ্ধ ঘটনার চাপে অচিরে এই সম্প্রদায় ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে। দেড়শো বছর পর আজকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত।

বলরামের প্রয়াণের বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় বিশ হাজার এবং তারা ছড়িয়ে ছিল বাংলার অনেকগুলি জেলায়। কিন্তু ১৯৭১ সালে আমি যখন এদের ব্যাপারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই তখন বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। তাই মেহেরপুরে প্রথমে যাই সরেজমিন দেখতে। ভৈরবের ধারে জঙ্গলের মধ্যে মালোপাড়ায় হাড়িরামের মন্দির আর পূজা প্রাঙ্গনের তখন ভগ্নদশা। সম্প্রদায়ী মানুষের সংখ্যাও খুব কম। যে-কজন সেখানে ছিলেন তাঁরা নিতান্ত দরিদ্র ও নীচুতলার মানুষ। হাড়িরামের রেখে-যাওয়া একজোড়া খড়মে নিত্য তেলজল দিয়ে স্নানসেবা ও যৎসামান্য ভোগারতির খানিকটা আন্তরিক আয়োজন তখনও অবশিষ্ট ছিল। সেই সেবা পূজার কাজ করতেন বৃন্দাবন নামে এক বলরামী। তাঁর কাছ থেকেই জানা যায় পূব পাকিস্তান হবার পর সংখ্যালঘু হিন্দুরা পড়ে কঠিন সংকটে। হাড়িরামদের অবস্থা হয় আরো কঠিন। তখন কে কোথায় ছিটিয়ে ছটকে পড়েন তার আর হদিশ হয় না। তারপরে আসে মুক্তিযুদ্ধ। সে সব ঝঞ্ঝাবাত্যা সামলে কজনই বা টিকতে পেরেছেন? বৃন্দাবনের জবানিতে জানা গেল যৎসামান্য যে কজন হাড়িরামী টিঁকে আছেন তারা আছেন মেহেরপুরের আশপাশে আর কুষ্টিয়ার বারখেদা অঞ্চলে। তাঁর কাছ থেকে আরও জানা গেল হাড়িরামীদের প্রধান আস্তানা এখন নদীয়াজেলার তেহট্ট, থানার নিশ্চিন্তপুরে। স্বতই প্রশ্ন জাগে, সেখানে কেন? তবে কি দেশভাগের পরে হাড়িরাম সম্প্রদায় বাস্তুত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্তপুরে আশ্রয় নিলেন? এখানে অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, মেহেরপুর থেকে নিশ্চিন্তপুর হাঁটাপথেই যাওয়া চলে এবং বরাবর এই দুই সাধনকেন্দ্রে যোগাযোগ আছে। মাঝখানে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। সাধারণ হাড়িরামী বিনা ছাড়পত্রে অবাধে দুদেশে যাতায়াত করেন। একটা গানে বলা হয়েছে:

তোমার মেহেরপুর ধাম
করলে পাকিস্তান।
নিশ্চিন্তপুরে এসে করলে নিত্যধাম ॥

এর আগে অবশ্য আরেক গানে শুনেছিলাম এইরকম যে,

দিব্যযুগে যে-হাড়িরাম
মেহেরপুরে তার নিত্যধাম ॥

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তাহলে নিত্যধামেরও বদল হয়ে যেতে পারে? এখানে নিত্যধাম-তত্ত্বটি বোঝা দরকার। লোকধর্ম মনে করে তাদের প্রবর্তক মানুষটি একজন দিব্যপুরুষ। একদা তিনি ছিলেন কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ বা অন্য কোন দেবতা। কলিযুগে সাধারণ মানুষকে গৃহী জীবনের ধর্ম শেখাতে, মানুষ-ভজনের আদর্শ বোঝাতে, তাঁর আবির্ভাব হয় মানুষরূপে। যেখানে সেই দেবতা বা দিব্যপুরুষ মানবলীলা করেন সেই স্থানকে বলা হয় নিত্যধাম। যেমন ঘোষপাড়ায় এসে লীলা করেছিলেন আউলচাঁদরূপে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, সেখানেই আবার আসেন সতী মা আর তাঁর সন্তান দুলালচাঁদ, তাই ঘোষপাড়া কর্তাভজাদের নিত্যধাম। তেমনই দিব্যযুগের হাড়িরাম মানুষরূপে বলরাম হাজরা নাম নিয়ে মেহেরপুরে জন্ম নেন। তাই তাঁদের গানে বলা হয়:

এক অসম্ভবের কথা শুনে
লাগলো জীবের দিশে।
যার দেখিনা আকার প্রকার সর্বশাস্ত্রে বলে—
সেই বস্তু মেহেরপুরে মানুষরূপে আসে ॥

এখানে নতুনত্ব এইটাই যে, হাড়িরামীরা তাঁদের নেতাকে দেবতার অবতার ব'লে মনে করেন না। তাঁদের বিশ্বাস, শাস্ত্র পুরাণেরও পক্ষে দুর্বোধ্য এক দিব্য বস্তু মেহেরপুরে মানুষরূপে এসেছিলেন, যা নাকি অসম্ভাব্য।

কিন্তু আমাদের ভাবনা ছিল আপাতত অন্যরকম অর্থাৎ মেহেরপুর থেকে হাড়িরামীরা কি বাস্তুত্যাগ ক'রে একযোগে চলে যান হাঁটা পথে নিশ্চিন্তপুর? এর উত্তরে বৃন্দাবনের কাছ থেকে জানা যায়, বলরাম তাঁর জীবিতকালেই যাতায়াত করতেন নিশ্চিন্তপুর। পলাশীর কাছে ভেঁজো গ্রামের তন্নু মণ্ডল নামে এক মাহিষ্য মেহেরপুরে এসে বলরামের প্রত্যক্ষ শিষ্য হন এবং তন্নুই তাঁকে নিয়ে যান নিশ্চিন্তপুরে। নিশ্চিন্তপুর মৎস্যজীবী নমঃশূদ্রদের এক নিঃস্ব গ্রাম। সেখানে এসে বলরাম এক বেলগাছ পুঁতে সেখানে গ'ড়ে তোলেন আখড়া। তন্নুও

পরে বানায় এক সাধনপীঠ আরেক বেলতলায়। এখনও সেই বেলতলাতেই হাড়িরামের খড়মে নিত্য তেলজল সেবা চলে। বৃন্দাবনের কাছে তনুয় সম্পর্কে একটি গানের চারটে পংক্তি পাওয়া গেল :

ত্রেতাযুগে ছিল হনু
মেহেরাজে নাম তার তনু।
পেয়ে রামের পদরেণু
চারযুগে সঙ্গে ফেরে ॥

এ-গানের সরলার্থ করলে অবশ্য গোলমাল বেধে যাবে। সরলার্থ বোধহয় এইরকম যে, ত্রেতাযুগে রামাবতারের পরম ভক্ত ছিলেন হনুমান, মেহেরপুরে সেই হনু হয়েছেন তনু। কিন্তু মেহেরাজ মানে আসলে উর্ধ্বলোক। হাড়িরামদের বিশ্বাস এই রকম যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারযুগের উর্ধ্বলোকে আছে এক দিব্যযুগ। সেই মেহেরাজে হাড়িরামের সঙ্গী ভক্ত ছিলেন যিনি তিনিই ত্রেতাযুগের হনুমান আর তিনিই মেহেরপুরের লীলায় হয়েছেন তনু। তারমানে ত্রেতাযুগে যিনি রামচন্দ্র, হাড়িরাম তাঁর অবতার নন, বরং রামচন্দ্রই হাড়িরামের অবতার। তাই তারা গানে বলে : 'ত্রেতাযুগে রামজী সেধেছিল দ্যাখো হাড়িরাম'। কিন্তু হাড়িতত্ত্বের জটিলতার ঘূর্ণিপাকে আমি এখন পাঠকদের জড়াতে চাইনা, কেন না সেজন্য তৈরি করতে হবে এক বিস্তারিত বাতাবরণ। আপাতত ফিরে যাওয়া যাক ভেঁজো গ্রামের একজন মাহিষ্য সমাজের সাধারণ মানুষ তনু মণ্ডলের প্রসঙ্গে।

সেই তনু বলরামকে আনেন নিশ্চিন্তপুরে। তারপরে নিশ্চিন্তপুরকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে হাড়িরামের ভক্ত সম্প্রদায়। মূলত তেহট্ট থানার অনেকগুলি গ্রাম ঘিরে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের বিস্তার ঘটে। ধরমপুর, ধাপাড়া, ধোপট, পলাশীপাড়া, সাহেবনগর, গোপীনাথপুর, ভবানীপুর এইসব গ্রামে ছড়িয়ে গেল হাড়িরামের তত্ত্ব। হাড়িরাম যাদের প্রত্যক্ষভাবে দীক্ষাশিক্ষা দিয়েছিলেন তাদের নাম জাতি ও সম্ভবক্ষেত্রে বাসস্থানের হদিশ এখানে দেওয়া গেল। তার থেকে কিছু ইঙ্গিত মেলে।

দিনু। জাতে মুচি। চাঁদবিল গ্রাম (বাংলাদেশ)
রামচন্দ্র। নমঃশূদ্র। নিশ্চিন্তপুর।
ধনঞ্জয়। জাতিপরিচয় অজ্ঞাত। বীরভূম।

রাজু ফকির। মুসলমান। গোপীনাথপুর।

নীলু। যুগী। বাসস্থান অজ্ঞাত।

সদানন্দ। হাড়ি। পঞ্চকোট।

শ্রীমন্ত। মাহিষ্য। নিশ্চিন্তপুর।

দক্ষ, জগ, হুট্টু। নারীশিষ্যা। ভিক্ষোপজীবিনী।

বলাই গেঁড়ো। মাহিষ্য। সাহেবনগর।

এঁদের মধ্যে অনেকেই হাড়িরামের মহিমা বর্ণনা ক'রে বা হাড়িরাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে পদাবলী লিখেছেন। দিনু ও সদানন্দের পদই সংখ্যায় বেশি।

এবারে বোঝা গেল, হাড়িরাম যদিও জন্মেছিলেন মেহেরপুরে এবং সাধক জীবনের বেশির ভাগ কাটান সেখানেই, কিন্তু সমান্তরালভাবে নিশ্চিন্তপুরকে ঘিরে গ'ড়ে তুলেছিলেন তিনি আরেক সংগঠন। তবে কখনই শিষ্য নির্বাচনে তিনি অন্ত্যজ বর্গকে ত্যাগ করেন নি এবং গ্রহণ করেন নি কোন সচ্ছল ধনী ব্যক্তিকে। আর একটা জিনিস দেখবার যে, তাঁর নিশ্চিন্তপুরের শিষ্যরাই প্রধানত তাত্ত্বিক ও গীতকার। তারাই মুখে মুখে শিষ্য-পরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখেছে হাড়িরামের তত্ত্ব আর বিধিনির্দেশ, তাঁকে নিয়ে বাঁধা গান। এখানে 'শিষ্য-পরম্পরা' শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক হ'ল না অবশ্য। কারণ হাড়িরাম সম্প্রদায়ে কোন গুরু নেই। আছেন একজন সংগঠন-পরিচালক তাঁকে বলা হয় 'সরকার'। তত্ত্বই ছিলেন প্রথম সরকার। সরকারের পুত্রই যে বংশানুক্রমে পরবর্তী সরকার হবেন এমন কোন নিয়ম নেই। সম্প্রদায়ের মধ্যে সৎ শুদ্ধ জিতেন্দ্রিয় অথচ তাত্ত্বিক-শ্রেষ্ঠই হবেন সরকার এমন নিয়ম আজও চালু আছে। এতে দুটো সুবিধে হয়েছে। অন্যান্য অনেক লোকধর্মের মত প্রবর্তকের বংশই কেবল শাঁসে জলে বাড়ছেন আর শিষ্যরা অনবরত দিয়ে চলেছেন খাজনা (যার আরেক নাম জরিমানা) এমন ঘটেনি হাড়িরাম সম্প্রদায়ে। এছাড়া গুরুবংশ বা গুরু-পর্যায় না থাকায় এ সম্প্রদায়ে 'সরকার' হবার অধিকার পেতে পারেন একমাত্র যিনি যোগ্য ব্যক্তি।

লক্ষ করা যায় যে, সোমপ্রকাশের প্রতিবেদক, অক্ষয়কুমার বা যোগেন্দ্রনাথ এমনকি দীনেন্দ্রকুমার কেউই নিশ্চিন্তপুরের সংগঠনের খবর দেন নি। তত্ত্ব বা তাঁর দলবলের কোনও লিখিত হদিশ তাই পাওয়া যায়নি। কিন্তু একটু ইঙ্গিত আছে। অক্ষয়কুমার ১৮৭০ সালে উল্লেখ করেছেন: 'বলরামী সম্প্রদায়

দুই শাখায় বিভক্ত। এক শাখার লোকরা বলরামের মৃত্যুস্থানের উপর একখানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; সন্ধ্যাকালে তথায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। দ্বিতীয় শাখার লোকেরা বলরামের এরূপ আজ্ঞা নাই বলিয়া, তাহার মৃত্যু-স্থানের কোনরূপ গৌরব করে না।' তবে কি এই দ্বিতীয় শাখার লোকেরাই তনুর দল? এই সন্দেহ অনেকটাই তথ্যের ভিত্তি পায় যখন ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'নদীয়া-কাহিনী'-তে আমরা পাই এমন খবর যে,

> তাঁহার বর্ত্তমান আশ্রমের দক্ষিণে ৯।১০ রশি ব্যবধানে ভৈরব তটে বলরাম ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুস্থানে এক মঠ নির্মাণ করিয়াছে। সম্প্রতি বলরামের সাম্প্রদায়িক এক শিষ্য নদীর অপর কূলে একটি নূতন আশ্রম করিয়াছে।

নিশ্চিন্তপুর অবশ্য কোনভাবেই ভৈরবের কূলবর্তী নয়। তবে ভৈরবের পূর্বে মেহের-পুর আর পশ্চিমে নিশ্চিন্তিপুরের অবস্থান এই পর্যন্ত ভৌগোলিক সত্য। মুস্কিল যে, কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর 'নদীয়া-কাহিনী' ক্ষেত্রানুসন্ধান করে লেখেন নি তাই বিবরণে কিছু ফাঁক থাকতেই পারে। তবে একথা সকলেই মানেন যে নিশ্চিন্তপুরে হাড়িরামের বেলতলা ছিল অন্যত্র এবং এখন যে বেলতলার আখড়ায় খড়মসেবা এবং মহোৎসব হয় সেই আশ্রম তনুর নির্মিত। তাই বলা যায়, হাড়িরামের প্রয়াণের পর মেহেরপুরে সংগঠন চালাতে থাকেন ব্রহ্মমাতা এবং নিশ্চিন্তপুরে সংগঠন পাকাপোক্ত করেন তনু। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা থেকে এই প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যায়।

> বলরাম চিরকুমার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি সেবাদাসী ছিল। এই সেবাদাসীর নাম ব্রহ্ম মালোনী। বলরামের মৃত্যুর পর সে আশ্রমের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল। নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক হইলেও, তাহার মুখে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিতে পাওয়া যাইত; বোধহয়, দীর্ঘকাল বলরামের সহবাসে তাহার প্রজ্ঞানেত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অনেকদিন পূর্ব্বে ব্রহ্ম মালোনীর মৃত্যু হইয়াছে, এখন জীবন দরবেশ নামক এক ব্যক্তি বলরামের আশ্রমের পরিচালক।

এই বিবরণ দীনেন্দ্রকুমার লেখেন ১৯১০ সালে। এই সময়েই তিনি উল্লেখ করে যান যে

> কিন্তু এখন এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচালক কেহ আছে বলিয়া বোধ

হয় না। বলরামি সম্প্রদায়ের মধ্যেও মতভেদ প্রবেশ করিয়াছে ; কতকগুলি ভক্ত আখড়ার সংস্রব ত্যাগ করিয়া আখড়ার প্রায় এক মাইল দক্ষিণে নদীর পশ্চিম পারে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে।

হাড়িরাম সম্প্রদায় দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল কিনা আজ তা নির্ণয় করা কঠিন তবে পরবর্তীকালে মোটামুটি দশ মাইলের ব্যবধানে দুটি পৃথক আশ্রমে (অবশ্য একই মহকুমায়) তাঁদের কেন্দ্র থাকায় উত্তরপুরুষদের কিছু সুবিধা হয়েছে। কেননা দেশ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধজনিত কারণে মেহেরপুরের হাড়িরাম সম্প্রদায় আজ হৃতসর্বস্ব ও বিচ্ছিন্ন ; তাঁদের নিত্যপূজা হাড়িরামের খড়মজোড়া পর্যন্ত অপহৃত। অথচ নিশ্চিন্তপুর থেকে আমরা পেয়ে যাই অনেক তথ্য, তত্ত্ব ও গান। খুঁজে পাই হাড়িরামের বলিষ্ঠ উত্তরসাধকদের। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি বলরাম শুধু হাড়িরামই নন ; তিনি হাড়িআল্লাও। কোন কোন মুসলমানেরও উপাস্য তিনি। ধর্মসমন্বয়ের একটা সুস্থবোধে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে সত্যিই নিশ্চিন্ততা আসে এবং সানন্দে তাদের কাছ থেকে আমি লিখে নিই এক আশ্চর্য গান :

ও হাড়ি আল্লা তোমার মত দয়াল আর কেউ নয়।
জীবের দশা মলিন দেখে মেহেরাজে হলেন উদয়॥
হাড়ি আল্লার বান্দা নবীর দুই রহমৎ
হাড়িআল্লা হাড়িআল্লা ব'লে সদাই করি ইবাদত॥
আমি পাপী আমি অধম
যেন তোমার নামটি বলি মুদম্
ভুলিনা রাম তোমার কদম
দুদমে তব গুণ গাই॥

পরবর্তী কৌতূহল থেকে জানতে পারি মেহেরপুর আর নিশ্চিন্তপুরে এখনও গতায়াত আছে। দুই জায়গাতেই বিশ্বাসীদের মধ্যে রয়ে গেছে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। এ ধর্মে 'সখার সখী নেই, সখীর সখা নেই'—তাই হাড়িরামরা পরস্পর ভাই-ভাই অথবা ভাই-বোন। সেই নির্মল অনুভব থেকেই মেহেরপুরের বৃন্দাবন আমাকে বলেছিলেন নিশ্চিন্তপুরের বেলতলার নিত্যসেবিকা রাধারাণী বোনের কাছে যেতে। এ সবই ১৯৫২ সালের কথা। এখন ১৯৫৬ সালে বৃন্দাবন প্রয়াত আর রাধারাণী অতিবৃদ্ধা।

১৯৭১-৭২ সালে বৃন্দাবন হালদারকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পেরেছিলাম, মেহেরপুরে হাড়িরামের যে আশ্রয় তার খাজনা দেওয়া হয় কৃষ্ণার নামে। কে সেই কৃষ্ণা তা অবশ্য জানা যায় নি। ইতিমধ্যে ১৯৮৫ সালে বৃন্দাবন ৮০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। সম্প্রতি ১৯৮৬-র মে মাসে মেহেরপুর সরেজমিন ঘুরে বন্ধু সাংবাদিক শ্রীমোহিত রায় আমাকে কিছু খুচরো খবর দিয়েছেন। তার ভিত্তিতে এখানে একটি বিবরণ পেশ করা যেতে পারে সকলের কাছে, হাড়িরাম সম্প্রদায়ের নিত্যধামের বর্তমান অবস্থা বোঝাতে।

ভূমিরাজস্ব বিভাগের খাতাপত্র অনুযায়ী বলরামের আশ্রমসন্নিহিত জমি দান করেছিলেন জমিদার জীবন মুখোপাধ্যায়। সেইখানেই মন্দির ও দালান তৈরি হয়েছিল। হাড়িরামের আশ্রমের জমির পরিমাণ ৩৫ শতক। এই জমি বলরামের নামে নথিভুক্ত। মেহের-পুর মৌজার অধীন এই জমির দাগ নম্বর ১৯২৩।

মন্দিরসংলগ্ন দালানের ছাদ পড়ে গেছে। মেঝে নেই। ঐ অংশ পরিত্যক্ত বলা যায়। এখন হাড়িরামের পাদুকা অপহৃত। বৃন্দাবনের মৃত্যুর পর হাড়িরামের নিত্যসেবার ভার পড়েছে সত্তর বছর বয়সী কমলকৃষ্ণ হালদারের উপর। এখন মন্দির সংলগ্ন মালোপাড়ায় থাকেন ১৪ ঘর মৎসজীবী। জাতে মালো। জীবিকা ভৈরব নদীতে মাছ ধরা। এঁরা সবাই হাড়িরামপন্থী। হাড়িরামের আখড়ায় সাম্প্রদায়িক গান করেন মাধব অধিকারী ও সম্প্রদায়। গানের যে কটি ছিন্ন নমুনা সাংবাদিক বন্ধু জোগাড় করেছেন তার পূর্ণরূপ আমি আগেই ১৯৭২ সালে নিশ্চিন্তপুর থেকে পেয়ে গেছি।

বর্তমান হাড়িরাম সম্প্রদায়ের বক্তব্য অনুসারে বাংলাদেশে এখন এই গোষ্ঠীর কিছু মানুষজন বাস করেন মেহেরপুর বাদে কুষ্টিয়া উপ-জেলার বারখেদা অঞ্চলে এবং কুষ্টিয়া উপজেলার উজানগ্রাম ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দুর্বাচারা গ্রামে। এখনও বারুণীর দোলের সময় অন্তত ২০০ ভক্ত আসেন এবং একতারা খোল, করতাল বাজিয়ে গান করেন। এঁরা কোন বিশেষ পোষাক পরেন না, কেবল সকলেই বাঁ হাতে ধারণ করেন পিতলের বালা।

প্রতিবেদন ছেড়ে এবারে আমরা নিশ্চিন্তপুরের হাড়িরাম গোষ্ঠীর কিছু খবর

জেনে নিতে পারি। ১৯৫২ সালে প্রথম যখন সেখানে যাই তখন বেঁচেছিলেন পূর্ণদাস হালদার আর তাঁর জ্ঞাতিভাই বিপ্রদাস হালদার। পূর্ণ তখনই নব্বই বছর ছাড়িয়েছেন, বিপ্র প্রবীণ তবে শক্ত সমর্থ। এই দুজনে দিনের পর দিন আমাকে হাড়িরাম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব শোনান মুখে মুখে। আশ্চর্য তাঁদের স্মৃতিশক্তি। বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য বিপ্রদাসের গানের সঞ্চয়। অজস্র গান তাঁর কণ্ঠ থেকেই ধরে রাখি টেপ রেকর্ডারে। আজ পূর্ণ ও বিপ্র দুজনেই বেঁচে নেই, টেপটা অবিকৃত আছে। তাঁদের তুল্য তাত্ত্বিকও এখন আর কেউ নেই হাড়িরাম সম্প্রদায়ে। এ সম্প্রদায় এখন ক্ষীয়মাণ শুধু নয়, বলা যায় বিলীয়মান। সে সময়ে সম্প্রদায়ের 'সরকার' ছিলেন চারুপদ মণ্ডল। অতিবৃদ্ধ সজ্জন মানুষটি থাকতেন ধাওয়াপাড়ায়। সেখানে গিয়েও সংগ্রহ করেছিলাম নানা গান ও তত্ত্বকথা। চারুপদ মণ্ডলের আগে 'সরকার' ছিলেন সাহেবনগরের গোষ্ঠদাস বিশ্বাস। তিনি ছিলেন খুব বড় তাত্ত্বিক। তাঁর ছেলে বয়োপ্রবীণ ফণী বিশ্বাস এখনও আছেন সাহেবনগরে। গানের গলা চমৎকার। যৌবনের দিনগুলো কেটেছে যাত্রাদলে বিবেকের গান গেয়ে। এখন আফশোস করেন উপযুক্ত পিতার কাছে হাড়ি-তত্ত্ব সে সময়ে তেমন ক'রে জেনে নেন নি বলে। তবু বাঘের ছেলে নাকি বাঘের দশা পায়। তেমনই গোষ্ঠদাসের ছেলে ফণী পেয়েছেন বাচকত্ব। তত্ত্বে ও গানে তিনিই এখন প্রবীণতম ও নির্ভরযোগ্য। গত দশবছরে বেশ কবার তাঁর কাছ থেকে মুখে মুখে আদায় হয়েছে অনেক কিছু।

নিশ্চিন্তপুরে শেষ সরকার ছিলেন বিপ্রদাস হালদার। তাঁর মৃত্যুর পর নাকি তেমন আর 'মান্যমান' নেতা জোটেনি। এখন তাই হাড়িরাম সম্প্রদায় খানিকটা নেতৃত্বহীন, ছাড়াছাড়া। তবে বেলতলার সেবাপূজা রোজই হয়। রাধা-রাণী অতিবৃদ্ধা তাই তাঁর মেয়ে এখন সব দিক সামলায়। তন্তুর পোঁতা বেলগাছের একটা বড় ডাল প্রায় ভেঙে প'ড়ে মাটি ছোঁয়-ছোঁয়। তাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে ইটের গাঁথনি দিয়ে। একদিক থেকে ভাবলে এটাই হাড়িরামদের প্রতীকী অবস্থা এখনকার। ভেঙে নুয়ে-পড়ার দশা তবু ঠেকিয়ে রেখেছে ক'জন তাদের আন্তরিকতা ও বিশ্বাস দিয়ে। নিশ্চিন্তপুর গ্রামের পাশে বয়ে-যাওয়া বাওড়ে তেমন আর মাছ ওঠে না। হাড়িরাম তত্ত্বের টোপেও তেমন আর শিষ্যসেবক ধরে কই? বয়ে-যাওয়া বাওড়ের প্রাণদায়ী স্রোতের মত বয়ে চলেছে বিশ্বাসের

ধারা। বৃন্দাবন গেছেন, রাধারাণীও যাই যাই করছেন। নতুন সরকার কেউ নেই। আর কে আছেন তেমন? সাহেবনগরের ফণীকে বাদ দিলে আছেন নিশ্চিন্তপুরের হারান হালদার আর সুশান্ত হালদার। আছেন বিপ্রদাসের ছেলে নেপাল হালদার। ধরমপুরে আছেন গণেশচন্দ্র মণ্ডল, ধাওয়াপাড়ার হাজারি মণ্ডল, পলাশীপাড়ার মহাদেব নাথ। ধাওয়াপাড়ায় আরো আছেন গোবিন্দ মণ্ডল, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস আর নাড়ুগোপাল চৌধুরী। চাঁদের ঘাটে আছেন উপেন মণ্ডল। এঁদের কাছ থেকেই হদিশ মিললো বীরভূম কামার-হাটির বিনয়কৃষ্ণ ভদ্রের, বাঁকুড়ার কাঁটিপাহাড়ির শালুনী গ্রামের রূপগোপাল সাধুর। জানা গেল বর্ধমানের সালানপুরে ছিলেন চাম দাস, আলুটিয়ায় ছিলেন চামপদ দাস। এঁরাই সব এককালের প্রধান হাড়িরামী। আরও কত প্রচ্ছন্ন ভক্ত আছেন কে জানে? মেহেরপুর আর নিশ্চিন্তপুরের বাইরেও যে এখনও বলরামীরা আছেন এ খবর ভাসা ভাসা জানা যায় নিশ্চিন্তপুর ও ধাওয়াপাড়ায়। সেখান থেকে ঠিকানা পেয়ে কিছু কিছু জায়গায় চিঠি লিখি। কেউ কেউ জবাবে আমন্ত্রণ জানান। সেইমত বাঁকুড়া জেলার কাঁটিপাহাড়ি এলাকার শালুনি গ্রামে হাজির হয়ে জানা যায়, অনেক বছর আগে ঐ গ্রামের উদাসীন স্বভাবের রমানাথ সাধু ঘুরতে ঘুরতে একদা নিশ্চিন্তপুর ও ধাওয়াপাড়ায় আসেন। সেখানে হাড়িরামের ধর্মে দীক্ষা নেন রমানাথ। পরে শালুনি আর নিশ্চিন্তপুরের দূরত্ব ও দুর্গমতার জন্য রমানাথ তাঁর অঞ্চলে আলাদা আশ্রম গড়ার অনুমতি চেয়ে নেন।

এইভাবে গড়ে ওঠে পুরুলিয়া জেলার দৈকেয়াড়ি গ্রামে হাড়িরামীদের এক আখড়া। সেখানকার শূদ্ররা দীক্ষিত হন নবধর্মে। পরে রমানাথ সাধুর সঙ্গে দৈকেয়াড়ির নবদীক্ষিত ব্যক্তিদের মনোমালিন্য হয়, তখন তিনি নিজের গ্রাম শালুনিতে আশ্রম গড়েন। সাম্প্রতিক সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে ঐ অঞ্চলে এখন চারটি আশ্রম। বাঁকুড়া জেলার শালুনি আর পুরুলিয়া জেলার দৈকেয়াড়ি, পঞ্চকোট আর ভাণ্ডাড়িয়া। এর মধ্যে দৈকেয়াড়ির আশ্রম প্রাচীনতম ও প্রধানতম। সেখানকার 'সরকার' ছিলেন প্রয়াত দুর্গাদাস, যাঁর লেখা অনেক গান আছে। এখন বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের হাড়িরামীদের 'সরকার' হলেন প্রেমচন্দ্র। তিনি থাকেন পুরুলিয়ার পঞ্চকোটে। এ অঞ্চলের চারটি আশ্রমেই তিনদিনব্যাপী একটি মহোৎসব হয় চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে (অর্থাৎ মেহেরপুর আর নিশ্চিন্তপুরের আবির্ভাবতিথির সময়)। এছাড়া জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে হয় ফলোৎসব, কার্তিক মাসে হয় নবান্ন।

বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলের হাড়িরামী ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন প্রধানত উপজাতি-ভুক্ত বাউড়িরা। এঁরা সংগঠিত, ভক্তিপ্রবণ ও বিশ্বাসী। কিছুটা রাজনৈতিক সচেতনতাও এঁদের মধ্যে আছে। মেহেরপুরে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের নিঃশেষিত অবস্থা এবং নিশ্চিন্তপুরের ক্ষীয়মাণতার পাশে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার হাড়িরামীদের অবস্থা বেশ আস্থা ও স্বস্তি জাগায়। তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস, সম্মেলক কীর্তন ও সংগঠন রীতিমত চমকে দেয় আমাদের। নদীয়ায় নতুন প্রজন্ম আজ আর এ-ধর্মসম্প্রদায় বিষয়ে উৎসুক নয়। অথচ বাঁকুড়ার এই রুক্ষ পাথুরে ভূখণ্ডে পাওয়া যায় এক ভিন্নচিত্র। বাইশ বছরের যুবক থেকে আশী বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় হাড়িরামের নামগান করে। (দ্রষ্টব্য: এই বইয়ের পরিশিষ্ট অংশ)

এখন বছরে তিনটে মহোৎসব হয় নিশ্চিন্তপুরে। মেহেরপুরেও আদি থেকে তাই হতো। যেমন দেখা যাচ্ছে, মেহেরপুরে বলরামের আখড়ায় আমবারুণী উপলক্ষে যে মহোৎসব হতো তার বিবরণ লিখে গেছেন ১৯১০ সালে দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর বিবরণ এইরকম :

> বৎসরান্তে বারুণীর যোগের সময় বলরামের আখড়ায় যে মহোৎসব হয়, সেই উৎসব উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ কয়েকদিন ধরিয়া মৃদঙ্গাদি যন্ত্র-সহযোগে মহোৎসবে বলরামের নাম সংকীর্তন করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে আখড়ায় তিনদিন 'মচ্ছব' হইয়া থাকে, প্রথম দিন অন্ন মচ্ছব, দ্বিতীয়দিন চিঁড়ে মচ্ছব, শেষদিন লুচি মচ্ছবে মধুরেন সমাপয়েৎ হয়। এই আখড়ায় বহুকালের পুরাতন আমানি সঞ্চিত আছে, এই আমানি বলরামের প্রসাদ বলিয়া খ্যাত; নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া এই আমানি পানে নিরাময় হইয়াছে। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

চৈত্র মাসের একাদশী, জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি আর কার্তিক মাসের একাদশী এই তিনটি উৎসবের মধ্যে চৈত্রমাসের কৃষ্ণা একাদশী, যাকে বলে আমবারুণী, সেই মহোৎসবেই এখনও জাঁক হয় বেশি। তিনদিনের মচ্ছব। অনেক ভক্ত আসেন। কিন্তু হাড়িরাম সম্প্রদায় এসব জমায়েতকে মহোৎসব বলেন না, বলেন 'পাঁচ ভাইয়ের মিলন'। বেলতলায় আর একটা মহোৎসব হয় পয়লা মাঘ। ভারী আশ্চর্য সেই আয়োজন। গ্রামের সব মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ-শিশু, সেদিন

চাল-ডাল-গাছের ফল-জমির ফসল একসঙ্গে জোগাড় ক'রে এনে বেলতলায় খিচুড়ি রেঁধে খান। এঁরা বেশির ভাগই হাড়িরাম সম্প্রদায়ের নন। তবু সেই সর্বত্যাগী মানুষটি এঁদের সম্মিলিত শ্রদ্ধা ও প্রণাম পান আলাদা ভাবে বছরে ঐ একটি দিন। সেদিন বেলতলায় ষষ্ঠীপুজোর মত চালন দেন মহিলারা। চালনে থাকে মুড়ি, মুড়কি, গুড়ের পাটালি। বেলগাছে জড়িয়ে দেওয়া হয় একটা ধুতি আর শাড়ি। হাড়িরাম বলতেন জগতে দুটো মোটে জাতি—পুরুষ আর নারী। বেলতলায় কি তারই প্রতীকী সজ্জা? বেলতলাই বা কেন? হাড়িরাম বা তন্ন কেন অন্য গাছ বাদ দিয়ে কেবল বেলতলাতেই আশ্রম গড়েন? তাত্ত্বিক ফণী বিশ্বাস বুঝিয়ে দেন একদিন: বেল মানে শ্রীফল। ও হলো আদ্যাশক্তির স্তন। বেলতলায় থাকা মানেই আদ্যাশক্তির কোলে থাকা।

পয়লা মাঘ কি সেই জন্যেই বেলগাছে ধুতি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়? আদ্যাশক্তির আশ্রয়ে জগতের দুই জাতি—পুরুষ আর নারী। হতেও পারে। কত কল্প-কাহিনী, কত রোমাঞ্চভরা জীবন কথা, কত উপাখ্যান ঘিরে থাকে লোক-ধর্মে। পুথি-পড়া বিদ্যায় সব গল্পের অর্থ ভেদ করাও কঠিন অনেকসময়। কে বলে দেবে হাড়িরামীরা কেন কতকগুলি বিধিনিষেধ আজও মেনে চলে? তারা সুদ নেয়না, গঙ্গা-স্নান করে না, মালা পরে না, মন্ত্র নেয়না এবং কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না। কেন? তার উত্তর আছে হাড়িরাম তত্ত্বে।

সেই তত্ত্বে প্রবেশ খুব সহজে হবার নয়। খুব সতর্কভাবে ধীরে ধীরে পাঠকদের আমি নিয়ে যেতে চাচ্ছি অবশ্য সেদিকেই। তার আগে এখন বরং বলা যাক তাঁর দুজন প্রত্যক্ষ শিষ্যের কাহিনী। রামচন্দ্র আর ধনঞ্জয়ের ঘটনা। এঁরা দুজনেই হাড়িরামের কাছে দীক্ষা-শিক্ষা নিয়ে সাধন ভজন ক'রে তাঁকে খুশি করেন। তখন হাড়িরাম তাঁদের বলেন পছন্দমত কোন কিছু কৃপা চেয়ে নিতে তাঁর কাছে। রামচন্দ্র ছিলেন জাতে নমঃশূদ্র, বিনয়ী। তিনি হাড়ি-রামের চরণে দুই চোখ বুলিয়ে বললেন ঐ চরণে যেন তার মতি থাকে। এর ফলে তিনি পেলেন প্রখর দৃষ্টিশক্তি। একশো দশ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান তার অব্যবহিত আগেও খালিচোখে পড়ছিলেন রামায়ণ।

ধনঞ্জয়ের কাহিনী অবশ্য অন্যরকম। রামচন্দ্র যখন চাইলেন ভক্তি এবং হাড়ি-রামের চরণে মতি, তখন ধনঞ্জয় চাইলেন অর্থ ও সচ্ছলতা। তাই পেয়ে গেলেন তিনি।

এই দুই কাহিনী লোকজীবনের দুটি দিককে ফোটাতে চায়। দুজনই চাইল ঐশ্বর্য, অবশ্য দু অর্থে। দুজনেই পেল তাদের অভীষ্ট। নিম্নবর্গের অন্ত্যজ মানুষের ভক্তিপ্রনত হ'তে চাওয়া যতটা স্বাভাবিক, ধনসম্পদ চাওয়াটাও ততটা সংগত। এই যুগ্ম কাহিনী বোধহয় হাড়িরাম তত্ত্বের জীবনধর্মিতাকে ব্যক্ত করছে।

হাড়িরামের বাচকত্বের একটি ধারা তাঁর সম্প্রদায়ে এখনও বয়ে চলেছে। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বইতে বলরামের বাক্শক্তি ও শব্দশ্লেষের কিছু সংগৃহীত নমুনা পেশ করেছিলেন, এখানে তা পুনরুক্তিযোগ্য। যেমন:

১. রাঁধুনি নেই রাঁধলে কে?
রান্না নেই তো খেলেন কি?
যে রাঁধলে সেই খেলে এই দুনিয়ার ভেল্‌কি।

২. যেয়েও আছে থেকেও নাই
তেমনই তুমি আর আমি রে
আমরা মরে বাঁচি বেঁচে মরি।

৩. তিনি তাই তুমি যাই
যা তিনি তাই তুমি।

৪. যম বেটা ভাই দু মুখো থলি
তাই জন্যে ওর আঁৎটা খালি।
ও কেবল খাচ্ছে খাচ্ছে
ওর পেটে কি কিছু থাকচে থাকচে থাকচে?

৫. চক্ষু মেলিলে সকল পাই
চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই।
দিনে সৃষ্টি রাতে লয়
নিরন্তর ইহাই হয়।

এই যে আর্যা-তর্জা রচনার মৌখিক কৌশল, লোকধর্মের এই চলমান সজীবতা কিন্তু হাড়িরাম সম্প্রদায়ে এখনও বেশ প্রবল। এঁরা প্রকৃতি সাধনা করেন না আর সেকথা বলেন ঠারেঠোরে এই ভাবে: 'সখার সখী নেই সখীর সখা নেই'। দুর্গা কালী রাধা কৃষ্ণ না ভজে কেন এঁরা ভজন করেন একজন মানুষকে? এর জবাব: 'যাহা দেখিনি নয়নে তাহা ভজিব কেমনে?' অর্থাৎ ঐসব দেবদেবী

অনুমান বা পুরাণের বিষয় আর হাড়িরাম স্বয়ং মানুষ, তাঁকে চাক্ষুষ দেখা গেছে।

ফণী বিশ্বাস এখনও এমনই ঐতিহ্যবাহিত ভাষায় কথা বলেন। তাঁকে বলতে বললে অনর্গল ব'লে যাবেন এবম্বিধ সংলাপ। যেমন :

প্রশ্ন : হাড়িরাম কে ? আমি কে ?

উত্তর : তিনি কিঞ্চিৎ ঘন, আমি কিঞ্চিৎ কণ (কণামাত্র)

প্রশ্ন : হাড়িরামকে বলে রামদীন। রামদীন কি ?

উত্তর : 'রা' শব্দে পৃথিবী বোঝায়
'ম' শব্দে জীবের আশ্রয়
'দীন' শব্দে দীপ্তাকার হয়
নামটি স্মরণ করলে তাঁর ॥

প্রশ্ন : নারী সংগম করার নিয়ম কি ?

উত্তর : মাসে এক বছরে বারো
তারও কম যতটা পারো।

যেখানে এমন আর্যা-তর্যা বা বাচকত্বে তত্ত্ব ব্যাখ্যা হয় না হাড়িরামীরা সেখানে ব্যবহার করে পদ। যেমন ধরমপুরের গণেশ মণ্ডলকে যখন জিজ্ঞাসা করা গেল, কেন তাঁরা কাউকে প্রণাম করেন না, তিনি জানালেন ছড়া কেটে :

দেহ আমার শ্মশানের সমান
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে
করলে ফুলবাগান।

এ-ছড়ার অর্থ চমৎকার। হাড়িরাম তাঁর ভক্তের ভিতরে যে-চেতনারূপ আগুন দান করেন তা আর কাউকে দান করা যায় না। একটা মৃত কাঠে যদি আগুন লাগানো যায় তবে সেই জলন্ত কাঠে যে হাত দেবে তারই হাত পুড়বে। হাড়িরামের ভজনবিহীন যে ভক্তদেহ সে তো শ্মশানতুল্য, হাড়িমন্ত্র তাতে আগুনের দীপ্তি ও তেজ আনে। তা কি অন্য কেউ সইতে পারে ? তাই প্রণাম নিষিদ্ধ।

বিপ্রদাসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুসলমানদের মধ্যে যারা হাড়ি-রামকে মানে তারা কি ইসলামের পথ ত্যাগ করে ? জবাবে তিনি গুনগুনিয়ে বলেন :

জাহেরে বিসমিল্লা
বাতুনে হাড়িআল্লা।

অর্থাৎ তাঁরা প্রকাশ্যে বিসমিল্লা বললেও মনের গভীরে উচ্চারণ করেন হাড়ি-আল্লার নাম। এসব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, হাড়িরামের মতামত অনেকটা যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তিকতার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য বিন্যাস তাঁদের ভাবনা চিন্তায় গাঁথা আছে। পরমত খণ্ডন এবং নিজমত প্রতিষ্ঠা এই তাঁদের লক্ষ্য। সেইজন্য যুক্তির গ্রন্থি তাঁরা দেন বুদ্ধির সন্নিপাতে। তৈরি হয় তাঁদের গান। যেমন, 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি' এই প্রসিদ্ধ শ্লোককে খণ্ডন করতে তাঁদের এমন গান বাঁধতে হয় যে,

কেউ বলে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা
কেউ বলে বিষ্ণু পালন কর্তা
কেউ বলে শিব সংহার কর্তা
তবে আর এক ব্রহ্ম থাকে না।

সাধারণ মানুষ এসব কথায় খুব মুগ্ধ হয়। হাড়িরামদের লক্ষ্য সেইটাই।

সাহেবনগরের কাছে এক বৈষ্ণব আখড়ায় একবার গিয়েছিলেন ফণী বিশ্বাস তাদের সাধন ভজনের ধারা দেখতে। কীর্তনের পরে হলো বাল্যভোগ। মহান্ত সেই ভোগ সেবা করতে বললেন ফণীকে। সঙ্গে সঙ্গে ফনী আউড়ে নিলেন হাড়িরামের নিষেধবাণী :

না করিব অন্যদেবের নিন্দন বন্দন।
না করিব অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ॥
মৎস মাংস না খাইব তৈল না মাখিব গায়।
নারীসঙ্গ না করিব আপন ইচ্ছায়॥

অতএব তিনি কৌশলে এড়াতে চাইলেন সেবা। মহান্ত তাঁর অনিচ্ছার কারণ জানতে চাইলে ফণী বললেন, 'সেবা তো নেব কিন্তু দেব কাকে?' মহান্ত বললেন, 'কেন? সেবা দাও পরমাত্মাকে'। উত্তরে ফণী বললেন, 'মহান্তজী, এই বাল্যভোগ তো আপনার পরমাত্মাকে উৎসর্গ করা, তা আমি সেই উচ্ছিষ্ট বস্তু কেন আমার পরমাত্মাকে সেবা দেব বলুন তো?' মহান্ত হেরে গেলেন যুক্তির চাপে।

এ ঘটনা আমি নিজে ফণী বিশ্বাসের কাছে শুনেছি আর তারিফ করেছি

তাঁর আগ্রত যুক্তিবে। অনেকবার মনে হয়েছে বাংলার যে সব লৌকিক গৌণ ধর্ম এখনও সচল তাদের মধ্যে হাড়িরামের চেলারা সবচেয়ে সতর্ক ও শানদার। নিশ্চিন্তপুরে তাঁরা যে বছরে তিনবার মিলিত হন তা নিছক অন্নপানের জন্ত নয়, তার নেপথ্যে থাকে যুক্তি বুদ্ধির শান দিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্যে গড়ে তোলা এক অকাট্য চিন্তার জগৎ। কেননা, যুক্তি দিয়েই তাঁরা আকর্ষণ করেন নতুন মানুষদের। সহজিয়া ধর্ম বা বাউল দরবেশদের মত তাঁদের মতে তো নারীভজনের রোমাঞ্চকর অনুষ্ঠান নেই। নেই কোনরকম যৌন যোগাচারের রহস্য। চারচন্দ্র-সাধনার মত কোন দেহকেন্দ্রিক আহ্বান গোপনে তাঁরা কাউকে দেন না। দীন দরিদ্র দুঃখভারনত মানুষ সব হাড়িরামীরা। এঁদের ধর্মাচরণে নারী সঙ্গী নেই ব'লে বিকৃতি নেই। গুরু নেই ব'লে শোষণ নেই। সম্প্রদায়ে উচ্চ বর্ণের কেউ নেই ব'লে চিরাগত শাস্ত্র আর সংস্কৃত মন্ত্রের সংক্রাম ঘটেনি। এঁদের গদী নেই, মহান্ত নেই, খাজনা নেই, আসন নেই। এমন মুক্ত নির্মল সুযোগসুবিধাহীন ধর্মসম্প্রদায় কি কখনও বহুজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? সেই জন্যই সংখ্যালঘিষ্ঠ হাড়িরামীরা শাস্ত্রের নির্বোধ অনুশাসনের পথে গা ঢেলে দেয় না, ধর্মের নামে ভাসে না যৌনতায়। কেবলই আত্মশাসন আর আত্মপ্রতিষ্ঠা করে যুক্তির পথে, প্রতিবাদী চেতনায়।

'কর স্থিতি ওহে পিতাপাতি'

হাড়িরাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন মেলামেশা ক'রে, তাদের গান ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যা খুব ভালভাবে অনুধাবন ক'রে আমার মনে হয়েছে, উনিশ শতকের যে-পর্বে তাঁরা গ্রাম বাংলায় নিজেদের সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন সেই পর্বে তাঁদের লড়াই ছিল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যতটা, তার চেয়ে বেশি বৈষ্ণবদের সঙ্গে। এখানে বৈষ্ণব বলতে বুঝতে হবে সহজিয়া বৈষ্ণব এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ের নানা অধঃপতিত শাখা। এ সময়ে গ্রাম বাংলায় নৈষ্ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রভাব তেমন ছিল না। তারা আত্মকলহে দীর্ণ ছিল ও স্মার্ত ব্রাহ্মণ সংক্রামে হয়ে উঠেছিল ভদ্রলোকশ্রেণীর পক্ষে গ্রহণীয়। গ্রামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গজিয়ে উঠেছিল যে সব আখড়া তার ছিল প্রকাশ্য ও গোপন দুটি রূপ। প্রকাশ্যে চলত নামকীর্তন, মালসাভোগ, জপ তপ তিলকসেবা আর গোপনে চলত কলমী-পুথি প'ড়ে দেহ-কড়চার ধারায় যৌন-যোগ সাধনা। একধরণের অলস দায়িত্বহীন অথচ ভোগবাদী ধর্মজীবন সাধারণ মানুষকে খুব সহজে বিকৃতির পথে টানতেই পারে। ঠিক তাই হলো এবং বৈষ্ণব সমাজের নামে একদল মানুষ চালাতে লাগলো যথেচ্ছ শাস্ত্র ব্যাখ্যা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা। কিশোরী ভজন নামে একধরনের বিকৃত যৌনাচার চলতে লাগলো। পরকীয়া সাধনার নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করলেন তাঁরা। 'আরোপ' সাধনা নামে একটি তত্ত্ব খাড়া করে একদল সহজিয়া বৈষ্ণব ঘোষণা করলেন পুরুষ মাত্রই কৃষ্ণ, নারী মাত্রেই রাধা। এবারে খুব সহজে চলতে লাগলো তাদের অবাধ সংসর্গ। এ সবের মাঝখানে নায়কত্ব নিলেন প্রবল পরাক্রান্ত গুরু সম্প্রদায়। চালু হলো 'গুরুপ্রসাদী' নামে এক কুৎসিত প্রথা। যে-প্রথায় শিষ্যের পত্নী হ'লেন গুরু-ভোগ্যা। অনেক গৌণ ধর্মের উপদল এসব বিকৃত ধর্মাচারে বিশ্বাসী ছিল এবং এখনও আছে। বাউল বৈরাগী দরবেশ ও সহজিয়ারা যে চতুর্দিকে এত সন্দেহ অর্জন করেছে তার মূলে আছে কিছু মানুষের ধর্মের নামে গোপন স্বেচ্ছাচার।

এঁদের সম্পর্কে অনেক রামলাল শর্মা প্রশ্ন তুলেছিলেন :

সাধু কি করিয়া থাকে প্রকৃতির সঙ্গ।
সাধু কি ধরিতে চায় কলুষ ভুজঙ্গ॥
সাধু কি কপট ফাঁদ বিস্তৃত করিয়া।
রাঁড় ভাঁড় আতুরাদ্ধে খায় ভুলাইয়া॥

উনিশ শতকের অনেক গ্রন্থে সহজিয়া বৈষ্ণব ও অন্যান্য লোকধর্মের গোপন পরকীয়া সাধনাকে খুব খারাপ চোখেই দেখা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শুদ্ধা ভক্তি অর্জনের কথা বলছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের, তখন সমাজের চারিদিকে নানা স্তরে চলছিল ব্যাভিচারের স্রোত। অনেক লেখক ও পদকার লোকধর্মের ও সহজিয়াদের গুহ্য আরোপ সাধনার নিন্দা করে গেছেন। এসব অনুষ্ঠানে নাকি গুরু মহান্ত আর তাঁর শিষ্যারা অনেক সময় বৃন্দাবন লীলা বা বস্ত্রহরণের মহড়া দিতেন। দাশরথি রায় এঁদের কথা লিখে গেছেন ব্যঙ্গাত্মক ঢংয়ে এইভাবে যে, গুরু—

বৃক্ষে উঠি হবেন মুরলীধর
আমরা করে ঢাকিব পয়োধর
হেসে আধা করিব অধর
তখন কত সুখ পাবে।
হবে ব্রজের লীলা শুন বলি
কেউ বৃন্দে কেউ চন্দ্রাবলী
ললিতে আদি কেউ হবে শ্রীরাধা।
লেগে যাবে ভারি চটক
কেউ কারে করিবে না আটক
কর্মে দিবে না কেউ বাধা॥

এই সব গোপন সাধনা ছাড়াও ছিল দুইচন্দ্র ও চারচন্দ্রের সাধনা। দুইচন্দ্র মানে মল-মূত্র সেবা এবং চারচন্দ্র মানে মল-মূত্র-রজ-বীর্য একত্র করে সেবা। এর যদি কোন দেহযোগকেন্দ্রিক তাৎপর্য থেকেও থাকে তবু এসবের মধ্যে বেশ কিছুটা বিকৃতির ঝুঁকি থাকেই। পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এইসব বিকৃত-বুদ্ধি দেহযোগীদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য লিখে গেছেন এই ভাষায় :

Sexual indulgence is the most approved form of

religious exercise, and it is said that they have been known to drink a solution made from human excretions.

The moral condition of these and some other sects is deplorable indeed, and the more so as there is no sign of any effort in any quarter to rescue them. Aristrocratic Brahminism can only punish them by keeping them excluded from the pale of humanity.

এই ভাবেই বৈষ্ণব আখড়া আর বৈষ্ণবরা হয়ে ওঠে আক্রমণের লক্ষ্য। একজন ব্যঙ্গ ক'রে লেখেন :

বাহিরে জানাও সব ধার্মিকের ভাব।
রসকলি নাসিকায় দেহময় ছাপ॥
অন্তরের ভিতরে টক ঠকের প্রধান।
বাহিরে ধার্মিক ভাব বকের সমান॥

এসব বর্ণনা থেকে যেমন বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ ব্যক্ত হচ্ছে তেমনই হাড়ি-রামীদেরও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাদের গানে। তাঁদের শুদ্ধাচারী পরকীয়া-বর্জিত নিঃসঙ্গ আদর্শের সঙ্গে তখনকার গ্রামসমাজের প্রকৃতিভজাদের যে খুবই সংঘর্ষ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার ফলে বৈষ্ণব বা কৃষ্ণ সম্পর্কেই তাঁদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। তার একটা ইঙ্গিত আমি পাই সাহেবধনী গীতিকার কুবির গোঁসাইয়ের এক পদাংশে। কুবির লেখেন :

বলরামের চেলার মত
কৃষ্ণ কথা লাগে তেতো।

এখানে গাঁথা রয়েছে বলরামীদের সম্পর্কে সাহেবধনীদের উষ্মা। এবারে তার পাশাপাশি দেখানো যায় হাড়িরামীরা কী চোখে দেখতেন বা দেখেন দেহ-বাদীদের। চারচাঁদের সাধনাকারী উপ-সম্প্রদায় ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের নিয়ে তাঁদের মুখে মুখে বানানো ছড়া হ'ল :

যে খেয়েছে রক্ত
সে হয়েছে শক্ত।
যে খেয়েছে রস
সে করেছে বশ।

যে খেয়েছে রতি
তার হয়েছে গতি।
যে খেয়েছে মাটি
সে হয়েছে খাঁটি।

এখানে রক্ত মানে স্ত্রী-রজ, রস মানে মূত্র, রতি মানে শুক্র আর মাটি মানে মল। ছড়ার ফাঁকে ফাঁকে আছে ব্যঙ্গের ঝাঁজ। হাড়িরাম সম্প্রদায় বনাম সহজিয়া বৈষ্ণবদের এই সংগ্রাম নানা ছড়ায় গাঁথা আছে।

মেহেরপুরের বৃন্দাবন হালদারের কাছ থেকে যে বৈষ্ণববিরোধী ছড়া সংগৃহীত হয় তার মধ্যে লৌকিক বৈষ্ণবদের (যাদের হীনার্থে বলা হয় 'বোষ্টম') ছ'রকম শ্রেণীভেদের কৌতূহলকর তথ্য আছে। বলা হচ্ছে:

চেটাস্তি পেটাস্তি মালাটেপা উদাসিনী
মাগহারা যমে পোড়া
এরাই ছ'জন বোষ্টমের গোড়া।

এখানে চেটাস্তি মানে নারীলোলুপ, পেটাস্তি মানে ভোজনসর্বস্ব। মালাটেপা বলতে তাদের বোঝায় যারা কেবল মালা জপে। উদাসিনী মানে গাঁজাখোর উদাসস্বভাবী। মাগহারা মানে বিপত্নীক বা যার পত্নী চলে গেছে। যমে পোড়া কথাটির অর্থ আরো মর্মান্তিক অর্থাৎ যমেও ছোঁয় না যাকে। এই মর্মান্তিক রচনায় ঝ'রে পড়ছে ভ্রষ্ট বৈষ্ণবদের বিষয়ে হাড়িরামীদের প্রচণ্ড ঘৃণা।

সম্ভবত এই বৈষ্ণব বিরাগের জন্য হাড়িরামের শিষ্যবর্গ গলায় মালা পরেন না এবং গ্রহণ করেন না বহির্বাস। গুরুতন্ত্র ঐ ধর্মমতে মাথা চাড়া দিতে পারেনি, মনে হয়, গ্রাম্য বৈষ্ণব গুরুদের ভণ্ড ও উদ্দেশ্যমূলক জীবন যাপনের প্রতিক্রিয়ায়। ধরমপুরের গণেশ মণ্ডল একটা নতুন কথা বলেন। তাঁর মতে, বৈষ্ণবরা সাধনা করে রাধাকৃষ্ণের। রাধা আধখানা। তাহলে পূর্ণচন্দ্র কে? পূর্ণচন্দ্র হাড়িরাম। তিনি অখণ্ড। তাঁকে পেলেই সব পাওয়া হয়।

এসব কথা থেকে একটা বিষয় তো ক্রমেই বোঝা যাচ্ছে যে, হাড়িরামের তত্ত্ব দ্বৈতবাদী নয়, অনেকটাই অদ্বৈতবাদের ধার-ঘেঁষা। সোহহং মন্ত্রের মত হাড়িরাম ভক্ত নিজ অন্তরে বুঝে নিতে চান হাড়িরামকে। সম্পর্কটা সরাসরি। সেই প্রাপ্তি যার ঘটেছে সে কেন নিজেকে দীনহীন ভাববে? হাড়িরামের শিষ্যরা তাই বৈষ্ণবদের সাধনায় 'তৃণাদপি সুনীচেন' শুনে হাসেন। বলেন, অত

নীচু হব কেন? আমার মধ্যে রয়েছেন হাড়িরাম। শুধু কি আমার মধ্যে? সব কিছুর মধ্যেই হাড়িরাম। তাই তাঁরা বলেন:

হাড় হাড্ডি মণি মগজ
গোস্ত পোস্ত গোড় তালি
এই আঠারো মোকাম জুড়ে আছেন
আমার বলরামচন্দ্র হাড়ি।

হাড়িরামকে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈষ্ণবদের উপাস্য গৌরাঙ্গের উপরে স্থান দিতে চান। তাই এমন গান তাঁদের লিখতে হয়:

নন্দের সুত বলো যারে
সে এসেছে নদে পুরে
হরিনাম দেয় ঘরে ঘরে
শচীর নন্দন।
রাধাঋণ শুধবে বলে
রাই অঙ্গে অঙ্গ মিশালে
হরি হয়ে হরি বলে
কোন্ হরিতে হরল মন।

এই পদে গীতিকার রামদাসের সবিনয় জিজ্ঞাসা বৈষ্ণবদের প্রতি: শ্রীচৈতন্য যদি স্বয়ং হরি তবে তিনি আবার হরি বলে কাঁদেন কেন?

এর একটা সংগত উত্তর হাড়িরামীদের আরেক পদকার জলধর দেন এইভাবে:

দেখ কলিতে গৌরহরি
তার দুই নয়নে বয় যে বারি
হাড়িরামের চরণ নেহার করি
কেঁদে গেল নবদ্বীপে।

তাহলে যুক্তিটা দাঁড়ালো এইরকম যে, হাড়িরামের চরণ ধ্যান ক'রে তাঁকে পাবার ব্যাকুলতায় জন্যই গৌরহরির দুই নয়নে বয়ে যায় ধারা। এবারে উল্টো প্রশ্ন উঠবে, গৌরহরি তো হাড়িরামের অনেক আগে জন্মেছিলেন ধরাধামে। তবে কি এ পদে কালাতিক্রমণ দোষ ঘটে গেল না? এর উত্তরে নিলুর লেখা হাড়িতত্ত্বের গানটা এসে যাবে। তাতে বলা হচ্ছে:

দিব্যযুগে যিনি হাড়ি
সত্যযুগে বলিহারি
ত্রেতাযুগে দর্পহারী
দ্বাপর যুগে ভৃগুরাম।
কলিযুগে সেই হাড়িরাম
প্রকাশ করলেন তাঁর নিজ নাম।

নিলুর এই পদ গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে এতে একটি বিচিত্র লৌকিক তত্ত্ব রয়েছে এবং তত্ত্বটি যে স্বয়ং হাড়িরামেরই প্রণীত তাতে সন্দেহ নেই, কেননা নিলু তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য। অক্ষয়কুমারের সংগৃহীত বলরামের বাচনিক চিন্তায় বলা আছে:

> আদিকালে কিছুই ছিল না। আমি আমার শরীরের 'ক্ষয়' করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। সেইজন্য এর নাম ক্ষিতি।

পূর্ণ হালদার আমাকে বুঝিয়েছিলেন হাড়িরামের যুগতত্ত্ব। তাঁর বক্তব্য: আদিযুগে কিছুই ছিল না। অনাদি যুগে সৃষ্টি হয় গাছ পালা। দিব্যযুগে কোন নারী ছিল না। তখন হাড়িরাম তাঁর হাই থেকে করলেন হৈমবতীর সৃষ্টি। হৈমবতীই আদ্যাশক্তি। তাঁর থেকে এলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। তাই হাড়িরামের নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁরা বুঝবেন কি করে? সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারযুগ তো অনেক পরে—যে-চার যুগে বিষ্ণুর চার অবতার। হাড়িরাম তারও একযুগ আগেকার দিব্যযুগের মানুষ। তাঁর সৃষ্টি হৈমবতী, হৈমবতীর সৃষ্টি বিষ্ণু কাজেই বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার রামচন্দ্র আসলে হাড়িরামেরই অবতার।

এই পর্যায়ে বলে রাখা দরকার, হিন্দু সংস্কৃতির উচ্চবর্গ তার পুরাণে-উপ-পুরাণে চারযুগকে মেনে নিয়েছে। একটি বৈষ্ণব পদে যদিও কৃষ্ণকে 'আদি অনাদিক নাথ কহায়সি' বলা হয়েছে কিন্তু দিব্যযুগের ধারণা আগে শুনিনি আমরা। হাড়িরাম কি তবে মৌলিকভাবে উদ্ভাবন করলেন এই দিব্যযুগের কল্পনা? অনুচিন্তায় দেখা যাচ্ছে, লালন ফকির তাঁর এক পদে দিব্যযুগের কথা বলেছেন চৈতন্যের প্রসঙ্গে:

> সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
> গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়।

লালন এখানে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারযুগের মাঝখানে এক দিব্যযুগের আভাসন দ্রষ্টা ও প্রদর্শনকারী চৈতন্যদেবের কথা তুলেছেন। সেই চৈতন্য

সাজনের মতে কেবল যে দিব্যযুগের স্রষ্টা ও প্রদর্শক তাই নয়, তাঁর আরেক কাজ :

গোরা এনেছে এক নবীন আইন

দুনিয়াতে।

বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে ডুবে

সেই আইনের বিচার মতে॥

এখানে বেদ পুরাণকে দূষ্য করছেন গৌরাঙ্গ যে-নতুন আইনে তার মূল কথা হ'ল জাতি-বর্ণবিহীন মনুষ্যত্ব। দিব্যযুগ, যা চারযুগের ওপরে, তা সুস্থ সুন্দর জাতিবর্ণহীন। চৈতন্য সেই দিব্যযুগেরই একটা আদর্শস্বপ্ন আঁকতে চেয়েছিলেন আমাদের সামনে। হাড়িরাম সম্প্রদায়, এমনতর স্রষ্টা ও প্রদর্শক যে-চৈতন্যদেব, তারও ওপরে বসাতে চান হাড়িরামকে। কেননা সব কিছুর মূলে তো সেই দিব্যযুগ আর দিব্যযুগের প্রধান পুরুষ হাড়িরাম। সেই দিব্যপুরুষ হাড়িরামের মানবদেহধারী রূপ হলেন মেহেরপুরের বলরামচন্দ্র হাজরা। তাঁকে আমরা ভুল করে নীচ সম্প্রদায়ভুক্ত হাড়ি জাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি কিন্তু তিনি আসলে জাতিপংক্তি বর্ণের অনেক উর্ধ্বে—যুক্তিটা এইরকম। এই যুক্তিটা আবার উলটোদিক থেকে সাজিয়ে এমনও বলা যায়, জাতি বর্ণ যে নিতান্তই মূল্যহীন, মনুষ্যত্বের আসল মূল্য যে কর্মে ও চিন্তায় একথা বিশেষ করে প্রমাণ ক'রে বোঝাবার জন্যই হাড়িরাম জন্ম নিলেন নিম্নবর্গে। আনতে চাইলেন তাদের মধ্যে চেতনা, তাদের জন্মজাত হীনমন্যতা ঘোচাবার জন্য রেখে গেলেন এমন এক উচ্চাদর্শসম্পন্ন সদাচারী জীবন আর অহংকৃত তত্ত্ব যে সমুন্নত ভবিষ্যৎ কালেও পাবে তারা আশ্বাস ও ভরসা, বিচার ও প্রতিবাদের সাহস। করতে পারবে প্রবলতর শক্তির বিশ্লেষণ ও প্রতিরোধ। হিন্দু সংস্কৃতিজাত ব্রাহ্মণ্য পুরাণকাহিনীর একটা সমান্তরাল কাহিনী তৈরী করার প্রবণতা সাধারণত নিম্নবর্গের লোককাহিনীতে থাকে। যখন অতটা সৃজনশীলতা সম্ভব হয় না তখন প্রচলিত পুরাণ কাহিনীতে নিজেদের ব্যাখ্যা ও উপাখ্যান জুড়ে দিয়ে তাকে বদলে দেবার চেষ্টা চলে। হাড়িরাম ঠিক তাই করেছেন। হিন্দু পুরাণের চারযুগের কাহিনীতে তিনি জুড়ে দিয়েছেন অনাদি আদি ও দিব্যযুগের অদ্ভুত ধারণা, হৈমবতী ও তার থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আশ্চর্য জন্ম আখ্যান। যাঁরা এটা মানবেন না তাঁদের হাড়িরামীরা সতর্ক ও সাবধান করেন এই বলে :

পড়িস্‌নে চারযুগের ফেরে।

চারযুগ তাহলে তাঁদের বিবেচনায় এক ভ্রান্তির চক্র। তার থেকে মুক্তি পেতে গেলে দিব্যযুগ ও হাড়িরামের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখাই সমীচীন কাজ। কেননা 'হাড়িরাম হক চৈতন্ত সর্ব উপরে রয়'। কিন্তু সেকথা কি সবাই বোঝে? বোঝাও কি সহজ? সহজ নয় বলেই :

অনন্ত সে না পাই অন্ত
ব্রহ্মা বিষ্ণু পরাজিত
দেবাদিদেব ইন্দ্র হত
কিঞ্চিৎ জানে মহেশ্বর।

হাড়িরাম বলেছিলেন,

আমি কৃতদার গড়নদার হাড়ি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে সে যেমন ঘরামী সেইরূপ আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া আমার নাম হাড়ি।

এই সত্য কি সবাই জানতে পারে যদি না জানান হাড়িরাম? সেই জন্যই পদকার জলধর লেখেন,

তুমি জানাও যারে ও হাড়িরাম
সেই পারে তোমায় চিনিতে।
তুমি হাড়িরাম পয়দাকারী
একশো আট হাড় দিলে জুড়ি
মাংস হালে হাম তার উপরি
আসা-যাওয়া করাও ভবেতে।

এই তত্ত্ব কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু বা ইন্দ্র বোঝেন না। বোঝেন একমাত্র মহেশ্বর। তাই :

মহাদেব তার তত্ত্ব জেনে
একশো আট হাড় নেয়গো গুণে
হাড়িরাম ব'লে নিশি দিনে
হাড়ের মালা পরে গলেতে।

এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন ওঠে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তো হাড়িরামের সৃজনজাত হৈমবতীর সন্তান, তবু তারমধ্যে একমাত্র শিব কেন জানতে পারলেন হাড়ি-রামের তত্ত্ব? কিংবা ঘুরিয়ে বলা যায়, হাড়িরাম ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বঞ্চিত ক'রে

একমাত্র শিবকে কেন তাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝার বেধা দিলেন? তার উত্তরও সুন্দর ও সুনির্দিষ্ট, কিন্তু আপাতত সে-উত্তর জমা থাক। হাড়িরাম তত্ত্বে এখন আমরা সবে প্রবেশক। সে তত্ত্ব আসবে পরে, ক্রমানুসারে।

আপাতত শুধু এইটুকু বুঝে রাখা যাক যে, বিষ্ণু হাড়িরাম তত্ত্বে অপারঙ্গম, অনধিকারী। একথা ঘোষণা করে হাড়িরাম সম্প্রদায় পরম অহংকারে নিজেদের স্থাপন করে বৈষ্ণবদের শ্রেণী ভিত্তির উপরের থাকে। বৈষ্ণবরা নারী-সাধন করে ব'লে চারচন্দ্র সেবা করে ব'লে শুধু নয় তারা বিষ্ণুকে উপাস্য মনে করে ব'লেও। বৈষ্ণবরা এই বিষয়টা বোঝেন না বটে, তবে এই খণ্ডতার অপরিগ্রহণতার বেদনা বুঝেছিলেন স্বয়ং গৌরাঙ্গ। হাড়িরামকে বুঝতেই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ—এই মত হাড়িরামীদের।

হাড়িরামের তুলনায় গৌরাঙ্গকে এই যে নীচু করা তাতে একধরণের আত্মতুষ্টি থাকে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের। এর একটা কারণ, উনিশ শতকের গোড়ার গ্রাম-সমাজে ব্রাহ্মণের চেয়ে লৌকিক বৈষ্ণবরা ছিল তাদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের অবাধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাধারণ দুর্বল ভক্তিমোহিত মানুষকে তীব্রভাবে টেনে নিচ্ছিল তাদের ধর্মে। সে প্রবল তরঙ্গ রোধ করার ক্ষমতা সংখ্যালঘু ও অচ্ছুৎ হাড়িরামের ধর্মমতের ছিল না। তাই এর বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁরা লিখেছিলেন বেশ কিছু ব্যঙ্গাত্মক ছড়া। সহজিয়া বৈষ্ণবদের অপ্রতিহত জয়যাত্রাকে ঠেকাতে তাঁরা গৌরাঙ্গ-পূজকদের প্রতিরোধে তৈরি করেন নতুন নতুন শ্লোক, যেমন:

> নিত্যচৈতন্য পুরুষ হাড়িরাম উদয় মেহেরপুর।
> যে জানতে পারে তারই নিকট নইলে বহুদূর॥
> বৈষ্ণবের জন্যে কাঁদে নিতাই আর গৌর।
> আবার এই বৈষ্ণব গোঁসাই ঠাকুরের ঠাকুর॥

এখানে হাড়িরামের প্রাধান্য প্রমাণের জন্য হাড়িরামকে তাঁদের রীতি বহির্ভূত বৈষ্ণব গোঁসাই সাজাতে এমনকি তাঁরা দ্বিধা করেন নি। হয়ত এখানেই পাওয়া যাবে Parallel Tradition গ'ড়ে তোলার একটা ঝোঁক। প্রকৃতপক্ষে সহজিয়া বৈষ্ণবদের দুর্বার জনপ্রিয়তা ও নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ নিম্নবর্গীয় সংখ্যা-লঘুতার কোন আনুপাতিক সমাধান তাঁদের হাতে ছিল না। নিম্নবর্গের মানুষরাও আসলে হাড়িরাম মতের শুষ্কশীল জীবনাদর্শের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ বোধ করতো বৈষ্ণবতার মধুর রসে, রাধাকৃষ্ণের উচ্চ প্রেমের কাহিনীতে ও পালা-

কীর্তনে। তারা এমনকি মেনে নিতেন উচ্চবর্ণের তুলনায় তাদের জাতহয়ের নীচতা। উঁকি মারতে চাইতেন তাঁদের দোল দুর্গোৎসবে। হাড়িরামের শিষ্যরা এর বিরুদ্ধে তাঁর জীবিত কালে আর বারুণীর দিন তাঁকে ঘিরে আবীর খেলতেন। তাঁর মৃত্যুর পরও হাড়িরামের ঘর ও শয্যা, তাঁর পাদুকা ও হুঁকাশোভিত পরিমণ্ডলটিকে রাঙাতেন আবীর কুমকুমে অথচ উচ্চবর্ণের বা বৈষ্ণবদের দোলযাত্রার দিনে নয়, বারুণীর দিনে। এ ধরণের স্ববিরোধ তাঁদের অবস্থানের অস্বস্তিকেই দ্যোতনা করে। এর থেকে নিস্ক্রমণের জন্য কোন বাস্তব সমাধান না পেয়ে তাঁরা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নকে রূপায়ণ করেছিলেন একাধিক পথে। প্রথমে তৈরি হলো এক অহংকৃত উচ্চারণ : সখার সখী নেই সখীর সখা নেই। এ-উচ্চারণে তো স্পষ্টতই মধুর রসের সাধনা ও যুগলতত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের ধর্ম বড় সহজ নয়, সুকঠিন তার করণকারণ। এবারে সম্প্রসারণে যদি জানতে চাওয়া হয় কেন নেই সখা ও সখীর অন্যোন্যতা তবে তাঁদের সদর্প ও সগর্ব জবাব হবে, হাড়িরাম যে দিব্যযুগের মানুষ, তখন তো নারীরই সৃষ্টি হয়নি। কামনার সংস্কার নেই তাঁর সেই জন্যই।

এরপরে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের চেষ্টা হলো Parallel Tradition তৈরি ক'রে মেহেরপুরকে নবদ্বীপের সমান্তরালে বা ঊর্ধ্বে দাঁড় করানো এবং কলিকালে চৈতন্যাবতারের পাশে আরেকজন পূর্ণমানুষ রূপে (অবতাররূপে নয়, কেননা তাঁরা অবতারবাদ মানেন না) হাড়িরামকে প্রতিষ্ঠা করা। এরজন্য বাবু নামে এক পদকার যা লেখেন তা গুরুত্বপূর্ণ। পদটি :

নবদ্বীপে এসে ছিন্নবেশে কেঁদে গেল শচীর গোরা।
আলেকের চরণ লাগি অনুরাগী বৈরাগ্যবেশ দণ্ডীধরা ॥
চাঁদ মুখে নাইকো হাসি দিবানিশি প্রতিবাসী দেখ্‌সে তোরা।
শতধার বইছে চক্ষে পড়ছে বক্ষে কোন্ মানুষকে হয়ে হারা ॥
বাবু কয় কলিকালে মেহেরপুরে পূর্ণমানুষ দেখসে তোরা ॥

এই গানে চৈতন্যের তুলনায় হাড়িরামের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে এমন কুশলতা ও সূক্ষ্ম টানে যে হঠাৎ বোঝা কঠিন। প্রথমেই বলা হচ্ছে অপূর্ণ মানুষ চৈতন্যের এক ক্রন্দনরুদন্ত বিগ্রহের কথা। কীসের সেই অপূর্ণতা, কেন কান্না, কোন্ মানুষকে হারিয়ে ? না, কোন মনের মানুষকে হারিয়ে কোথায় পাবো তারে ব'লে এই কান্না নয়। এ কান্না হাড়িরামকে না-বোঝার না-পাওয়ার জন্য। তাই চৈতন্য অপূর্ণাবতার অথচ তার পাশে এই কলিকালেই মেহেরপুরে রয়েছেন পূর্ণ মানুষ। দিব্যপুরুষের মানুষীরূপ।

হাড়িরামের মহিমাকে এমনই ক'রে প্রচলিত আখ্যানের মধ্যে নতুন তাৎপর্যে জুড়ে দেন তাঁর শিষ্য পদকারেরা। তৈরি করে দেন এক নতুন তর্কের ভিত্তি। লোকধর্মে তর্কের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ-বর্জনের রীতি খুব চলে। সেখানে মত প্রতিষ্ঠার মরীয়া প্রয়াস অভিনব কিছু নয়। আশ্চর্য নয় অতিকল্পনার ঘনঘটা যেমন একটি (পদকার : নেত্ত) পদে বলা হয় :

যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে
ভুলে ছিল রাধা সনে
রামদীন তারে আনে চেতনে
বক্ষে দিয়ে পদচিহ্ন।

এইভাবেই কি তাঁরা লিখতে চাইলেন এক অলীক পুরাণ ?

এমন নয় যে অলীক পুরাণ শুধু হাড়িরাম সম্প্রদায়ীরাই বানান, সকল লোক-ধর্মের মধ্যে থাকে এই প্রবণতা। এমনও নয় যে বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে কেবল একটি মাত্র উপধর্মই তর্কে উদ্যত। বস্তুত বিতর্কপ্রবণতা বাংলার লোকধর্মের এক সজীব অংশ। যেন ভুলে না যাই যে, গ্রামবাংলায় নিয়তই লেগে থাকে মেলা মহোৎ-সব, সাধু সমাবেশ। সেখানে অতি অবশ্যই বসে এক গানের আসর। আসরে আসেন নানা লোকসম্প্রদায়ের গায়ক। তাঁদের তত্ত্বগত জ্ঞান গভীর। গান নির্বাচন এমনভাবে হয় যাতে গায়কে-গায়কে কোন তত্ত্বের একটা পুরো কাঠামো গ'ড়ে তোলেন তর্কমূলক গানে গানে। যেমন হয়ত কোন আসরে একদিন উঠলো গৌরাঙ্গ তত্ত্ব, অন্যদিন উঠলো পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব। যে-গায়ক যে-সম্প্রদায়ের তিনি তাঁর নিজ মতের তত্ত্ব দিয়ে অন্যমতের তত্ত্বকে খারিজ করতে চান। শেষ পর্যন্ত একজন এমন এক গান করেন যে সে-গানের তত্ত্ব আর খারিজ করা যায় না। তাকে বলে অকাট্য গান। সে গানের পর সাধারণত গানের আসর শেষ হয়ে যায় অথবা শুরু হয় এক নতুন তত্ত্বের গান গাওয়া।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একবার এক আসরে গায়ক গৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের শক্তি ও অভ্রান্ততা বিষয়ে একখানা গান গাইলেন। চললো এ প্রসঙ্গে অনেক গান। শেষে ব্যাপারটা পোক্ত করতে মূল গায়ক গাইলেন এমন এক গান যার মর্মার্থ : যে-কোন ধর্মে থেকেই শুধু প্রেমধর্মের জোরেই পাবে মুক্তি। কথাটা যখন আসরে প্রায় অকাট্য বলে সাব্যস্ত হতে চলেছে তখন কুষ্টিয়া-[illegible] এক [illegible] হঠাৎ গেয়ে উঠলেন :

[illegible] প্রচারে গোরা আরে প্রেমের ধর্ম কর ?

তবে কেন হরিদাসে হরিনাম নিতে হয়?

যুক্তির দাপটে আসর থমথমে হয়ে গেল। গায়কদের মুখ হ'ল গম্ভীর। উৎসাহী শ্রোতা যাঁরা এতক্ষণ জোরে জোরে মাথা নেড়ে প্রেমধর্মের জোরকে সমর্থন করছিলেন তাঁদের শিরশ্চালন বন্ধ হলো। সত্যিই তো, প্রেমের ধর্মেই যদি মুক্তি তবে হরিদাস কেন মুসলমান জাতে থেকেই মুক্তি পায় না? তাঁকে কেন আলাদা ক'রে হ'তে হয় বৈষ্ণব, নাম নিতে হয় হরিদাস, করতে হয় হরিনাম? এরপরে গায়ক সেই আসরকে ধ্বস্ত করে দেন গানের এই অন্তরা-য়:

সর্ব ধর্মে আছে মুক্তি
বৈষ্ণবেরা বলে যুক্তি
তবে কেন এ রীতি হরিদাসের বেলায়?

আসর এরপর আর কি চলে?

এ ভাবেই লোকগায়ক তাঁর গানের পুঁজি বাড়ান, শান দেন তর্ক-বুদ্ধিকে। গায়ক-শ্রোতা ক্রমেই এগিয়ে চলেন নতুন চেতনালোকে। বহমান সেই ধারা। কয়েক শতাব্দীতেও বহু গানের প্রাণরস তাই ফুরায় না। সর্বাধুনিক আসরেও এমনকি দুশো বছর আগেকার লেখা লালন ফকিরের গান হ'য়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক ও জায়মান। এইখানেই মূলত শিষ্ট সংগীতের সঙ্গে লোকসংগীতের তফাৎ। শিষ্ট সংগীতের রূপরীতি পালটে যায়, পালটায় বন্দেশ ও গায়নরীতি, এসে যায় অলংকরণ ও ওস্তাদী, কমে যায় ভাবগত গুরুত্ব। অথচ লোকসংগীতের নিরাভরণ গায়নরীতি থাকে একই রকম। সেখানে সুরের ধরন আর গানের কাঠামোর খুব বেশি স্বরবিহারের অবকাশ থাকে না। তার থীমেটিক প্রাসঙ্গিকতা যখনই যে আসরে দেখা দেয় তখনই লোকগায়কের চেতনায় ও কণ্ঠে সে নতুন ক'রে জেগে ওঠে। বারবার যাচাই হয় সে গানের বস্তুগত মহিমা আর আভ্যন্তরীণ সত্য।

লোকসংগীতের যে-অংশ আবার ধর্মসম্পৃক্ত তার একটা মূলভাগ রহস্য ও সাংকেতিকতায় আবছা। সে সব গান খুব সহজে বোধগম্য হয় না। গুরু বা তাত্ত্বিক ব্যক্তি তার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। এ-জাতীয় গানের ব্যাখ্যায় কখনও কখনও ছোট দু'চার পংক্তির সুভাষিত ব্যবহার করা হয়। যেমন, আসরে গানের বিষয় একদিন হয়ত রয়েছে রাধাবিরহ। গানের পর গান চলছে। একেবারে ছোট সংবৃত আসর। মেলা মহোৎসব নয়। আসর বসেছে শিষ্যের ঘরের দাওয়ায়। গুরু এসেছেন। শ্রোতা দু' দশজন। সবাই তত্ত্বজ্ঞানী। রাধার

বিরহ গানের মাঝখানে হঠাৎ গুরু বলে বসলেন : 'কিন্তু রাধার কি বিরহ হয় কখনও ?' সঙ্গে সঙ্গে একজন শ্রোতা বললেন :

বন্ধ কৃষ্ণের নাই গোচারণ লীলা।
বন্ধ রাধার নাই বিরহজ্বালা॥

এবারে গান থেমে যাবে। সবাই অপেক্ষা করবেন গুরুর ব্যাখ্যানের জন্য।' এসে যাবে দেহতত্ত্ব। এবারে বোধগম্য হবে যে, ঐ বিশেষ উপধর্মীয় বিশ্বাসে পুরুষের মধ্যে আছেন কৃষ্ণ, গুরুরূপে। গুরুই যদি কৃষ্ণ তবে তাঁর আবার গোষ্ঠ কীসের ? গোচারণলীলার কাহিনী অলীক কল্পনা। ওসব অনুমানবাদীদের কাজ। তেমনই রাধার আবার বিরহ জ্বালা কী ক'রে হবে ? পুরুষ-প্রকৃতি রসরতি তো সর্বদাই চলছে এই ধরাধামে। পুরুষ কৃষ্ণ, রাধা প্রকৃতি। তাঁদের নিত্যলীলা। এই দেহের মধ্যে সব বিদ্যমান। এখানেই ব্রজ বৃন্দাবন, এখানেই রসরতি। নিত্য বৃন্দাবন নিত্য রসলীলা। কাজেই রাধার নেই বিরহজ্বালা। কৃষ্ণ রাধার বিচ্ছেদ কই যে বিরহ হবে ?

এইবার বুঝে নেওয়া দরকার যে, বেশির ভাগ লোকধর্ম একটা জায়গায় কিন্তু মিলে যায়। উচ্চবর্গের ধর্মকে তারা বলে অনুমানের পথ। কেননা তাঁদের ধর্মের ভিত্তিতে আছে দেববাদ ও পুরাণ কাহিনী। পুরাণ তো আসলে দেবতাদেরই মর্ত্যকাহিনী। সেদিক থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রাধাকৃষ্ণ কালী সবই আনুমানিক বা কল্পিত এবং মর্ত্যে তাঁদের অবতার লীলা বহুদিন আগে সংস্কৃতে লেখা বিভিন্ন হিন্দু পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে ও ভাগবতে আছে। গ্রাম বাংলার সাধারণ মূর্খ মানুষদের ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবরা কয়েক শতক ধরে এসব ঐশী চরিত্র ও তাঁদের মহিমার কাহিনী সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ক'রে বাংলা পয়ারে গেঁথে পৌঁছে দিয়েছেন নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে। চৈতন্য আবির্ভাবের আগে থেকেই এই ভাবানুবাদের সূচনা, চৈতন্য সমকাল ও পরবর্তীকালে ঘটে এর ব্যাপক ও বহুমুখী প্রসার। এ প্রয়াসের মূলে ছিল ভারতের এক বিশাল অংশ জুড়ে প্রসারিত ভক্তি আন্দোলন। সেই ভক্তি আন্দোলনের ভিত্তিতে ছিল দ্বৈতবাদের সমর্থন। নবম শতকে শঙ্করাচার্যের তিরোধানের পর থেকে অদ্বৈতবাদ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে, দ্বৈতবাদ সহজ প্রসারণের পথে এগিয়ে যায় বিনা বাধায়। পঞ্চদশ শতক নাগাদ ভক্তি আন্দোলন দ্বৈতবাদকে প্রায় সর্বভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে একার্থক করে তোলে। বাংলায় শ্রীচৈতন্য, আসামে শংকরদেব, এ ছাড়া তুলসীদাস তুকারাম নানক কবীর সুরদাস মীরাবাঈ প্রভৃতি বহু সাধকের প্রয়াসে সারাদেশ উত্তাল

হয়ে ওঠে ভক্ত-ভগবানের মূলতত্ত্ব। মধ্যযুগে বাংলায় প্রথম অনুবাদ হয় ভাগবত। তারপরে রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য নানা পুরাণ। এসব অনুবাদের মূল কথা ছিল 'লোক বুঝাইতে লিখি' বা 'লোক নিস্তারিতে কহি'। তার মানে সাধারণ অজ্ঞ মূর্খ মানুষ, যাঁরা ছিলেন দেবভাষায় বঞ্চিত, অতএব উচ্চবর্ণের বিচারে অপদেবতা ও উপদেবতাপূজক এবং ভ্রষ্ট, তাঁদের প্রকৃত ধর্ম বোঝাতে বা তাঁদের পাপের পথ থেকে নিস্তার করতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সেকালে এসব শাস্ত্র ও পুরাণ অনুবাদ করতে ব্রতী হন। সমাজের নিম্নবর্গের একটা অংশকে তাঁরা উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসের দ্বারা গ্রস্ত করতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু একটা অংশকে পারেননি। এই অংশে বৌদ্ধ মহাযানী প্রভাব ও তন্ত্র যোগ, ইসলাম, বাউল ও সহজিয়া সংক্রাম আগে থেকেই এতটা ছিলো যে তাঁরা জাতিভেদবহুল জন্মান্তরবাদবিশ্বাসী দেবতাপূজক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে খুব একটা মূল্য দেননি। এঁরা বেদের অভ্রান্ততা, ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব, যাগযজ্ঞসাধন ও মূর্তিপূজায় অনীহ ছিলেন। কাজেই রাধাকৃষ্ণ কাহিনী শিবদুর্গার উপাখ্যান, তাঁদের অবতার তত্ত্ব এসব কিছুই গ্রহণ না ক'রে গুরু-নির্দেশিত গুহ্য সাধনার গোপ্য পথে বিচরণ করতেন। উচ্চবর্ণের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ সংঘাত ঘটেনি কেমনা এঁরা থাকতেন প্রচ্ছন্ন। 'লোকমধ্যে লোকাচার' বজায় রেখে কৌশলে আত্মগোপন ক'রে থাকতেন।

মধ্যযুগের বাংলার উচ্চতর সম্প্রদায় সাধারণ মানুষ ও আদিবাসী-উপজাতিদের মধ্যে আর এক ধরনের কাজ করেছিলেন। ঐ সব অন্ত্যেবাসী মানুষ গ্রামের প্রত্যন্তে নানা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে তৈরি করেছিলেম বেশ কিছু ব্রত-কথা। প্রথমে তার প্রসার ছিল মেয়ে মহলে। যেসব ক্রোধান্ধ প্রতিহিংসাপ্রবণ লৌকিক দেবদেবীর ব্রতকথা-চর্চা ক'রে ঐ অনুন্নত মানুষরা সাংসারিক স্বস্তি কামনা করতেন সেই সব উপাস্যের অনেক ক্ষেত্রেই কোন Anthropomorphic মূর্তি ছিল না। নুড়ি পাথর, সিজবৃক্ষ বা বন্যজন্তুকেও তাঁরা উপাস্যের প্রতীক বানিয়ে নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরা ঐ ব্রতকথার কাহিনীকে হিন্দু পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে রসায়ন ক'রে মঙ্গলকাব্যরূপে ধর্মসাহিত্যভুক্ত ক'রে ফেলেন। এক ধরনের কথক গ্রামে গ্রামে ঘুরে এক মঙ্গলবার থেকে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রতিরাতে গেয়ে বেড়াতেন মঙ্গলগান। ধর্ম সাহিত্যের এই মঙ্গলকাব্য পর্যায়টি ছিল একেবারে উচ্চবর্গ ও একেবারে নিম্নবর্গের মধ্যে সেতুর মত।

এই সব সমাজ ও ধর্মপরিবেশ মনে রাখলে বলতে হয় শ্রীচৈতন্য জন্মেছিলেন

বাংলার এক সংকটপূর্ণ ক্রান্তিকালে। একদিকে চলছে মুসলমান শাসন ও ধর্মান্তর করণ, অন্যদিকে চলছে গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজপতির অত্যাচারে নিম্নবর্গের অসহায় কান্না। আরেক দিকে চলছে তন্ত্রযোগ ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রভাবে বিকৃত যৌন ব্যভিচার, অন্য আরেকদিকে অলসভাবে একদল কেবলই 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে'। শ্রীচৈতন্য এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আনতে চাইলেন এক সহজ ধর্মীয় সমাধানের ফর্মুলা। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে ভেদ বর্জন ক'রে, শাস্ত্রাচারের জটিলতাকে শুধু নামজপের সাধারণীকরণে এনে, অহৈতুকী ভক্তিকে করতে চাইলেন প্রধান। বৈষ্ণবধর্ম তাঁর চোখে একটা পরিমার্জিত হিন্দুসম্প্রদায় ঠিক নয়, বরং অনেকটাই একটা সুবিনয়ী আচরণবাদ। কিন্তু তিনি জাতিবর্ণভেদ বাদ দিয়ে যে উদার মনুষ্যত্বের আহ্বান করেছিলেন তার দুটো ফল হলো সঙ্গে সঙ্গে। ব্রাহ্মণসম্প্রদায় তাঁর বিরোধী শক্তি হয়ে দাঁড়ালো এবং আশ্চর্য যে তাঁর আবির্ভাবের একশো বছরের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের ভেতরকার ব্রাহ্মণ্য অংশ বৈষ্ণবতাকে বৃন্দাবনের গোস্বামী আর বাংলার হিন্দু স্মার্ত অধিকারে এনে উচ্চবর্ণের মাহাত্ম্য প্রমাণ করে দিল। ফলে শ্রীচৈতন্য করুণাবতার হয়ে যেসব শূদ্র ও পতিত মানুষকে ত্রাণ করবার জন্যই প্রধানত তাঁর সাধনা করেছিলেন সত্তেরো শতকের গোড়ায় সেই মানুষগুলি স্থান পেলেন না মূল বৈষ্ণব স্রোতে। তাঁদের কারুর নাম হলো জাত-বৈষ্ণব, অন্যান্যদের নেয়ো বৈষ্ণব, খণ্ডিত বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, চাষার বৈষ্ণব, কালিন্দী বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব এইসব। কোথায় দাঁড়াবে এইসব মানহারা মানুষ? কার দ্বারে? মহাপ্রভু যে বলেছিলেন 'মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই' সে কথা কি ভ্রান্ত তবে?

আঠারো শতকের ইতিহাস ঘাঁটলে বাঙালী সমাজের বর্ণব্যবস্থার একটা ছবি পাওয়া যায় যা ঐ সময়ের রাজানুগ্রহ ও অর্থনৈতিক দোলাচলের মতই চঞ্চল। ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন: 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ / ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'। এই দুই ছত্রে ধরা আছে সেকালের রাজানুগ্রহের জোয়ারভাঁটার খবর। কে যে রাজার বদান্যতা পেয়ে ওপরে উঠবে আবার হঠাৎ রাজার বিরাগভাজন হয়ে নেমে যাবে অতলে আঠারো শতকের বাংলা সমাজে তার কোন নির্ণয় বা পূর্বাভাস ছিল না। রামপ্রসাদের গানে 'ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণকান্তি তাকে দিলি জমিদারি?'—এই অভিমানী জিজ্ঞাসা ঐ-সমাজের অর্থনীতির চকিত

উচ্চাবচতার নিদারুণ প্রবণতা বহন করছে। ঐ সময় জাতি বর্ণব্যবস্থার সংকট ও চরিত্র কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল তার কিছু বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হবে খুবই প্রাসঙ্গিক। 'জাত বৈষ্ণবের কথা' নামে পূর্বে উল্লিখিত নিবন্ধে শ্রীঅজিত দাস লেখেন :

> মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তাঁর রাজ্যসীমামধ্যে চারি সমাজের পতি। এই চারটি সমাজ হচ্ছে, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ (চাকদহ), কুশদ্বীপ। এসব কট্টর ব্রাহ্মণ সমাজ। কৃষ্ণচন্দ্র শুধু এই ব্রাহ্মণ সমাজেরই পতি ছিলেন না। হিন্দু সমাজেরও মাথা। এই রাজবংশের অধিকার ছিল হিন্দুর যে-কোনো বর্ণের প্রজাকে (ব্যক্তি পরিবার কি সমাজ) সমাজচ্যুত করার বা সমাজে তোলার। অর্থাৎ নিম্নবর্ণ থেকে উচ্চবর্ণ করার বা নীচে নামিয়ে দেবার।
>
> উজানিয়া গোপসম্প্রদায়ের জল অচল ছিল, এঁরা সচল করেন। এঁরা বাড়িতে পরিচারকের কাজের জন্য যে কোনো নিম্নবর্ণের বালককে কিনে এনে কায়স্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতেন।
>
> নিজ রাজ্যসীমা কেন, সমগ্র বঙ্গসমাজেই প্রভুর ভূমিকা।
>
> ঢাকার রাজবল্লভ বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে পারলেন না মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আপত্তিতেই।
>
> এ হেন দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজার রাজ্যে গৌরাঙ্গভজনা করবে কে? বর্ণাশ্রমবিরোধিতা করার সাহস কার?
>
> বল্লাল সেন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। নদীয়ার রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, প্রচারক ও গৌরাঙ্গ আন্দোলনের ধ্বংস কর্তার ভূমিকা পালন করেছে।*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আঠারো শতকে বর্ণাশ্রম প্রথা খুবই প্রবল ছিল। তার ফলে বৈষ্ণবধর্মেও এসে যায় বর্ণাশ্রম, প্রাধান্য পায় তার 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব' অংশ। তাঁরা বৃন্দাবনের গোপাল ভট্টের প্রণীত হরিভক্তিবিলাসের কঠোর বৈষ্ণবীয় নীতি-নির্দেশ জারি করলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে। এর ফলে সাধারণ ব্রাত্য ও শূদ্র বৈষ্ণবরা অসহায় হয়ে পড়লেন। যে-গৌরাঙ্গের নামে তাঁরা বৈষ্ণব হয়েছিলেন

কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তীকালেও রাজবিদ্বেষে সেই গৌরাঙ্গভজনা হয়ে পড়েছিল কঠিন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় লিখেছেন : 'ইহারা কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করিতেন'।

বুঝতে অসুবিধা নেই যে, চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায় বলতে বৈষ্ণবীয় মূলস্রোত থেকে বিতাড়িত বা বেরিয়ে-আসা লৌকিক বৈষ্ণবদের বোঝানো হচ্ছে এখানে। তোতারাম এঁদেরই বলেছিলেন অপসম্প্রদায়। বাংলার লোকধর্মের এঁরাই এক সবল ও সচল অংশ। আচার্য সুকুমার সেন এঁদেরই প্রতি সশ্রদ্ধ মন্তব্য করে জানিয়েছেন : 'প্রধানত ইঁহাদের মধ্য দিয়াই চৈতন্যের ধর্ম ক্রমবর্ধমান আচার-বিচার ও সেবাপূজা ইত্যাদি বিধিভুক্ত পদ্ধতির বহিরঙ্গতা এড়াইয়া দেশের অন্তর্ভূমিতে নামিয়া গিয়া সর্বত্র প্লাবিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে লাগিল।' এখানে আরেকটি দিকও বিচার্য। শ্রীচৈতন্যের উদার জাতি বর্ণহীন ভাবনা দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে-থাকা লুকিয়ে-থাকা মনের মানুষের গভীর নির্জন সাধকদের এমনভাবে নাড়া দিল যে তাঁরা 'বৈষ্ণব' এই বিরাট নামের ছত্রতলে নিজেদের সুকৌশলে মিলিয়ে দিলেন। ক্রমে শ্রীচৈতন্য হয়ে উঠলেন এক প্রগাঢ় মানবমূর্তি, পরিত্রাতার সর্বব্যাপী ইমেজ গড়ে উঠলো তাঁকে ঘিরে। শ্রীচৈতন্য ব্যক্তি না থেকে ক্রমশ হয়ে যান এক ভাবকল্প। ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য যদিও তাঁর জীবনের শেষ আঠারো বছর থেকে যান নীলাচলে তবু তাঁর মহান উদার চিন্তা জাগিয়ে দেয় দুই শতকের পরপারে লৌকিক মানুষদের, নতুন ধর্মে।

লৌকিক ধর্মের সর্বস্তরে কালক্রমে শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠেন এক সর্বস্বীকৃত শ্রদ্ধেয় নাম। শুধু বৈষ্ণব উপশাখা বা চৈতন্য সম্প্রদায়ে নয়, বাউল-ফকির-দরবেশ সকলেই তাঁকে আলাদা মর্যাদা দেন। তাঁদের একটা সৌভাগ্য যে ব্রাহ্মণপোষিত উচ্চ বৈষ্ণবতার জগৎ তাঁদের দলে নিতে অস্বীকার করেছিল। ভ্রষ্ট, পাষণ্ড ও কদাচারী বলে এসব লোকধর্মকে উচ্চবর্ণ বরাবর দলছুট রেখেছেন। ফলে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রশাসনের শুষ্কতা এ সব সম্প্রদায়কে কখনও গ্রাস করেনি এবং বৃন্দাবন প্রণীত ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা কৃষ্ণরাধা বা গৌরাঙ্গের তত্ত্ব বোঝেননি। সেইজন্য লোকধর্মে কৃষ্ণরাধা চৈতন্যকে নিয়ে যেসব গান গাওয়া যায় তা জীবনের তাপে উষ্ণ, যৌনতায় পরম আস্বাদ্য। এর কারণ লোকধর্মের মানুষজন উচ্চবর্গের মত অনুমানের সাধনা করেন না, তাঁরা বর্তমানের সাধক। তাঁদের মৌলিক চিন্তায় রাধাকৃষ্ণ-বৃন্দাবন-মথুরা এসব কোন অনুমানের জায়গা নয়। তাঁরা বস্তুবাদী, তাই বস্তুর মধ্যেই এঁদের অস্তিত্বকে লৌকিক সাধকরা বুঝে নেন। 'আরোপ' তত্ত্বের

বলে সাধকের দেহ-বৃন্দাবনে চলে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা। দেহকে তাঁরা বলেন ভাণ্ড এবং বলেন 'যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অনুমানের পথ তাঁরা এড়িয়ে যেতে চান। নিজদেহের মধ্যেই পেতে চান অলৌকিককে অধরাকে। তাঁরা বলেন আলেখের (অলক্ষ?) সাধনা, অজানা অধরা মানুষের সাধনা। শ্রীচৈতন্য তাঁদের কাছে শ্রদ্ধেয় এইজন্য যে বেদপুরাণকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন, মানুষকে মূল্য দিয়েছিলেন, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রেরও ওপরে। ভেতরে ভেতরে লোকধর্মের সাধকরা এমনও বিশ্বাস করেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁদের মতই গুহ্য পরকীয়া প্রকৃতি-সাধনা করতেন। 'জনশ্রুতিজাত ধারণা স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গুহ্য সাধনপ্রণালী ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক'।* তাঁরও মনের মধ্যে আর্তি ছিল মনের মানুষকে জানবার। অজানা মানুষ আলেখের জন্য তাঁরও প্রাণে ছিল কান্না। লালন ফকির লেখেন সেই জন্যই :

শুনে অজানা এক মানুষের কথা
গৌরচাঁদ মুড়ালেন মাথা।

হাড়িরামী পদকার বাবু লেখেন :

নবদ্বীপে এসে ছিন্ন বেশে কেঁদে গেল শচীর গোরা।
আলেখের চরণ লাগি অনুরাগী বৈরাগ্যবেশ দণ্ডীধরা॥

প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য বাংলার লোকধর্মে এনে দিয়েছিলেন গতি ও সাহস। গৌড়ীয় সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যের সজীব শিক্ষা ভুলে বৃন্দাবনের আচার ধর্মকে বড় ক'রে দেখলেন বলেই সতেরো শতকে তাঁদের মধ্যে এল শুষ্কতা ও উপদলীয় বিচ্ছিন্নতা। বিগ্রহ পূজা, অষ্টকালীয় লীলা, মহান্তগিরি, আখড়াপ্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ্য-সংক্রাম তাঁদের জড়িমা এনে দিল। অথচ লোকধর্ম এই করুণাবতার চৈতন্যকেই বড় ক'রে মানলো ব'লে শাস্ত্রকে এড়াতে পারলো। খুঁজে পেল জাতীবর্ণহীন মানুষ-ভজনার আবেগ। অনেকদিনের গোপনতা ত্যাগ ক'রে তারা চলে এল প্রকাশ্যে। গানে গানে ভরিয়ে দিলো সবদিক। হিন্দু মুসলমান মিলে গেল কর্তাভজা সাহেবধনী হাড়িরামীদের সাধনায়। দৃপ্ত শপথে লোকধর্মের পদকারই (কুবির গোঁসাই) বলতে পারলেন :

এই মানুষকে করবে বিশ্বাস
এই মানুষ জানিও সত্য-নির্যাস

---

* দ্রঃ ঢাকার বাংলা একাডেমি পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৭০) আহমদ শরীফের লেখা প্রবন্ধ 'বাউলতত্ত্ব'।

এই মানুষ বিনে হবে নাকো

সহজ মানুষের করণ।

এই মানুষে আছে সেই মানুষ

তার ভাব অগম্য পরব্রহ্ম পরমপুরুষ।

এই মানুষ ধ'রে যাবি ত'রে।

এই মানবদরদী পদকার এমন আশ্চর্য বিশ্বাসের ও প্রত্যয়ের গান লিখেছেন আঠারো শতকের তথাকথিত অবক্ষয়ের বাতাবরণে অথচ শিষ্ট সাহিত্য-সমাজে তখন লেখা হচ্ছে বিদ্যাসুন্দরের পঙ্কিল প্রণয় কাহিনী কিংবা বীতমান সাধকবর্গ লিখছেন 'তনয়ে তার তারিণী'। সেই সময়ে তারিণীর বদলে যিনি মানুষ ধ'রে তরে যাবার স্বচ্ছ পরামর্শ দেন তাঁর উন্নত মনকে কোন উচ্চ বর্গের অবক্ষয় গ্রাস করেনি। তাঁরও আগে লালন ফকির লেখেন:

জাত গেল জাত গেল ব'লে

এ কি আজব কারখানা।

এই জগতে যখন এলে

তখন তুমি কী জাত ছিলে?

যাবার সময় কী জাত হবে

কেউ তো বলে না॥

শ্রীচৈতন্যের বাণী উচ্চ সমাজে কতখানি ব্যর্থ হয়ে গেছে তার সকরুণ আলেখ্য ধরা রয়েছে লোকগীতিকারের গানে। গভীর ক্ষোভে তিনি স্মরণ করেন:

সৃষ্টিকর্তা যে হোক বটে

নবদ্বীপে গৌররূপে সকল জাত ছেঁটে

করলেন একচেটে—

সে এক মানলাম না।

তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু

জেনেও বিশ্বাস করলাম না॥*

শ্রীচৈতন্যের সবচেয়ে বড় উপহার এই ব্রাত্য ধর্মের জাগরণী। সে-জাগরণ তাঁদের দিয়েছে প্রত্যয়, সাহস ও মানবধর্ম। এই মানবধর্ম থেকে এসেছে বস্তুবাদ। ধর্মকে এঁরা দুর্বোধ্য ভাববাদ থেকে মুক্ত ক'রে এনে দিয়েছেন জীবন পর্যায়ের

* দুদ্দুর আরও অনেক মানবধর্মী গানের জন্য দ্র° 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান': সুধীর চক্রবর্তী। কলকাতা। ১৯৮৫

গহনতায়। 'বর্তমান' সাধনায় তাঁরা আশ্রয় করেছেন বাস্তব নরনারী, তাঁদের দেহ ও দেহধর্ম, কাম ও তার থেকে প্রেমে উত্তরণ, রজস্রাব, প্রজনন ও তার নিবৃত্তির পথ। দেহকে তাঁরা বুঝতে চেয়েছেন জীবন আর মাটির উপমায়। জমি আর বীজ, জীবন-মরণ-খাদ্য-ঐশ্বর্য (হায়াৎ-মউৎ-ইজ্জিৎ-দৌলৎ), জল-আগুন-বাতাস-মাটি (আব-আতস-বাত-খাক), নদীর জোয়ার-ভাঁটা, চাঁদের পূর্ণিমা আর অমাবস্যা এমনই ভাবে। সাবলীল জীবনের তাপ তাঁদের গানের কল্পনায় এনে দিয়েছে অপ্রত্যাশিত মৌলিক রূপক-প্রতীক। এনেছে হাল্‌কা প্রহাসিনী স্বতঃস্ফূর্ততা। কল্পনা আর সৃষ্টির দোলাচলে রাধাকৃষ্ণের গৌড়ীয় তত্ত্ববহুল থীমে তাঁরা আনতে পেরেছেন মানবিক সংরাগ। লোকায়ত নায়িকা তার উপাস্য গৌরচন্দ্রকে গানের বাণীতে বলেছে : 'গৌর আমার চুলবাঁধা দড়ি / গৌর কাঁচুলি'। কতদিন থেকেই বাংলায় লেখা হচ্ছে বহু নারী আসক্ত কৃষ্ণের কলঙ্ক নিয়ে কত রকম গান কিন্তু এমন সরস উপমায় লৌকিক চেতনায় কে লিখতে পেরেছেন ?

> বাঁকা শ্যাম তুমি হয়েছ ঠিক আজ বেগুন তরকারি
> হও সস্তা মাগ্‌গী সময় সময় সকল লোকের দরকারী।
> তুমি কখনও যাও ঝোল অম্বলে কখনও হও চচ্চড়ি।
> যায় না তোমার মর্ম বোঝা তুমি কখনো হও ভাজা ভোজা
> শ্যাম এখন হও হরি।
> দেখি কালকে তোমায় ঘাঁটাঘেঁটা করেছে চন্দ্রানারী॥
>
> কখনও বা থাকো মাঠে যাও বিক্রয় হ'তে সাধুর হাটে
> শ্যাম তোমার মান্যমান ভারি।
> কিন্তু আজ তোমাকে নিম চৈচকি ব'লে মুখ ফেরাবেন কিশোরী॥
>
> তুমি হওনা কারো বশীভূত চিরাকেলে সরকারী॥

কল্পনার এই মৌলিক স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রকাশভঙ্গীর বক্রতা লোকজীবন থেকেই উঠে আসে। দীর্ঘবাহিত ষোলো ও সতেরো শতকের রাধাকৃষ্ণ গানের গভীর তত্ত্বগত ঐশী ভাবজগতে বিস্ফোরণের মত এই পদ চমকে দেয়। দুর্বার জীবনস্পন্দ আরেকবার চৈতন্য-পূর্ব রাধাকৃষ্ণ লোককথায় সেই গ্রামবাংলায় হারিয়ে-যাওয়া 'ধামালী'-র ধারার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে দেয়।

আমি এদিকটাই বোঝাতে চাইছি। শিষ্ট সাহিত্যে প্রথা-প্রকরণে বা ভাবগত

পৌনঃপুনিকতায় তখন বৃত্তবন্দী হ'য়ে পড়ে যখন লোকজীবনের ভাপে-ভরা লোক-সাহিত্য বিশেষত গান নির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ততায় ও মানবরসে ঝলমল করে। কল্পনার আরক রস তাকে সরস রাখে, সন্ধ্যাভাষার নিগূঢ়তা তাকে গহন করে, জীবনস্পর্শী প্রতীক তাকে বহুবাদী ইঙ্গিতে ভরিয়ে দেয়। এই কথাগুলি মনে রেখে এবারে আমি হাড়িরামীদের একটা গানের প্রসঙ্গে আসবো যার মধ্যে আছে তাঁদের এক অত্যাশ্চর্য ধারণার জটিল তত্ত্ব অথচ গানটির সূচনা খুব নিরীহ ভাষণ দিয়ে। যেমন:

মানুষ মানুষ সবাই বলে
কে করে তার অন্বেষণ।

কোটি সমুদ্র গভীর অপার
যে জানে সে নিকট হয় তার
কলমেতে না পায় আকার
শুদ্ধ রাগেরই করণ॥

এমনই এই মানুষ ‑তত্ত্ব যা কলমে লেখা যায় না, সমুদ্রের মত পারাপারহীন অথৈ অথচ রাগের করণ দিয়ে তার নিকটবর্তী হওয়া যায়। এই রাগের করণ হ'ল কায়াসাধন। এরপরের কথাটাই গুরুত্বপূর্ণ:

রাসলীলা হয় বৃন্দাবনে
জানে কোন ভাগ্যবানে।
রাধাকৃষ্ণ নাহি জানে
নাহি জানে গোপীগণ॥

একটা উলটো চিন্তার বিন্যাস গানে গাঁথা রয়েছে। বৃন্দাবনে রাসলীলা হয় অথচ গোপীগণ বা স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ তা জানেন্ না। এ কথা খুব নতুন। কিন্তু তার তাৎপর্য কি? অর্থবোধ হলে বোঝা যাবে এ-গানে গাঁথা আছে একই সঙ্গে হাড়িরাম তত্ত্ব অথচ বৈষ্ণব বিরোধিতা। এখানে সশ্রদ্ধায় স্বীকার করবো গানের এই অংশের অন্তর্গত তত্ত্ব আমি কোনদিনই বুঝতে পারতাম না যদি না বোঝাতেন সাহেবনগরের ফণী বিশ্বাস।

হাড়িরামের শিষ্যরা বিশ্বাস করেন এই তত্ত্বে যে, ব্রহ্মা হলেন সৃজন কর্তা এবং মানবদেহে তাঁর অবস্থান হ'ল মাথায়। বিষ্ণু পালন কর্তা, তাঁর অবস্থান বুকে। শিব সংহার কর্তা, তাঁর অবস্থান লিঙ্গে। বৃন্দাবনের রাসলীলা বলতে এখানে বুঝতে হবে পুরুষ প্রকৃতির সংগম। যদিও হাড়িরাম তত্ত্বে বলা হয় 'সখার সখী নেই' কিন্তু তাঁরা ব্রহ্মচারী নন, গৃহী। পরকীয়াবাদী নন, সংযতভাবে

যৌনজীবন পালনে আগ্রহী। সেই গৃহীবর্গে পুরুষ নারীর মেহসংসর্গেই হ'তে পারে রাসলীলার উপলব্ধি। কিন্তু সে উপলব্ধি একমাত্র শিবেরই আধারে, কৃষ্ণের নয়। কেননা কৃষ্ণ তো বক্ষদেশে থাকেন। শিবের স্থান জননকেন্দ্রে। হাড়িরামীদের গানে যেখানেই 'কিঞ্চিৎ জানে মহেশ্বর' বাক্যটি ব্যবহার আছে তার নিহিতার্থ এইটাই। এই সূত্রে বিচার্য যে হাড়িরাম তত্ত্বে এমনতর শৈব প্রাধান্য কেন? একটা আনুমানিক কারণ বৈষ্ণব বিরোধিতা আরেকটি কারণ সম্ভবত সমসাময়িক নাথযোগীদের সঙ্গে হাড়িরামের সংযোগ। মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত জনপদে বিশেষত মধ্যবর্তী চুয়াডাঙা মহকুমায় নাথ-যোগীদের প্রচুর বসবাস ছিল এবং এখনও আছে। মল্লিকবাড়ি থেকে চলে গিয়ে যে কয়েক বছর বলরাম ভ্রমণ করেছিলেন অন্যত্র সে সময় তাঁর নাথযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া খুবই সম্ভব। তাঁর অন্যতম প্রত্যক্ষ শিষ্য দীনু (হাড়িরামীদের প্রধান পদকার) ছিলেন জাতে যোগী। মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়ার সেকালে তাঁতিরা অনেকে ছিলেন যোগী-তাঁতি। রিসলি ১৮৯১ সালে তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' বইয়ের প্রথম খণ্ডে যে লিখেছিলেন : 'Balarami, a sub-caste of Tantis in Bengal' সে কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? মোটকথা হাড়িরাম তত্ত্ব যতই আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো ততই শৈব ভাবনার সঙ্গে, অদ্বৈত ভাবনার ও নাথ যোগীপন্থার সঙ্গে তার সংলগ্নতা ধরতে পারলো। 'রাম পদরজ লাগি শিবশঙ্কর হয়েছে যোগী'—জাতীয় পংক্তি আভাসিত করে হাড়িরাম তত্ত্বের সঙ্গে শৈবদের সখ্য। পাশাপাশি 'ভাব না জেনে কৌপীন আঁটা গোপী ব্যবহার'—জাতীয় পংক্তিতে স্পষ্ট বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হাড়িরামীদের প্রকৃত অবস্থার নির্দেশক।

কিন্তু এই আলোচনা-পর্যায়ে উপাস্য হাড়িরামের সঙ্গে তাঁর উপাসক শিষ্যদের সম্পর্কের স্বরূপ বোঝাও দরকার। বৈষ্ণব দ্বৈতবাদে ভক্ত-ভগবান একটা সরল খাড়াখাড়ি সম্পর্কের দ্যোতক। শ্রীচৈতন্য তাঁর সাধনার রাধাভাবে কৃষ্ণভজনা করার পর ঐ পদ্ধতি অন্যের পক্ষে আর গ্রহণীয় নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণভজনার স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল গোপীভাবে অথবা মঞ্জরীভাবে সাধনা। শোনা যায় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার গৌরাঙ্গের সাধনায় 'গৌরনাগরী' ভাবের প্রবর্তন করেন। সে পদ্ধতি সে সময়ে অনেক শুদ্ধ বৈষ্ণব মানেন নি। তবে রাগমার্গের বৈষ্ণবীয় সাধনায় কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গকে পুরুষরূপে কল্পনা ক'রে ভক্ত নিজেকে নারীরূপে ভেবেছেন এমন ঘটনা বা ভজনার বিবরণ ও পদ অনেক আছে। হাড়িরামীদের কয়েকটি গানে

তাঁকে 'পিতাপতি' এমন আশ্চর্য সম্বোধন করা হয়েছে। একটি গানে বলা হয়েছে :

হাড়িরাম পৃথিবীদাতা হাড়িরাম জগতের পিতা
হাড়িরাম জ্ঞানদাতা হাড়িরাম বিশ্ব ভূমণ্ডল।

উপাস্যের এমন এক উদার সর্বব্যাপী কল্পনা সাধারণত লোকধর্মে আমরা জানিনি। অন্য কয়েকটি-গানে আছে আশ্চর্যজনক কিছু পংক্তি। যেমন একটি পদে বলা হয়েছে :

হাড়ি রামদীন পুরুষ আর সব নারী।

এর পাশে দেখা যেতে পারে আরেকটি পদ যেখানে বলা হয়েছে :

এইবার জীবে কর স্থিতি
তবে হবে ভাব প্রকৃতি
ঘুচে যাবে পুরুষ জাতি
হয়ে যাবি পার।

এই পদাংশগুলি ব্যাখ্যা করলে স্পষ্ট হয় যে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের সাধনায় ভক্তের লক্ষ্য হ'ল নিজের পুরুষসত্তার লোপ। হাড়িরামই একমাত্র পুরুষ। তিনিই পিতা, কেননা তাঁর হাই থেকে হৈমবতীর সৃষ্টি, সেই হৈমবতী থেকে আর সবের সৃজন। কাজেই দিব্যযুগে যখন নারী ছিল না তখন হাড়িরাম স্বয়ং সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তিনি তাই পিতা। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁকে পিতাপতি বলা হয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে ব্রহ্মাণ্ডের পতি নিত্যপুরুষ তিনি সেইসঙ্গে স্রষ্টা ব'লে পিতা। একটি পদে কথাটা স্পষ্ট হয় :

রামদীন তুমি নিত্যপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের পতি
তোমা ভিন্ন জীবের নাইকো অন্তগতি
সৃষ্টির কর স্থিতি ওহে পিতাপতি।

তাহ'লে স্রষ্টা ব'লে তিনি পিতা, সংস্থিতি করেন ব'লে পতি। হাড়িরাম সম্প্রদায়ে তাহলে আরেকটা মৌলিকতা আমরা খুঁজে পেলাম। উপাস্যের সঙ্গে উপাসকের এখানে উভবল সম্পর্ক।

হাড়িরাম সম্প্রদায়ে সব কিছুই মানবিক এও এক অভিনবত্ব। তাঁরা অবতারবাদ মানেন না, মৃত্যুর পর গোলোক বা স্বর্গ কামনা করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন এ জন্মে শুদ্ধ বিচারে হাড়িরামকে 'একিনে' (অর্থাৎ একাগ্র হয়ে) চরণাশ্রয় করতে পারলে আবার মানবজন্ম হবে। দুটি পদাংশ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

১ হাড়িরামের চরণ বিনে আর অন্য উপায় দেখিনে
থাকো একিনে।
পুনঃ যদি মানব হবি হাড়ির চরণ কর সার॥
২ পাবি যদি হাড়িরামের গুণগান
তবে মানবদেহের গঠন পাবি।

বলতেই হয় অভিনব এই ধর্মমতের পরিকল্পনা ও বিন্যাস। 'মানুষ মানুষ সবাই বলে কে করে তার অন্বেষণ' এই আর্তি যাঁদের পরিক্রমার প্রথম উচ্চারণ তাঁদের শেষ আকাঙ্ক্ষা সেই মানবদেহকেই আবার পাওয়া। নির্বাণ আর মুক্তিলাভের পলায়নবাদী দেশে এমন মানবাগ্রহী চক্রাবর্তে একটা সম্প্রদায়কে যিনি বিশ্বাসী ক'রে তুলেছিলেন তাঁর জীবনবৃত্তান্তের গভীরে আমরা কি আর একটু অনুসন্ধান করবো না? জানা উচিত নয় কি হাড়িরামীরা তাঁকে নিয়ে কেমন ভাবে কি কি কল্পকাহিনী বা মীথ বানিয়েছেন?

'হাড় হাভ্‌ডি মণি মগজ'

আমাদের শিষ্ট সমাজে বলরাম হাড়ির কথা কজনই বা শুনেছেন? শোনেননি তার কারণ সেই মানুষটি বাস করতেন প্রত্যন্ত গ্রামে আর নীচু সমাজে। কাব্যে-গাথায়-গানে তো এমন মানুষের কীর্তিকাহিনী লেখার রেওয়াজ নেই। খুব একটা বীরত্বব্যঞ্জক কাজও তিনি করেননি। তাঁর জীবনকথায় অলৌকিকতাও তেমন কই আর? যেমন ধরা যাক, কর্তাভজা মতের যিনি প্রথম ব্যক্তি সেই আউলচাঁদ নাকি ছিলেন দরবেশ ফকির। একদিন তিনি গঙ্গার ওপারে যাবেন কিন্তু খেয়া নেই। কী আর করেন? তখন নাকি নিজের কমণ্ডলুতে গঙ্গা পুরে নিয়ে শুকনো খটখটে নদী পেরিয়ে গেলেন স্বচ্ছন্দে। কিংবা তাঁর সম্পর্কে আরেকটি কিংবদন্তী এই রকম যে, ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল যখন জমির কাজে ব্যস্ত তখন খবর এলো তাঁর পত্নী সরস্বতী (পরে ইনিই হবেন 'সতী মা') মরণাপন্ন বা মতান্তরে মৃত। সেই বিপন্ন সময়ে আউলচাঁদ ছিলেন উপস্থিত। তিনি রামশরণের গৃহসংলগ্ন ডালিম-তলার মাটি হিমসাগর পুকুরের জলে ভিজিয়ে প্রলেপ দিলেন সরস্বতীর শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেঁচে উঠলেন। তারপরে যখন ফকির আউলচাঁদের ফিরে যাবার সময় হ'ল তখন স্বামী-স্ত্রী কেঁদে পড়লেন তাঁর পায়ে, কিছুতেই তাঁরা ছাড়বেন না ফকিরকে। ফকির তখন সেই নাছোড় দম্পতিকে আশ্বাস দিলেন, ভবিষ্যতে তাঁদের সন্তান হয়ে তিনি ফিরে আসবেন আবার।

বিশ্বাসের গুণে আউলচাঁদের খাড়াখাড়ি এক কল্পকাহিনী এবারে নিলো এক আড়াআড়ি বিস্তার। রামশরণ-সরস্বতীর সন্তান হয়ে জন্মালেন দুলালচাঁদ।

বিশ্বাসীরা তাঁর জননীর নতুন নামকরণ করলো—সতী মা। কেন হঠাৎ সতী মা?
এখানেও পাওয়া যাবে এক চমৎকার নির্মাণের সূত্র। সেটা এই রকম—দুলালচাঁদ
কে? দুলালচাঁদ হলেন আসলে আউলচাঁদ। আউলচাঁদ কে? আউলচাঁদ আসলে
গোরাচাঁদ বা শ্রীচৈতন্য। তাহলে দুলালচাঁদ মানে আসলেগোরাচাঁদ। তাঁর মাতাই
সতী মা। শচী মা থেকে সতী মা। কর্তাভজা ধর্মে এঁরাই প্রধান পূজ্য: সতী
মা ও দুলালচাঁদ। এঁরাই প্রচার করেছেন, সংগঠিত করেছেন, বিস্তার করেছেন
কর্তাভজা মতের। সেই প্রচার ও বিস্তারে জনশ্রুতির ভূমিকা খুব ব্যাপক। এখনও
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ঘোষপাড়ার দোলউৎসবে কর্তাভজাদের বার্ষিক সম্মেলনে হাজির
হ'লে সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী গ্রামীণ গুরু (তাঁদের বলা হয় 'মহাশয়') আর শিষ্যদের
(তাঁদের বলে 'বরাতি') মুখে মুখে এসব জনশ্রুতি বা কৌশলবিন্যস্ত কাহিনী শুনতে
পাওয়া যায়। এমনকি শুনতে পাওয়া যায় কিছু পদ্যাকারে লেখা প্রবচন,
আউলচাঁদের অলৌকিক মহিমা বিষয়ে। যেমন:

সে যে হারা দেওয়ায়
মরা বাঁচায়।
তার আদেশে গঙ্গা শুকালো।

আউলচাঁদের এই অলৌকিক কাহিনী মুখে মুখে এতটাই ছড়িয়ে গেছে যে দীর্ঘ-
দিন থেকে বহু দূর-দূরান্তরের গ্রাম ও জনপদ থেকে অজস্র দুঃখপীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত,
ভাগ্যহত মানুষ ঘোষপাড়ায় এখনও আসেন এবং ডালিমতলার মাটি মেখে (এবং
খেয়ে) হিমসাগরের জলে স্নান ক'রে শাপমুক্ত হবার চেষ্টা করেন। সতী মা-র
নামে তাঁর অলৌকিক মহিমা বিষয়ে অনেক পদ্য ও গান কে বা কারা লিখে
সম্প্রদায়ীদের মধ্যে এবং বাংলার বহু দূর বিস্তৃত গ্রামসমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন।
সে সবও আমরা ঘোষপাড়া থেকে পাই। যেমন একটা গানে বলা হচ্ছে:

দিলে সতীমায়ের জয় নিলে কর্তামায়ের জয়
আপদ খণ্ডে বিপদ খণ্ডে কালের ভয়।
দিলে মায়ের দোহাই ঘোচে আপদ বালাই
ছুঁতে পারে না কাল শমনে।

আরেকটি পদ্যবন্ধে সতী মা-র বহুতর মহিমা প্রকটিত হয়:

সতী মা উপরে যেবা রাখিবে বিশ্বাস।
সেরে যাবে কুষ্ঠব্যাধি হাঁপ শূল কাশ॥
কৃপা হ'লে তবে তাঁর ঘটে অঘটন।

অন্ধ পায় দৃষ্টিশক্তি বধিরে শ্রবণ॥
চিত্ত যেবা রাখে পায় বিত্ত পায় ভবে।
বন্ধ্যানারী পুত্র পাবে তাঁহার প্রভাবে॥
সতী মা-র ভোগ দিতে হবে যার যতি।
সকল বিপদে সেই পাবে অব্যাহতি॥

এ সব গান ও পদ্যবন্ধ রচনায় কৌশল ও বাঁধুনি থেকে অনুমান করা চলে যে, কোন মেধাবী মানুষ বা শিক্ষিতব্যক্তি এগুলির রচয়িতা। কোন ভাবেই এগুলি লোক রচনা নয়। তবে কি এ-রচনার পেছনে কাজ করেছে গুরু সম্প্রদায়ের কোন অর্থকরী পরিকল্পনা? সম্ভবত তাই। রোগ আরোগ্যের একটা রটিয়ে-দেওয়া জনশ্রুতি অনেক সময় বাংলার গৌণধর্মগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়। জন-প্রিয়তা অর্জন ও মূর্খ কুসংস্কারগ্রস্ত অসহায় মানুষদের আকর্ষণ তার মূল লক্ষ্য নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে থাকে অর্থোপার্জনের একটা প্রচ্ছন্ন কৌশল। যেমন সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের গীতিকার কুবির গোঁসাই তাঁর গুরু চরণচাঁদ পালের মহিমা বর্ণনা ক'রে লিখেছিলেন:

আমার চরণ চাঁদের জোরে
কত দুখী তাপী তরে
হাঁপ কাশি শূল গুড়ুম ব্যথা
মহা ব্যাধি হয় আরাম।

সতী মা-র মহিমা খ্যাপনে হাঁপ শূল কাশ (পল্লীগ্রামের দুরারোগ্য ও ব্যাপক বিস্তারিত ব্যাধি) ছাড়াও যুক্ত হয়েছে কুষ্ঠ। সেই সঙ্গে অন্ধের দৃষ্টি, বধিরের শ্রবণ ও বন্ধ্যার সন্তানলাভের উদগ্র বাসনাপূরণের যে-সর্বাত্মক পরিকল্পনা রয়েছে তার বেড়াজালে কে না ধরা দেবে? বলতেই হয় খুব সুরচিত প্রকল্প। অবশ্য এই কল্পকাহিনী আধুনিক কালের নয়। ১৮১৮ সালে ডব্লু. ওয়ার্ড কটাক্ষ ক'রে লিখেছেন আউলচাঁদ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন রামশরণকে ('It is pretended he communicated his supernatural powers') এবং তার ফলে রামশরণ 'persuaded multitudes that he could cure leprosy and other diseases'। এরপরে ওয়ার্ড বলেছেন আরেক ইঙ্গিত-পূর্ণ কথা যে, 'By this means, from a state of deep poverty he became rich, and his son now lives in affluence'।

এর পরের ধাপে রোগ-আরোগ্যের কাহিনী আরেক চতুর বিস্তাসে রামশরণের

কাছ থেকে চলে গেছে সতী মা-র কথাতে। এ-সম্পর্কে কর্তাভজা সম্প্রদায়েরই ভক্ত জনৈক মনুলাল মিশ্র তাঁর 'সহজতত্ত্ব প্রকাশ' বইতে লিখেছেন :

> তাঁহার (অর্থাৎ রামশরণ) তিরোধানের পর মহাত্মা দুলালচাঁদের চেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত সতী মায়ের অলৌকিক শক্তির কাহিনী কর্তাভজন ধর্মকে জগতে প্রচারিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল।

বাংলার লোকধর্মে কোথাও কোথাও এই সব কল্পিত কাহিনী, যার মূলে প্রবর্তকের অলৌকিকতা প্রচার ও অর্থোপার্জনের যুগল উদ্দেশ্য থাকে, বেশ প্রচলিত। তার কারণ গুরুবাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং নিত্যধামকে স্থানগত গুরুত্ব আরোপের তাগিদ। একটু তলিয়ে বুঝলেই দেখা যাবে, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গুরুপাট নদীয়ার বৃত্তিহুদা গ্রাম বা কর্তাভজাদের ঘোষপাড়া থেকে তাঁদের গুরুবংশ কোনদিন স্খলিত হবে না। ঘোষপাড়াতেই যেহেতু আছে সেই প্রবাদপ্রতিম হিমসাগর ও ডালিমতলা তাই কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত। ঐ অলৌকিক আকর্ষণেই আসবেন অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত কিংবদন্তীবিশ্বাসী জনগণ, বহুকাল।

প্রচলিত লোকধর্মের সঙ্গে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের বহুরকম তফাৎ আমি আগেই দেখিয়েছি। আবার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে হাড়িরামীরা কখনও তাঁদের প্রবর্তকের ব্যাধিতারণ মূর্তি গড়েন নি। মেহেরপুর বা নিশ্চিন্তপুর কখনই রোগ সারাবার কিংবা সন্তান কামনার স্থান হয়ে ওঠেনি। গুরুবাদে তাঁরা বিশ্বাসী ব'লেই গুরুপাটের মহিমা বা বিশেষ তীর্থ সম্পর্কে আগ্রহী নন। কুবির গোঁসাই তাঁর সাহেবধনী গুরু চরণ পালের সাধনকেন্দ্র হুদাগ্রাম বিষয়ে বলেছিলেন :

> ওরে বৃন্দাবন হ'তে বড়
> শ্রীপাট হুদাগ্রাম।

আর ঠিক উল্টো কথা বলেন হাড়িরামী শ্রীমন্ত তাঁর পদে :

> যদি বল করবে তীর্থ পর্যটন
> ভেবে দেখ মন সে সব অকারণ।
> সর্বতীর্থের ফল রামদীনের চরণ
> ভাবো যদি মন
> তোর কাজ কি গয়া কাশী ?

আরেকজন বলেন :

> গয়া গঙ্গা তীর্থ কাশী
> কোটি চন্দ্র নখের কোণে।

ভক্তরা যখন তাঁর জন্মপাটকে বৃন্দাবনের চেয়ে মহত্তর বলতে চান তখন হাড়িরামের শিষ্য বলেন তীর্থের চেয়েও বড় সেই পূর্ণমানুষ হাড়িরাম। সেই জন্যেই তাঁরা প্রবর্তককে নিয়ে এমন কোন জনশ্রুতি বানান না যাতে মহান মানুষটির ঐশী সত্তার কোন উদ্দেশ্যমূলকতা বা ভক্ত-আকর্ষণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অস্বচ্ছতা এসে যায়। তাঁরা হাড়িরামকে নিয়ে যে-সগর্ব বোধ বুকে ধরে রাখেন তার বিশ্লেষণ করলে আমরা একটা ভিন্ন চিন্তার মৌলিক ইঙ্গিত পাই।

সেই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করবার আগে বরং দেখে নেওয়া যাক উনিশ শতকের বাঙালী শিক্ষিত ভদ্র সমাজ বলরাম বিষয়ে কেমন ভেবেছেন। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র এক কাব্যাংশ, যেখানে বলরামকে কবি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এই বলে :

গলায় পৈতা মিথ্যাসাক্ষো
পটু যারা, করে গঙ্গাজলী ;
তার চেয়ে ভাল গুহক চাঁড়াল
তারচেয়ে ভাল বলাই হাড়ি—
যে হাড়ির মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি।

এখানে কপটচারী ও ভণ্ড ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিতুলনায় নীচ অন্ত্যজ দুই প্রতিনিধিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। কিন্তু মুস্কিল যে, গুহক চাঁড়াল নিতান্তই রামায়ণবর্ণিত এক কল্পিত চরিত্র আর বলাই হাড়ি একজন অনতি-অতীত কালের বাস্তব মানুষ। তবে দুজনের শ্রেণী একই অর্থাৎ উল্লেখ হয়েছে নিম্নবর্গের জাতি হিসাবে। গলায় পৈতে পরে যাঁরা মিথ্যাসাক্ষ্যদানে পটু গঙ্গাভক্তি সত্ত্বেও তাঁরা গ্রহণীয় নন ; বরং তাঁদের চেয়ে অনেক শ্রেয় চাঁড়াল ও হাড়ি তাঁদের অকপট আচরণের কারণে। তবে কাব্যাংশের শেষে 'তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি' এই মন্তব্য নিতান্তই অত্যুক্তি। কেননা কেউই বামুনকে ছেড়ে আগে বা এখন হাড়িকে পূজা করেননা। বিশেষত বলাই হাড়িকে কোন উচ্চ সমাজের মানুষ কখনও সম্ভ্রম করেননি। সত্যেন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন কেননা বলাই সত্যিই যদি তাঁর পক্ষে পূজ্য হতেন তবে 'তারে' এই সর্বনামটি তিনি লিখতেন 'তাঁরে'। একটি চন্দ্রবিন্দুর অনুপস্থিতি সত্যেন্দ্রনাথের সাম্যদৃষ্টির অন্তঃকেন্দ্র টলিয়ে দেয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে সোমপ্রকাশের প্রতিবেদন, অক্ষয়কুমার দত্ত-র বর্ণন, সুবল মিত্রের অভিধান বা বিশ্বকোষ—কোথাও বলরাম আদায় করতে

পারেননি শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বোধন।

যাইহোক উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী বলরাম সম্বন্ধে যেমনই হোক, তাঁরা মানুষটি সম্পর্কে যেসব জনশ্রুতি লিখে গেছেন তা বিশেষভাবে দেখা দরকার। সোমপ্রকাশের প্রতিবেদক লেখেন :

> বলরাম প্রথমে অতি সামান্য লোক ছিল।...গ্রামের চৌকিদারী করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অনন্তর কোন কারণবশতঃ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করে। ইহার মৃত্যুবিষয়েও নানারূপ আশ্চর্য্য কথা প্রসিদ্ধ আছে। এই ব্যক্তি মরিবার তিনদিন অগ্রে বলিয়াছেন যে, আমি অমুক দিন এত ক্ষণের সময় দেহ ত্যাগ করিব। তখন ইহার শরীরে কোন রোগের চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। পরে বাস্তবিকও সুস্থ থাকিয়া পূর্ব্বকথিত সময়ে দেহত্যাগ করিল।

বোঝাই যায়, জনশ্রুতির মধ্যে অনেক ফাঁক রেখে প্রতিবেদক তাঁর বিবরণ লিখেছেন। নিরুদ্দেশের কারণটি লেখেন নি এবং জীবনের চেয়েও মৃত্যুবিষয়ক সমাপতনটির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। সমগ্র বিবরণের কোথাও বলরাম সম্পর্কে শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমের ভাব নেই। তাঁর 'মৃত্যুবিষয়েও নানারূপ আশ্চর্য্য কথা প্রসিদ্ধ আছে' বাক্যের মধ্যে 'মৃত্যুবিষয়েও' শব্দটি থেকে বোঝা যাচ্ছে বলরামের জীবন বিষয়ে নানারূপ আশ্চর্য কথা প্রসিদ্ধ ছিল, যা প্রতিবেদক শুনেছেন কিন্তু বিশেষ কোন কারণে লেখেননি। কারণটি কি এই যে তাতে বলরাম বিষয়ে শিক্ষিত সমাজ বেশ কিছুটা উচ্চ ধারণা পেয়ে যাবেন? একজন অন্ত্যজ নেতাকে গুরুত্ব না দেওয়াই কি তাঁর লক্ষ্য? মৃত্যুবিষয়ে নানারূপ আশ্চর্য কথার মধ্যে মাত্র একটিই নিবেদন করে বাকি কথাগুলি উহ্য রাখার অন্য আর কি কারণ অনুমান করবো আমরা?

এবারে দেখা যাক, অক্ষয়কুমার দত্ত-র লেখা বিবরণের কিছু অংশ, যেখানে বাস্তব পরিবেশের খানিকটা হদিশ মেলে।

> নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি।...বলরাম ঐ গ্রামের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে চৌকিদারি কর্ম্ম করিত। তাঁহাদের ভবনে আনন্দবিহারী নামে এক বিগ্রহ আছে, ঐ বিগ্রহের অলংকার চুরি যাওয়াতে, বাবুরা বলরামকে শাসন করেন। সে বাটী

পরিত্যাগ করিয়া, গেরুয়া বস্ত্র পরিধানপূর্বক, উদাসীন হইয়া যায় এবং এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপাসক-সম্প্রদায় সংস্থাপন করে।

এই বিবরণে সমাজে বলরামের অবস্থান সম্পর্কে একটু ধারণা হয়। জাতে হাড়ি, থাকতেন তিনি গ্রামপ্রান্তে মালোপাড়ায়, জীবিকা ছিল চৌকিদারী অর্থাৎ পাহারাদারের। মনিবের গৃহবিগ্রহের অলংকার অপহরণের ফলে বাবুরা তাঁকে শাসন করলেন কেন? কর্মে গাফিলতি না চোর সন্দেহ? কথাটা স্পষ্ট করেন না অক্ষয়কুমার, কিন্তু 'নদীয়া-কাহিনী'র লেখক কুমুদনাথ স্পষ্টই বলে দেন, 'মল্লিক বাবুদের গৃহবিগ্রহ আনন্দবিহারীদেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় বাবুরা বলরামকে চোর সন্দেহে কিছু শাসন করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া মনের আবেগে বলরাম উদাসীন' হয়ে যান।

সন্দেহ লাঞ্ছনা অপবাদ থেকে বলরামের মনে যে ক্ষোভ ও বেদনা দানা বাঁধে তার থেকেই তাঁর উদাসীন ধর্ম গ্রহণ এবং পরিণামে স্বসম্প্রদায় স্থাপন এই পর্যন্ত যুক্তির বিন্যাস জনশ্রুতি অনুযায়ী বেশ সাজানো যায়। এমনকি যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিবরণ অনুসারে 'being very cruelly treated···he severed his connection with them. After wandering about for some years, he set himself up as a religious teacher and attracted round him more than twenty thousand disciples' বেশ মানানসই বিবরণ। কিন্তু অব্রাহ্মণ মল্লিকদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে বলরাম কেন ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলেন জনশ্রুতি তার কোন মীমাংসা করেনা, অথচ যোগেন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষই হাড়িরাম সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভাষায়: The most important feature of his cult was the hatred that he taught his followers to entertain towards Brahmans। এখানে he taught অংশটুকু অনুধাবনযোগ্য। পাঠকদের মনে পড়বে ভৈরব নদীতে ব্রাহ্মণদের তর্পণ ও বলরামের শাকের ক্ষেতে জলসেচনের জনশ্রুতি। এই ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষের উৎস আমরা কোথায় পাবো? তা কি আমরা খুঁজে পাবো উনিশ শতকের গোড়ায় গ্রামীণ ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুর সমাজপতিত্বের সূত্রে? বলরামকে যে মল্লিকরা লাঞ্ছনা করেছিলেন সে কি মেহেরপুরের কোন ব্রাহ্মণ সামন্তের পরামর্শে?

এ সব প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা এবার সাহায্য নিতে পারি হাড়িরামীদের মুখে-মুখে-চলা কয়েকটি গল্পের। প্রথম কাহিনী:

নিশ্চিন্তপুরে হাড়িরাম মাঝে মাঝে এসে বাস করতেন। সেই জন্যে তৈরি করেছিলেন এক আশ্রম। তখন নিশ্চিন্তপুরের জমিদার ছিলেন নাকাশীপাড়ার কানাইবাবু। নিশ্চিন্তপুরে ছিল তাঁর গোলাবাড়ি। তাঁর জমিদারীর মধ্যে ছোটলোক হাড়িরামের বাড়বাড়ন্ত বাবুদের সহ্য হচ্ছিল না। তাঁর খাস তালুকের প্রজারাই সনাতন পথ ত্যাগ ক'রে হাড়িরামের পথে চলে যাচ্ছে দেখে তিনি রেগে ছিলেন। একদিন হাড়িরাম যখন দুপুরবেলা স্নান করতে গেছেন জলাঙ্গী নদীতে, সেই সুযোগে কানাইবাবুর পাইক বরকন্দাজ হাড়িরামের কুটিরে আগুন লাগিয়ে দিলে। একজন ছুটে খবর দিলো : 'তোমার ঘরে আগুন লাগিয়েছে কানাইবাবুর লোক'। হাড়িরাম বললেন : 'আমার ঘরে কে আগুন দেয়? যে আগুন দিয়েছে সে নিজের ঘরই পুড়িয়েছে'।

এই ব'লে হাড়িরাম চলে গেলেন গ্রাম ত্যাগ ক'রে। তিন পদক্ষেপে তিনি পেঁাছোলেন মেহেরপুরে। প্রথম পা রাখলেন নিশ্চিন্তপুরে, তারপরে পা রাখলেন চাঁপাগারার মাঠে, তারপরের পদক্ষেপেই মেহেরপুর। এবারে শুরু হলো নিশ্চিন্তপুরে অঝোরধারে অকালবর্ষণ বিশেষ করে সেই কানাইবাবুর গোলাবাড়ির ওপরে। দীর্ঘ ন দিন বৃষ্টিতে গোলাবাড়ির চারদিকে গোল ফাটল ধ'রে ঐ এলাকা অতলে তলিয়ে গেল। এখন সেই জায়গাটাকে বলে গোলাবেড়ের দহ।

এবারে শোনা যাক দ্বিতীয় কাহিনী :

হাড়িরামের জীবিতকালে একটা বেলতলা-আখড়া ছিল নিশ্চিন্তপুরে। সেটা তন্থর তৈরী। আশপাশের উচ্চসমাজের লোকজন বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণরা ঐ আখড়া আর হাড়িরামকে দেখতে পারতো না। অথচ ঐ স্থানের মাহাত্ম্য ছিল আলাদা। হাজার হলেও মাঝে মাঝে হাড়িরাম এসে থাকতেন তাতে। তো একদিন ভদ্রলোকরা এসে সেই আখড়া পুড়িয়ে দিল। তারপরে আবার তন্থ নতুন বেলতলা আখড়া গড়ে। এখন সেটাই আছে।

এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়, কেন হাড়িরাম তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন ব্রাহ্মণদের ঘৃণা করতে। সেইসঙ্গে তাঁর নিষেধ ছিল কাউকে প্রণাম করতে, গঙ্গাজল স্পর্শ করতে। মূর্তি পূজা করা আর দেবদেবীর নাম ক'রে ভিক্ষা

চাওয়া তাঁর পছন্দ ছিল। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে জনশ্রুতিতে মল্লিকবাবুদের নামটা কেমন ক'রে এসে গেল বা তিনি সত্যিই মল্লিকবাড়ি দারোয়ানী করতেন কিনা তা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে হাড়িরামের কাহিনী, যা তাঁর অনুগামীরা আজও বলেন, সেটা এবারে শোনা যাক।

> হাড়িরাম জন্মেছিলেন মেহেরপুরের হাজরা বাড়িতে। হাজরাদের ছয় ছেলে। ছোটছেলের বিয়ের পর গণক ঠাকুর গণনা ক'রে বললেন, এর যে সন্তান হবে তার থেকে বংশ হবে নির্বংশ।
>
> সেই থেকে বাড়ির ছোট বউকে কেউ দেখতে পারে না। তিনি তখন গর্ভবতী কিন্তু গর্ভ রাখেন গোপন ক'রে সকলের চোখের আড়ালে আর নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কাঁদেন লুকিয়ে লুকিয়ে।
>
> একদিন ছোট বউ ঘর নিকোচ্ছেন। হঠাৎ চালা ঘরের মটকা ফাঁক ক'রে চুল দাড়ি শুদ্ধ একরত্তি এক পুতুলের মত সন্তান মেঝেয় এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ হয়ে ছোট বউয়ের গর্ভ শূন্য হয়ে যায়।
>
> সেই একরত্তি সন্তান ছোট বউ কাপড়ে জড়িয়ে রাখেন। তারপরে স্নান করতে গিয়ে নদীর ধারে জঙ্গলে ফেলে দেন।
>
> এদিকে ছোট বউয়ের দিদি পাটকেবাড়ি গ্রামে জমিদারের বাড়ি ঝি-গিরি করতেন। তাঁকে হাড়িরাম স্বপ্ন দেন। সেই মাসী এসে বলরামকে নিয়ে যান জঙ্গল থেকে। জঙ্গলে তাঁকে পাহারা দিয়ে রেখেছিল দুই বাঘ।
>
> পাটকেবাড়ির বাবুদের ওখানে আট বছর বয়স অবধি থাকেন বলরাম। তার পর আসেন মেহেরপুর। সেখানে মাসী কাজ পান জীবন উকিলের বাড়ি। বলরাম ততদিনে চোখালো মুখালো হয়ে উঠেছেন। তিনি তখন জীবন উকিলের গরু চরাতে লাগলেন।

এই পর্যন্ত বলরাম-কাহিনী ব'লে আমি পাঠকদের একটু অন্য কথা বলে নেব। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, বলরামের জন্মবৃত্তান্ত ঈষৎ অলৌকিক। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে রজবীজের সন্তান ব'লে বর্ণনা করেননি। ছোট বউয়ের Immaculate conception-ও নয় এমনকি। তাঁদের গল্পে একদিকে থাকে জননীর ছল গর্ভধারণ, আরেকদিকে থাকে বলরামের অলৌকিক দিব্য আবির্ভাব জটাজুট-ধারীরূপে। এইভাবে তাঁরা বলরামের দরিদ্র অবস্থা, চৌকিদারী, চুরি, লাঞ্ছনা,

জন্মবৃত্তান্তের কাহিনী ও যোগীরূপে প্রত্যাবর্তনকে উড়িয়ে দিয়েছেন।[১৮] অবশ্য এখানে দ্বিতীয়ত বা বিশেষ লক্ষণীয় তা হলো মেহেরপুরের জীবন উকিলের উল্লেখ। পাঠকদের মনে পড়বে, মেহেরপুরের বিবরণ প্রসঙ্গে আমরা আগে জেনেছি (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩১) বলরামের আখড়ার সেই ৩৫ শতক জমি দান করেন বলরামের নামে জমিদার জীবন মুখোপাধ্যায়। ইনিই তাহলে ঐ গল্পের জীবন উকিল? প্রশ্ন হলো কেন তিনি জমি দান করেছিলেন বলরামকে? সে কি কোন পূর্বকৃত অন্যায়ের অনুতাপে অথবা বলরামের ঐশী মহিমার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার স্মারকরূপে? আজ আর তা জানা যাবে না তবে এই প্রসঙ্গে আমরা হাড়িরাম সংক্রান্ত কাহিনীর বাকি অংশ জেনে নিতে পারি। বলা হয়েছিল এর আগে যে,

> বলরামের মাসী মেহেরপুরে এসে জীবন উকিলের বাড়ি পরিচারিকা হলেন আর বলরাম করতে লাগলেন রাখালি। একদিন জীবন উকিলের গুরুদেব এলেন। বলরামের ওপর আদেশ হলো গুরুদেবকে ভৈরব নদীতে স্নান করতে নিয়ে যাবার। বলরাম সে কাজ সম্পন্ন করলেন এবং ঐ সময়ে নদীর ধারে সেই তর্পণ ও শাকখেতের সেচ ব্যাপারে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও উচিত জবাবের ঘটনা ঘটলো ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজের মধ্যে। তখন গুরুর নির্দেশে বলরাম তাঁর ক্ষমতা দেখাতে জলসেচের ভঙ্গীতে নদীর জল শূন্য পথে পাঠালেন বহুদূরের জমিতে। বাড়ি ফিরে গুরু বললেন জীবনকে, 'এ তুমি কাকে রেখেছো চাকর বানিয়ে? ইনি তো মহাপুরুষ, পরমযোগী।'
>
> জীবন উকিল তাই শুনে বলরামকে সবিনয়ে বিদায় দিলেন। তখন বলরাম কোথায় আর যান? তিনি বললেন, 'মা আমাকে যে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিল সেখানেই যাব ফিরে।' যে কথা সেই কাজ। তিনি ফিরে গেলেন সেই নদীর ধারে জঙ্গলে। সেখানেই সব সাফসুফ ক'রে গড়ে উঠলো বলরামচন্দ্রের আখড়া। জায়গাটা ছিল জীবন উকিলের। তিনি তা বলরামের নামে লেখাপড়া ক'রে দিয়ে ধন্য হলেন।

এ-কাহিনীর বিন্যাস লক্ষ করলে ধরা পড়ে অলৌকিকতা ও বাস্তবতা এখানে চমৎকার মিশে গেছে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে লড়াই যেমন আছে তেমনই রয়েছে ব্রাহ্মণ জীবন উকিলের সহযোগিতার বিবরণ। জীবন উকিলের জমিদানের ঘটনা তো সরকারী নথিভুক্তই রয়েছে।

এবারে তাহলে আমরা বুঝে নিতে পারি, হাড়িরাম এমনই এক প্রবল ব্যক্তিত্ব (যদি অলৌকিকতা বাদও দিই) যাঁকে ঘিরে দুরকম জনশ্রুতি গড়ে উঠেছিল। একধরনের জনশ্রুতি গ'ড়ে ওঠে উচ্চসমাজে, আরেক রকম জনশ্রুতি তাঁর অন্ত্যজ অনুগামীদের বিশ্বাসে। দুধরনের কাহিনীর দুধরনের বিন্যাস, বলবার কথাটাও আলাদা রকমের। কিন্তু আমরা তার মধ্যে বিশেষভাবে জোর দেব অনুগামীদের তৈরি গাঁথে। তার গোড়াতেই মনে রাখবো, হাড়িরাম নিজে ছিলেন জাতে হাড়ি। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ছিলেন প্রধানত হাড়ি, মালো, মুচি, মুগী, নমঃশূদ্র, বেদে এবং স্বল্পসংখ্যক মাহিষ্য। এদের বেশির ভাগই তফসিলী পর্যায়ে পড়েন (মাহিষ্য বাদে) এবং শূদ্র সমাজেও এঁদের খুব নীচের ধাপে অবস্থান। ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী লিখেছেন :

> It can easily be shown that many castes owe their lower social and economic status to their present or former refusal to take to food production and plough agriculture. The lowest castes often preserve tribal rites, usages, and myths.*

খাদ্যোৎপাদন আর হলকর্ষণে যুগ যুগ ধ'রে যে সব উপজাতি অনীহা দেখিয়েছে, বৃহত্তর জনসমাজে তারা ক্রমেই ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছে। জমি যেমন মানুষকে টেনে রাখে সামূহিক সমাজসূত্রে, তেমনই জমির কর্তৃত্ব থাকলে সমাজে তার স্থানও থাকে নির্দিষ্ট ও অনড়। দীর্ঘকাল ধরে হাড়ি ডোম দোসাদ ভাঙি এসব নীচু জাতি জমিচাষ আর খাদ্য তৈরিতে উৎসাহ দেখায় নি ব'লে ব্রাহ্মণ-ভিত্তিক সমাজ থেকে তারা দূরে সরে গেছে, হারিয়েছে অধিকার। গ্রাম জনপদের প্রান্তসীমাবাসী হ'য়ে এদের মেনে নিতে হয়েছে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, গ্রহণ করতে হয়েছে নানা অবমাননাকর জীবিকা। মেথর মুর্দফরাস শুয়োর-চরানো আর দারোয়ানী এদের জাত ব্যবসা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। কোশাম্বী ইঙ্গিত করেছেন অর্থনৈতিক মানদণ্ডে তলিয়ে যেতে যেতে এ সব ব্রাত্য জাতি নিম্নতম জাতিতে পরিণত হ'তে হ'তে শেষপর্যন্ত ভিখারী ও তস্করে

---

* দ্রষ্টব্য D. D. Kosambi-র The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline বইয়ের 1970 সালের সংস্করণ।

পরিণত হয়েছে। নৃতত্ত্বের বিচারে ডোম আর হাড়িদের মধ্যে খুব তফাৎ নেই। এইচ. এইচ. রিসলি তাঁর The Tribes and Castes of Bengal বইয়ের প্রথম খণ্ডে ১৮৯১ সালে লেখেন, 'ডোম আর দোসাদ হলো দরিদ্র কৃষক ; যে রায়তকে যদৃচ্ছ উৎখাত করা যায়, অথবা বড়জোর দখলী স্বত্ববান রায়ত—তাদের থেকে উন্নত অবস্থা এদের কোন কালেই হয়নি। বাগদের মত এদের বেশির ভাগই জীবিকায় যাযাবর চাষি, নয়ত ভূমিহীন দিনমজুর। দরিদ্রতম এবং দুর্বলতম গ্রামবাসী তারা, তাই জমিদার কি সরকারের বেগার দেওয়া এদেরই কাজ ; যে কোনরকম অস্পৃশ্য কর্মপালনে তারা বাধ্য ; যুগ যুগ ধরে এরাই আছে সমগ্র হিন্দু সমাজের ক্রীতদাসের ভূমিকায়।'*

খাদ্যোৎপাদনে অনুৎসাহী এইসব অন্ত্যজ জাতি মুক্ত অরণ্যে ফলাহরণ করে বেঁচে বর্তে থাকতো একসময়ে। তারপরে যতই সভ্যতার চাপ বেড়েছে, অরণ্য-ভূমি করেছে অন্তর্ধান, ততই ভূমিহীন এই সব অসহায় জাতি নামতে বাধ্য হয়েছে হীনতম কাজে। পেয়েছে উপেক্ষা আর ঘৃণা, তিরস্কার আর শাসন। ক্রমে হয়ে গেছে ভিক্ষুক। সব শেষ স্তরে চোর ডাকাত। এই জন্যই কোশাম্বী মন্তব্য করেছেন :

> Such nethermost groups were accurately labelled the 'criminal tribes' by the British in India, because they refused as a rule to acknowledge law and order outside the tribe.

বৃটিশের মার্কামারা এই অপরাধপ্রবণ জাতির একজন হলেন বলরাম হাড়ি। তাঁকে যে চোর সন্দেহে নিগ্রহ করা হয়েছিল সে তো উচ্চ সমাজের কাছে তাঁর জাতিগত প্রাপ্য। তিনি যে তাঁর সম্প্রদায়কে ভিক্ষাজীবী করতে চেয়েছিলেন তার মূলেও কি জাতিরক্তের সংস্কার না কি বৈরাগ্যের শর্ত ?

এই সূত্রে আলাদাভাবে কতকগুলি কথা মনে আসে। বলরামকে সন্দেহ করা

---

* দ্রষ্টব্য॰ Asoke Mitra সম্পাদিত The Truth Unites (Essay in Tribute to Samar Sen) Subarnarekha. Calcutta. 1985 বইয়ের Ranajit Guha-র লেখা 'The Career of an Anti-God in Heaven and on Earth' নিবন্ধ এবং 'বারোমাস' পত্রিকায় এপ্রিল'৮৬ সংখ্যায় তার অনুবাদ। অনুবাদক : রত্নাংশু মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণতী সেন।

হয়েছিল চোর ব'লে এবং পরবর্তীকালে 'ইহাদিগের ধর্মে চৌর্য্য, লাম্পট্য মিথ্যা-কথন এবং অত্যন্ত বিষয়াসক্তি সাত্ত্বিক পাপ' ব'লে বিধান দেওয়া হয়েছে। এই যে শুদ্ধ জীবনাচরণের দিকে বিশেষভাবে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে তা তাৎপর্যপূর্ণ। এর থেকে বোঝা যায় অশিক্ষিত নিম্নবর্গের যে সর্বনিম্ন ধাপের মানুষজনদের নিয়ে (তাদের সংখ্যা ছিল বিশহাজার) বলরামকে সম্প্রদায় চালাতে হয়েছে তাঁরা মূলত ছিলেন ভবঘুরে, অস্পৃশ্য ও নানা অপকর্মের সঙ্গে আদৌ যুক্ত। কোশাম্বীর ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, বহুদিনের যথেচ্ছ আরণ্য জীবন এবং অবিচারে অনীহা অনেক নীচুজাতের দারিদ্র্যের মূল কারণ। ক্রমে এই দারিদ্র্যই তাঁদের চৌর্যবৃত্তি ও অন্যান্য অপরাধপ্রবণতায় টেনে আনে। মোটকথা বলরামের শিষ্যদের মধ্যে একটা বড় অংশ নিশ্চয়ই ছিল অসংযত, যদৃচ্ছ স্বভাব ও দুর্বার। একদিকে যেমন বলরাম তাঁদের সদাচারের বিধান দেন আরেকদিকে তেমনই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শেখান ঘৃণা। এবারে সেই দুর্বার মত্ত বাহিনী ঐ দুটোর মধ্যে স্বভাবত কোনটা নেবে? দ্বিতীয়টা নিয়ে তাঁরা হয়ে ওঠেন দুর্নিবার ও দুর্দম স্বভাবের। এখানে একটা হাল্কা অনুমান করতে মন চায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিস্তৃত জমিদারী ছিল কুষ্টিয়া জেলায়। সেখানকার বাগোয়ান অঞ্চলে ছিলেন বহু হাড়িরামী। ঠাকুর বাড়ির লেঠেল বা দারোয়ান বাহিনীতে কি সেই সব বলরামের চেলারাই ছিলেন অথবা ঠাকুরবাড়ির লেঠেলদের প্রতিদ্বন্দ্বী লেঠেল ছিলেন তাঁরা? কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্র কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ঘাঁটলে ঠাকুর বাড়ির লেঠেল বাহিনীর সঙ্গে প্রজাদের লড়াইয়ের অনেক বিবরণ মেলে। 'এক্ষণ' পত্রিকার ১৯৭১ সালের শারদ সংখ্যায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস কাঙাল হরিনাথের ডাইরি অবলম্বনে এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, একবার খোদ কুষ্টিয়ায় দেবেন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেঠেলদের অত্যাচার থেকে গরীব প্রজাদের ঠেকাতে স্বয়ং লালন ফকির তাঁর দলবল নিয়ে লাঠি সোটা হাতে বেরিয়ে আসেন আশ্রম ছেড়ে। ওসব লড়াই আসলে ছিল যতটা শ্রেণীগত তার চেয়ে বর্ণগত। নিম্নবর্ণ সম্প্রদায় হয়ত এভাবেই ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে হাতে নিত প্রতিরোধের শস্ত্র। যাইহোক প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ যে একটা গানে লিখেছেন :

বৃষ্টিনেশা ভরা সন্ধ্যাবেলা
কোন্ বলরামের আমি চেলা

সেকি পৌরাণিক বলরামের অথবা শূদ্রনেতা বলরামের উল্লেখ? 'বলরামের

চেলা, শব্দটি উনিশ শতকে প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিল গ্রাম্য লোকসমাজে। সেই ধারাতেই সাহেবধনী গীতিকার কুবির গোসাই বলরামীদের বৈষ্ণব বিদ্বেষের উল্লেখ ক'রে লিখেছিলেন,

: বলরামের চেলার মত
কৃষ্ণকথা লাগে তেতো।

রবীন্দ্রনাথ হয়ত কুষ্টিয়ার বারখাদা অঞ্চলের বলরামের চেলাদের প্রমত্ত ভুবার জীবনযাপনের প্রতি একটা বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত রেখে গেছেন তাঁর গানে।

এই প্রসঙ্গে আমার অন্যধরনের এক অভিজ্ঞতা এখানে লেখা উচিত। ১৯৭১ সালে যখন প্রথম নিশ্চিন্তপুর যাই তখন সংলগ্ন তেহট্ট গ্রামের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বলেছিলেন নিশ্চিন্তপুর গ্রামের সুনাম নেই। কোন এককালে তেহট্ট অঞ্চলের বেশিরভাগ ডাকাতির সঙ্গে ওখানকার মানুষজন ছিল জড়িত। শুনে মনে হলো এই সব কথা খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে হাড়িরামীদের 'এয়োতন তত্ত্ব' জানালে। ব্যাপারটা এইরকম।

হাড়িরাম সম্প্রদায়ে বেশিরভাগ মানুষই গৃহী। তাঁদের মধ্যে যেসব যৌনতার সংস্কার আছে তা বেশ বিচিত্র। গৃহী হাড়িরামী যে-ধর্ম পালন করেন তাকে বলে 'এয়োতন'। সেটা কি? গ্রামীণ জীবনে একটা সমস্যা হ'ল অতিপ্রজতা। জন্মশাসন ও বিন্দুধারণ তাঁদের পক্ষে কঠিন। সবাই তো যোগী ন্যাসী নন, তাই কুম্ভক জানেন না। এদিকে এয়োতন ধর্মে বলা হয়েছে দেহ-সঙ্গম করতে হবে কেবল সন্তান কামনায়। বৃথা সঙ্গম ও অকারণ বীর্যক্ষয় মহাপাপ। তাই তাঁদের অন্তরে ও বিশ্বাসে একটা সংস্কার কাজ করে। আমি জেনে অবাক হয়ে যাই যে, হাড়িরামের অনুগামীরা বিশ্বাস করে :

সন্ধ্যাবেলা সঙ্গম করলে সন্তান হয় চোর বা গুণ্ডা।
রাত বারোটার আগে সঙ্গম করলে সন্তান হয় ডাকাত বা দস্যু।
রাত বারোটা থেকে ভোরের মধ্যে সঙ্গম থেকে জন্ম নেয় সর্বলক্ষণযুক্ত দেবগুণান্বিত সন্তান।

এই বিচিত্র বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করলে উঠে আসে হাড়ি ডোম বা নিম্ন বর্গের উপজাতি সংস্কারের বহুযুগের স্মৃতিবাহিত লোকাচার। পল্লীগ্রামের অসহায় শিশ্নোদরপরায়ণ সমাজকে অনুশাসন দেওয়া হয়েছে কতটা কৌশলে, এই তিনটি সূত্রে তার চমৎকার ইঙ্গিত আছে। সেই সঙ্গে আছে চোর ডাকাত দস্যু গুণ্ডার অবক্ষেপন।

প্রজনন ও সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন আশ্চর্য অনুশাসন বা বিধান আমি আর কোন গৌণধর্মের ক্ষেত্রে শুনিনি। তাই ব্যাপারটি সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে চাই হাড়িরাম সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকনেতা বা 'সরকার' চারুপদ মণ্ডলের কাছে, খাওরাপাড়ায় তাঁর বাড়িতে, ১৯৭২ সালে। তিনি বলেন :

> হাড়িরামের ঐ নির্দেশ আসলে গরীব মুখ্যু গাঁয়ের মানুষদের সাবধান করা বৈ আর কি বলুন? গ্রামদেশে জানেন তো, সন্ধ্যেরাত্তেই নেমে আসে রাত্তির। মেয়ে পুরুষ তখন কি করে? শুয়ে পড়ে। জানেন তো গ্রামে একটা কথা খুব চলিত আছে যে 'কাজের মধ্যে দুই/খাই আর শুই'। এখানে শোওয়া মানেই দেহের মিলন। আপনাদের শহরে জীবনে আছে নানা রঙ্গরস সিনেমা সার্কাস খাওয়া-দাওয়া হোটেল রেস্টুরেন্ট। গ্রামে ওসব কই? সারাদিন মাঠে খামারে ভূতের মত খাটে, গরীব মানুষ সব, ঘরে বেশিক্ষণ লণ্ঠন জ্বালাবার কেরোসিন পর্যন্ত থাকে না। তাছাড়া নানা দলাদলি। কি দরকার? যে যার মত শুয়ে পড়ে। কিন্তু রাত তো লম্বা। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী। দেহধর্ম একটা আছে তো? তাই কেবলই সঙ্গম আর বীর্যক্ষয়। তার থেকে অনবরত সন্তান জন্ম। হাড়িরামের সময় তো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ওঠেনি। উনি তাই কৌশলে একটা আইন চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। বুদ্ধিমান বাচক মানুষ ছিলেন তো। কে আর চায় বলুন যে তার সন্তান হোক চোর বা ডাকাত। এইভাবে একটা সংযমের চেষ্টা আর কি। তবে সেকি আর সবাই মানে? আমার সরকার গোবিন্দদাস বলতেন এযোজনের পথ আটকে রেখেছে বোধিজন।

অসহায় হাড়িরামীদের জীবন সমস্যার নিপুণ বিশ্লেষণ শুনে চারুপদ মণ্ডলের বাচকত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলাম। সেদিন ক্রমে বুঝে নিয়েছিলাম বোধিজনের ব্যাপারও। কিন্তু সে কথা এখনও বলার সময় আসেনি আমার পাঠকদের। যথা সময়ে সে কথা যখন লিখবো তখন যাতে পাঠকরা তা যথাযথ বুঝতে পারেন তারজন্য আমি বরং ভূমিকা তৈরি করি এখন।

প্রথমেই আরেকবার আউড়ে নিই কোশাম্বীর সেই বাক্য : The lowest castes often preserve tribal rites, usages and myths। লক্ষ করলে দেখা যাবে নীচু জাতি শুধু যে তাদের জীবনাচরণে বাঁচিয়ে রাখে তাদের কৌম আচার ব্যবহার ও লোকপুরাণ তাই নয়, তাদের পূর্বপুরুষদের নামও

অনেক সময় মিলে যায়। যেমন এটা কি খুবই আশ্চর্য নয় যে প্রায় সব নীচু জাতি তাঁদের নেতা ব'লে যাঁকে মানেন তাঁর জীবন কাহিনীতে খানিকটা ধর্মবৈতিক দুঃসাহস ও উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধাচরণের ঘটনা থাকেই। যেমন হাড়িরামের ছিল। রণজিৎ গুহ তাঁর একটি দিকনির্দেশী রচনায় জানান :

> কর্তৃত্বকারী সংস্কৃতির কাছে যারা কোনো স্বীকৃতি পায় না, সেই-সব বাস্তব চরিত্র এবং পৌরাণিক মূর্তিকে এমন সাহস ঐশ্বরিক মর্যাদায় ভূষিত করে। বাস্তবের চোর ডাকাত যেমন মরণোত্তর দেবত্ব লাভ করে, তেমনি দেশের অক্ষম দরিদ্র মানুষের উপর প্রভাব ফেলে পৌরাণিক বীরের অসাধারণ কীর্তি, তাদের অতিমানবিক ক্ষমতার রূপক। সেই ক্ষমতা একাধারে দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক।*

এখানে পুরাণ মানে লোকপুরাণ। আধ্যাত্মিক ক্ষমতার একটি নমুনা, যেমন আগে বলা হয়েছে, আউলচাঁদ কমণ্ডলুতে গঙ্গা পুরে নিলেন। দৈহিক ক্ষমতার নমুনা, যেমন হাড়িরাম তিন পদক্ষেপে পৌঁছে যান নিশ্চিন্তপুর থেকে মেহেরপুর। এভাবেই নিম্নবর্গের মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চার করেন নিজেদের অচরিতার্থ স্বপ্ন। আধ্যাত্মিক দুঃসাহস তাঁদের প্রথা ও প্রচলের বিরুদ্ধতা করার শক্তি দেয়। তাঁরা উচ্চবর্ণের মূর্তি পূজা মানেন না। হাড়িরাম সম্প্রদায়ের একজন পদকার নারায়ণ দাস একটা গানে প্রশ্ন তুলেছেন : 'ঘট পুজে কিসের কারণ ?' অর্থাৎ সবরকম আনুষ্ঠানিক রিচ্যুয়ালেই এঁদের অনাস্থা। এমনকি হাড়িরামকে তাঁরা প্রতিদিন যে-নৈবেদ্য দেন তাও পাক-করা সন্দেশ বা অন্য মিষ্টান্ন নয়। তাঁরা হাড়িরামকে নিবেদন করেন চাল জল আর গুড়।

আশ্চর্য হয়ে আর একটি জিনিস আমি আবিষ্কার করি হাড়িরাম সম্প্রদায় তাঁদের প্রাত্যাহিক জীবনে যে রক্ষা-মন্ত্র পড়েন তা যেমন নিপাট বাংলায় লেখা তেমনই বেলতলার সেবাপূজা বা হাড়িরাম পূজার অন্য অনুষ্ঠানে উচ্চারিত মন্ত্রগুলি লেখা হয়েছে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায়। এমন আর কোন গৌণধর্মে আমি দেখিনি। সেখানে একটু সংস্কৃত মিশাল বা অন্তত বৈষ্ণব বীজমন্ত্র ক্লিং ক্লিং, যাকে বলে কাম-বীজ ও কামগায়ত্রী, তা আছেই। হাড়িরাম সম্প্রদায় তাঁদের উপাস্যকে একই সঙ্গে স্রষ্টা ও সংহারক মনে করেন, ('হেউং মউত্তের কর্তা'), আবার মনে করেন রক্ষাকর্তা। তাই কোথাও বেরোবার আগে তাঁরা যে-আপ্ত সাবধান বাক্য উচ্চারণ

---

* দ্রষ্টব্য• একটি অপুরের কাহিনী। বারোমাস। এপ্রিল ১৯৮৩

করেন তাতে বলা হয় :

বলরামচন্দ্র হাড়ি গোঁসাই
হাড় হাড়্ডি মণি মগজ
তারকব্রহ্ম রামনারায়ণ
জগৎপতি জগৎপিতা
হেউং মউতের কর্তা
তুমি আমায় রক্ষা করো।

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে হাড়িরামের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের সম্পর্ক প্রধানত পিতা-পুত্রের। সেই জন্যই হাড় হাড়্ডি মণি মগজ ব'লে উপাস্যকে সম্বোধন করা হয়েছে। হাড়িরামীরা বিশ্বাস করে তাঁদের শরীরে পিতার দান হলো চারটি : হাড়, হাড়্ডি (মজ্জা), মণি (শুক্র), মগজ। কাজেই চারচিজ দিয়ে দেহ গঠন হয়েছে। মানুষের দেহকে ঘরের রূপকে বেঁধে তাই তাঁদের সেরা পদকার দীনু লেখেন :

কারিগরের কী খোদাকরি
গড়াচ্ছেন ঘর বরাবরি
ঘরের গড়নদারের বলিহারি
কিবা কারিকুরি চারিধার॥
ঘরের ফেলে জোকাকাঠি
চারচিজে চার খুঁটি
গড়লেন পরিপাটি
কি চমৎকার॥
ভেবে দীনু বলে, আমি
না চিনলাম ঘরামি
ত্রিজগতের স্বামী
রাম গড়নদার॥

হাড়িরাম তাঁর উপাস্যের চোখে কখনও গড়নদার, কখনও কারিগর, কখনও কর্তা। আবার অন্য চোখে কখনও গোঁসাই, কখনও অর্বুশশী (অর্থাৎ অর্বুদসংখ্যক চাঁদের সমাহার), কখনও বাচক, কখনও রামদীন।

হাড়িরামীদের যেসব মন্ত্র আমি সংগ্রহ করেছি তার পেছনেও একটা আশ্চর্য যোগাযোগ আছে। নিশ্চিন্তপুর আর মেহেরপুর থেকে মৎসামান্ত মন্ত্রই পাওয়া

গেছে। অথচ ১৩৭৫ সালে নদীয়াজেলার, বৃত্তিহুদা গ্রামের সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মূল সেবাইৎ শরৎ পাল তাঁর সঞ্চয় থেকে লোকধর্মের অনেক মন্ত্র আমাকে দেন। বালি কাগজের সেই খাতায় আলতা-দিয়ে-লেখা অনেক রকম মন্ত্রের মধ্যে 'বলা হাড়ির মত' শিরোনামে আটটি মন্ত্রও পেয়ে যাই। পরে মেলাতে গিয়ে দেখলাম তিনটি মন্ত্র এখনকার হাড়িরামীদের আজান-মন্ত্রের সঙ্গে মেলে। তার মানে বাকি পাঁচটি মন্ত্র এখন প্রচলিত নেই। উনিশ শতকের কোনসময় বলা-হাড়ির মত সংক্রান্ত মন্ত্র সাহেবধনীরা কৌতূহলবশত সংগ্রহ করে রেখেছিলেন সম্ভবত। লোকধর্মে এমন লেনদেন হয়েই থাকে।

এবারে পরপর মন্ত্রগুলি এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া যেতে পারে। তার আগে অন্যান্য কিছু লোকধর্মের মন্ত্র নমুনাহিসাবে দেওয়া উচিত তুলনার জন্য। বিশেষ ক'রে ভাষা ও সংস্কৃতপ্রবণতা এবং বীজাক্ষরের দিক থেকে। একাদিক্রমে সাহেবধনী, কর্তাভজা, বীরভদ্র মত ও গোরক্ষনাথের ঘরের সাধনমন্ত্র দেখা যাক একটি ক'রে।

সাহেবধনী মত

ক্লিং ক্লিঁং চিলং গুরু সহায়।
ক্লিঁং ক্লিং ক্লিং খিলং খিং ক্লিং
গুরু সত্য সহায়॥
রাধা সমুদ্র ক্লিং ক্লিঁং হ্লিঁং

সতী মার ঘর

বং চং হং সত্য
ভগ সত্য নিরঞ্জন।
সতীমা সত্য। গুরু সত্য। বাক সত্য। ঠাকুর সত্য।

বীরভদ্র মত

বং চং চন্দ্র সূর্য মিলিতং
গুরুনাল পাই
ঊর্ধ্বনালে চালাই।
বীর নিত্যানন্দ অবধৌত।

গোরক্ষনাথের ঘর

ব্রহ্মশিলায় সেঁউতি করিলাম হাতে
কে তুলিল উলুক নাচে।

উবুক নাচে হুবুক পা
সরবিল ভুঁই বজ্রে যা ।
ওঁ হ্রাঁ হ্রিং ক্লিং বিষহারিণী ।

এ সব মন্ত্রের ভাষা যেমন সন্ধা তেমনই কূট। এর বেশির ভাগ কায়াসাধনের মন্ত্র। লৌকিক গুরু এ-মন্ত্র প'ড়ে আচরণের বিষয়টি বুঝিয়ে দেন শিষ্যকে। বীজ মন্ত্রগুলির বিশেষ সাংকেতিক অর্থ আছে। এর পাশে সহজ সরল স্পষ্ট ও সুবোধ্য বলরামের মন্ত্র দেখা যাক।

১ হাড়িরাম হাড়িরাম
স্বয়ং রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ।
সীতাপতি হনুমানকে যেমন ক'রে করিলেন উৎপত্তি
তেমনই নিজগুণে কৃপাদানে
এ অধমের প্রতি করো গতি ।
তুমি আমার মাতা পিতা তুমি আমার পতি
শ্রী চরণে করি এই মিনতি ।
জয় হাড়িরামের জয় । ৩ বার ।

২ বীজে কলে একস্থানে উৎপত্তি আমার
হাড়িরামচন্দ্র সেই বল্ শক্তি ।
ইহার তত্ত্ব জানেন যে ব্যক্তি
তাহার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণতি ।
যিনি যাহা বলেন বলরামের বলের বলে ।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে হ্রীং ক্লিং-জাতীয় বীজশব্দের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। মন্ত্রের ভেতরে কোন অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনা নেই যা গুরুর কাছ থেকে ব্যাখ্যা সহযোগে বুঝে নিতে হবে। আসলে বলাহাড়ির মতে তো কোন গুরুই নেই। কায়াসাধনের গূঢ়তা নেই বলে শব্দের কোন কূটাভাস প্রয়োজন হয়নি। ভক্ত তাঁর নিজস্ব আর্তি থেকে এখানে সরাসরি হাড়িরামের কাছে যাতে আত্মনিবেদন করতে পারেন সেই ভাষাটুকু শুধু জুগিয়ে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রে। প্রথম মন্ত্রে হাড়িরামকে মাতাপিতা ও পতি বলা হয়েছে যা এই বিশেষ ধর্মমতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'বল্' এবং 'বলের বল' শব্দদুটি সামান্য ব্যাখ্যা দাবী করে। হাড়িরামীদের নিজস্ব ভাষায় বল্ মানে রক্ত। একটা গানে বলা হয়েছে :

হাড়িরাম বানবনেছে বানিয়েছে এক আজব কল।
এই কলের সৃষ্টি বলে করা বল্ বিনে চলবেনা কল।

শরীরে রক্তের যৌন উপাদান-ভূমিকার কথা এখানে বলা হয়েছে। হাড়িরামীদের বিশ্বাস যে শরীরের রক্ত আসে জননীর কাছ থেকে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণে তাঁরা বলেন রক্ত তো আসলে শুক্র। সেটা আবার পিতৃবস্তু। সেইজন্য হাড়িরামকে বলা হয়েছে মাতা পিতা।

এবারে দেখা যাক অন্য চালের দুটি মন্ত্র :

১ হাড়িরামচন্দ্রের শ্রীচরণে ফুলজল দিলাম
ধরাতলে ধন্য হলাম।
রূপযৌবন নয়ন মন অর্পণ করিলাম।
আমি দুর্বল দুর্বলেরই বল তুমি
সকল জানেন অন্তর্যামী।
শুধু তোমারই গুণ গাই
গুন অন্য কাহারে না জানি॥

২ হক্ হাড়িরামচন্দ্র চরণ ধোয়াইব
চরণামৃত পান করিব।
যৎকিঞ্চিৎ গায়ে মাখিব।
অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সেই পাত্রে রাখিব তুলে।
কলা খাইব।
গুরু চরণামৃত ফেলে দেওয়া বড় দোষ।
সাবধান। ৩ বার।

প্রথম মন্ত্র যদি বা নিবেদনের আন্তরিক ভাষা, দ্বিতীয় মন্ত্র যেন নাটকের সলিলকির মত একান্তভাষণ। ভক্ত যেন হাড়িরামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব'লে যাচ্ছেন তাঁর মনের সঙ্কল্প। এমন আশ্চর্য মন্ত্র, গানের মত স্বগতোক্তিবহুল, আমরা কখনও শুনিনি। মনে হয় না কি যেন মীরার ভজন শুনছি অন্তত প্রথম মন্ত্রে? 'গুন অন্য কাহারে না জানি কেবল তোমারই গুণ গাই' উচ্চারণের সঙ্গে 'মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা নাই কোঈ' উচ্চারণের কোন ভাবগত তফাৎ আছে কি? তফাৎ শুধু বিন্যাসে ও কবিত্বে। মূর্খ অশিক্ষিত বলরামের চেলারা কবিত্বময় ভাষণ কেমন ক'রে পাবেন? তাঁরা কেবল সাধু ভাষার বিন্যাসে লৌকিক বুলিকে একটু পরিমার্জন করতে চান বড়জোর। সেইটুকুই যা বেমানান।

এই খাতে উল্লেখ করা যাক একটি তত্ত্বগত মন্ত্রের, যা অন্যগুলির মত শোনামাত্র বোঝা কঠিন। এ মন্ত্র আমি মেহেরপুর, নিশ্চিন্তপুর, এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় শুনেছি। বলতে গেলে এই মন্ত্র হাড়িরাম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে দ্যোতক। মন্ত্র বলা হয়:

হাড় হাড়ি মণি মগজ
গোস্ত পোস্ত আড়গোড় তালি।
এই আঠারো মোকাম ছেপে আছেন
আমার বলরামচন্দ্র হাড়ি ॥

সকল অস্ত এক ভাবিয়া নিশ্বাস করিবে
হাড়িরামচন্দ্রের নিগূঢ় তত্ত্ব।
কিছু জানিতে পারিলে।
নামব্রহ্ম সত্য। ৩ বার

এখানে আড়গোড়তালি মানে আড়েদিঘে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে সকল গোস্ত পোস্ত অর্থাৎ মানব-শরীর ব্যেপে আছেন হাড়িরাম। তাঁর অবস্থান আঠারো হাজা'র মোকাম জুড়ে। এই আঠারো-র তত্ত্বকে তাঁরা কখনও বলেন অষ্টাদশ পুরাণ। আঠারো বলতে বুঝতে হবে:

'মায়ের চার বাপের চার জগৎস্বামীর দশ'

এর অর্থ: মানব শরীরে পিতৃবস্তু আছে চার রকম—অস্থি, মজ্জা, বীর্য ও স্নায়ু/বিন্দু। মাতৃবস্তু আছে চার রকম—ত্বক, মাংস, রক্ত ও কেশ। আর জগৎস্বামীর দেওয়া দশটি উপাদান হলো—দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখবিবর, নাভি, পায়ু ও উপস্থ। সব মিলিয়ে আঠারো। সেই আঠারো মোকাম ছেপে বলরামচন্দ্রের অবস্থান বলতে তাহ'লে বোঝানো হচ্ছে যে তাঁর অবস্থিতি মানব শরীরে। সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি করেছেন হাড়িরাম কলমিস্তিরি। শুধু যে তৈরী করেছেন তাই নয়, তাঁর কৌশলেই (কুশলতা) সেই কল চালু আছে। কখন যে চাবি দিয়ে তিনি কল বন্ধ করবেন তা কেউ জানে না। এই সব তত্ত্ব মনে রেখে বরং শোনা যাক সদানন্দের লেখা গান:

এ কলের দুখান চাক বাঁকা
উপরে খেলছে দুই পাখা
দুজন বসে চৌকি আছে
দুজন তাই দিচ্ছে পাহারা ॥

আগে গানের এইটুকু বুঝে নেওয়া যাক তবে পরের অংশ ভাল করে বোঝা যাবে। এখানে দু-খানা চাক বাঁকা বলতে বুঝতে হবে দুই কাঁধি। দুই পাখা হলো হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস। কলের চৌকি দিচ্ছে দুই চোখ আর তাঁকে পাহারা দিচ্ছে নাক আর কান। গানে এর পরে আছে :

যেমন জলের ভিতর আগুন
আগুনের ভিতরে সে জল
কারিগরের করা এ কল
কখনও তা হয়নাকো অচল ॥

আগুন আর জল শরীরের উষ্ণতা ও শীতলতার পর্যায়ক্রমের প্রতীক। তার স্বাভাবিক যুগ্মসঞ্চারে কল অচল হয় না। এরপরে বলা হচ্ছে :

এই কলের পাশে চারখানা থাম আছে গো তার
দেখ দেখতে কি বাহার
থামের ভিতর তিন তার আছে
কারিগর খবর নিচ্ছে তার ॥

চারখানা থাম মানে দুই হাত আর দুই পা। তিন তার মানে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ি।
এবারে বলা হচ্ছে :

হাড়িরাম কলমিস্ত্রী হেকমতে চালাচ্ছে কল ॥
কারিগর হেকমত করে
আমি বলব কি তারে
কতশত প্যাচ বসালে এই কলের ভিতরে।
কোন্ প্যাচে ওঠায় বসায়
কোন্ প্যাচে চলায় বলায়
কোন্ প্যাচ কারিগরের হাতে
কখন টিপ দিয়ে বন্ধ করবে কল ॥

হাড়িরামের সাধক তাঁর কারিগরকে সম্পূর্ণ বুঝে নিতে চান। সেই বোঝা সম্পূর্ণ হলেই শরণাগতি নেওয়া সম্পন্ন হবে। তাঁকে সর্বাংশে না জেনে অন্ধ উপাসনা চলে না। তাঁকে বুঝলে এটাও বোঝা যায় যে,

তব জলে পাক অন্ন
তেল নাই জ্বলিল বর্ণ

এ সংসারে আর কে পারে
হাড়িরাম বিনা ?

কিন্তু শুধু হাড়িরাম নিলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। পেতে গেলে যেমন ঘেঁষাঘেঁষি ত্যাগ করতে হবে, ছাড়তে হবে জাতাজাতির ভেদবুদ্ধি তেমনই,

অধর মানুষ ধরবা যদি
আগে ছাড়ো বৈদিক বিধি
তবে মিলবে রত্ননিধি।

এবারে স্পষ্ট হলো উচ্চবর্ণের সঙ্গে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের পার্থক্য। সবচেয়ে আগে ত্যাগ করতে হবে বেদাচার এই অনুশাসন অবশ্য বেশির ভাগ বাংলার লোকধর্মে আছে। সেদিক থেকে এ-সম্প্রদায় মিলে যায় বৃহত্তর লোকজীবনের আততিতে। তবু একটা তফাৎ থেকেই যায় তাঁদের সঙ্গে। হাড়িরামীরা গ'ড়ে তোলেন এক নতুন সৃষ্টিতত্ত্ব আর জাতিতত্ত্ব। মৌলিক ভাবনায় সেও কম রোমাঞ্চকর বা অভিনব নয়।

সেই জাতিতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে গেলে একটু ভূমিকা করা দরকার। তার গোড়াতেই দেখা যাক হাড়িরামীদের আরেক মন্ত্র :

হক্ হাড়ি রামচন্দ্র তোমাকে চালজল দিলাম।
সেবা করুন আপনি।
জাতিতত্ত্ব ভাবসত্ত্ব তোমা হতেই শুনি।
তোমায় ভাবি ধ্যানে জ্ঞানে
আমার আর কোন বাঞ্ছা নাই।
পলকে পলকে হাড়িরামচন্দ্র
যেন তোমার দেখা পাই॥

এই মন্ত্র থেকে জাতিতত্ত্ব ভাবসত্ত্ব শব্দদুটির ইঙ্গিত বোঝার চেষ্টা করা দরকার। সেই চেষ্টার গোড়ায় আসে সৃষ্টিতত্ত্ব।

একথা খুব নতুন নয় যে, অনেক ধর্মশাস্ত্রে, পুরাণে ও লোকবিশ্বাসে একটা সৃষ্টিতত্ত্বের কথা থাকে। যেমন আমাদের ধর্মমঙ্গল ও শূন্যপুরাণে রয়েছে সুন্দর এক সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীবৃত্ত। লোকজীবনের রহস্যনিবিড় বিশ্বাসের পরিবেশে সব সময় এই চিন্তা জাগে যে, সৃষ্টির আদিতে কি ছিল, কে বা কারা আমাদের পূর্বপুরুষ? অনেকসময় লোকবিশ্বাসজাত অলীক গল্পে লাগে উচ্চবর্ণের পরিমার্জন, ফলে অনেক পৌরাণিক প্রসিদ্ধ চরিত্র লৌকিক চরিত্রদের সরিয়ে জাঁকিয়ে

হলেন। তবু মূল পরিকল্পনায় একটি লোকায়ত ছাঁচ থেকেই যায়। ঋগ্বেদ সংহিতায় উপজাতীয় এমন এক বিশ্বাসের নির্যাস পাওয়া যায়। সৃষ্টির একেবারে গোড়ায় কি ছিল? তার ধাঁধাংশায় বলা হচ্ছে:

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ
কিমাবরীব : কুহ কস্য শর্মন্
অম্ভ : কিমাসীদ্গহনং গভীরম্।

এর মানে হলো সৃজনের ঊষাকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তারী আকাশও ছিল না। আবরণ দিতে পারে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল?

সুললিত সংস্কৃতে লেখা সৃষ্টিপ্রারম্ভিক এই যে শূন্যতার বর্ণনা তারসঙ্গে খুব সুন্দর ভাবে মিলে যায় শূন্যপুরাণের বর্ণনা। যেমন :

নহি রেক নহি রূপ নহি বর চিন।
রবি সসী নাহি ছিল নহি রাত্তি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার নাহি ছিল ন ছিল কৈলাস॥

এইভাবে চলে পংক্তির পর পংক্তি নানাবিধ শূন্যতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা।- ধর্মমঙ্গল কাব্যে আবার এই শূন্যতার আগে এক প্রলয়জাত ধ্বংসের কথাও ভাবা হয়েছে। তার বর্ণনা :

অতল বিতল সপ্ত রসাতল
সংনিধি সমুদ্র সাত।
অসুর কিন্নর আদি চরাচর
সকলি হইল পাত॥

এই প্রলয়অন্তিম শূন্যপ্রহরে প্রভু ধর্মঠাকুর রইলেন বেবাক একা :

সৃষ্টি করি লয় দেব দয়াময়
আপনি রহিল শূন্য।
চিন্তামণি তবে চিন্তিত বৈভবে
সৃষ্টি সৃজিবার জন্য॥

শূন্যপুরাণে দেখা যায় 'পরভু' বা পরমদেবতা প্রথমে সৃষ্টি করেন 'অনিল'দের।

তারপরে নিজেকে বুদ্বুদরূপে সৃষ্টি করেন। সেই বুদ্বুদের জন্মতিথির কথা বলেনি, কেননা তাঁর পিতামাতা ছিল না। তাঁর রোগ শোক বা কোন অবয়বও ছিল না, তাই নাম নিরঞ্জন। নিরঞ্জন শব্দের একটা অর্থ অঞ্জনবিহীন, নিরাকার। আরেক লৌকিক অর্থ ধন্যাত্মক ব্যঞ্জনাবাহী, অর্থাৎ নীরে বাস যার তিনি নিরঞ্জন ('নীরেত নির্মল কায়া নাম নিরঞ্জন')। ধর্মমঙ্গলে আবার নিরঞ্জন শব্দের একটি অর্থ করা হয়েছে নির্বিকার। এখানে উল্লেখ থাক যে, এই সব চিন্তাভাবনার মধ্যে বৌদ্ধ মাধ্যমিক চিন্তার কিছু ছাপ আছে। যাইহোক, ধর্ম নিরঞ্জন যোগে বসে ধ্যানজ্ঞানে চৌদ্দযুগ কাটিয়ে দিলেন, তারপর হঠাৎ তাঁর হাই থেকে জন্ম নিলো উলূক বা প্যাঁচা। উলূকবাহন হয়ে প্রভুর কাটলো আরো চৌদ্দ যুগ। তারপরে ক্লান্ত উলূক চাইলো খাদ্য। প্রভুর নিজের বলতে ছিল থুথু। তাতেই বাঁচালেন তাঁর বাহনকে। সেই থুথুর উদ্বৃত্ত দু ফোঁটা খণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হলো সাগর। সেই সাগরে দুজনে ভাসতে লাগলেন। এরপরে গল্পের ক্রম এগোয় নতুন সৃষ্টির পথ ধরে। পলায়মান উলূকের ক্লান্ত দেহ থেকে একটা পাখা ছিঁড়ে জলে ফেললেন প্রভু। তার থেকে হলো হাঁস। এবার তিনি হলেন হংসবাহন। চৌদ্দযুগ পরে ক্লান্ত হাঁস পালালো। তখন হলো কচ্ছপ। চৌদ্দ যুগ পরে কচ্ছপও অপারগ হলেন সৃষ্টির ভার সইতে। তখন প্রভু তাঁর সোনার পৈতে ছিঁড়ে ফেললেন জলে। পৈতে হলো বাসুকী নাগ। এবারে সৃষ্টি বহনের একটা পাকা ব্যবস্থা হ'ল।

এই গল্পের নানা পাঠান্তর পাওয়া যায়, তা আপাতত আমাদের প্রাসঙ্গিক নয়। শুধু বিশেষ ক'রে প্রাসঙ্গিক এই তুলনামূলক তথ্য যে হাড়িরাম যে-সৃষ্টি তত্ত্ব বিশ্বাস করেন তার গোড়ায় বলা হয়, একেবারে আদিতে যখন দিব্যযুগ, তখন হৈমবতীর জন্ম আর হাড়িরামের শ্লেষ্ম বা থুথু থেকে জন্ম নারদের। হৈমবতী থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলের চিন্তার সঙ্গে হাড়িরামের চিন্তার মিলও আছে, অমিলও আছে। যেন সেখান থেকে খানিকটা নেওয়া, বাকিটা নতুন করে ভাবা। হাড়িরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি ধর্মমতের রূপায়ণ ও প্রতিষ্ঠা। যে কোন ধর্মমতের তিনটি দিক থাকে। Theology, Philosophy ও Ritual। সেই Theology-র মধ্যে থাকে Cosmology বা সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে থাকে Theogony বা দেবতত্ত্ব। হাড়ি-রামের সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায় হৈমবতী হাড়িরামের সন্তান, তাঁরা সন্তান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। এইভাবে উচ্চ বর্গের দেবতাদের হাড়িরাম আত্মসাৎ করেছেন আবার

কিছুটা তাচ্ছিল্যও করেছেন। দেবতত্ত্বের মূল ভিত্তিটাই নিয়েছেন চূর্ণ ক'রে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, হাড়িরাম যাঁকে বলেন হৈমবতী, শূন্যপুরাণে তাঁরই নাম আছাশক্তি। ধর্মের শরীরের ঘর্ম থেকে আছাশক্তির উদ্ভব। সেই আদ্যাশক্তির কাম থেকে জন্মান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। সেখানে এই ত্রিদেবের স্থান খুব উঁচু নয়। হাড়িরামের ধর্মেও এই ত্রিদেবকে সর্বত্র ও সর্বদা হেনস্তা করা হয়েছে। 'ব্রহ্মা বিষ্ণু পরাজিত' তাঁরা কেবলই গানে বলেন, 'শুধু কিঞ্চিৎ জানে মহেশ্বর' ব'লে তাঁকে সামান্য উচ্চাসনে বসানো হয়েছে। তার কারণ অবশ্য ভিন্ন, যা আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৬১)। হাড়িরামের ধর্ম ভাল ক'রে বুঝলে দেখা যায়, তাঁর Theology-তে বৌদ্ধভাবনা ও ধর্মপূজার যেমন সন্নিপাত ঘটেছে তেমনই নাথ-পন্থ যোগীদের দেহকেন্দ্রিক যোগপন্থা অনেকটা স্থান নিয়েছে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বিরক্ত, বৈষ্ণব মতে বিশিষ্ট হাড়িরাম অন্যান্য লোকায়ত মত থেকে নির্যাস নিয়ে তাঁর ধর্মমত গঠন করেছিলেন। সেইজন্যে বলাহাড়ির ধর্মে শাস্ত্রীয় ভিত্তির চেয়েও বড় হয়েছে লোকায়ত ভিত্তি। সেইসঙ্গে তাঁর জাতিচেতনার কথাও যোগ করা দরকার। তিনি তো ধর্মপূজক সম্প্রদায় বা নাথ যোগীদের মত দেশব্যাপী বিপুল অনুগামী সম্প্রদায় প্রথমে পাননি। গোড়ায় বলরাম হাড়ি এই নামে ছিল তাঁর নিঃসঙ্গ পরিচয়। ব্রাহ্মণশাসিত উনিশ শতকীয় গ্রাম বাংলায় তিনি ছিলেন একজন একক প্রতিবাদকারী মানুষ। জাতে ছিলেন অন্ত্যজবর্গের অস্পৃশ্য, হাড়ি। সেইজন্য তাঁর কৌমচেতনা ও জাতিগত পুরাণ, যা বহুযুগ সঞ্চিত হ'য়ে রক্তগত সামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল, তাকে অস্বীকার করতে পারেননি। দেখা যাবে তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বের সামগ্রিক কাঠামোয় এসে গেছে জাতিবর্ণের অনপনেয় সংস্কার। এবারে সেদিকে তাকানো যাক।

এর আগে বলা হয়েছে হাড়িরাম>হৈমবতী>ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ক্রমের কথা। এবারে প্রথমে আসবে সেই ব্রহ্মার কথা। হাড়িরামের মতে ব্রহ্মার দুই সন্তান—যামকাঞ্চনী আর ভাগবতী। যামকাঞ্চনীর তিন সন্তান—কালু, মুরারি, বাসুদেব। ভাগবতীর চার সন্তান—অঘাসুর, বকাসুর, কংসাসুর ও লোহাসুর। এরপরের ক্রমে আসবে কালুর চার সন্তান—সাগর, নাগর নীলাম্বর ও মন্মথ। মুরারির চারসন্তান—লোকনাথ, জীবন, আজির সেখর ও ভুবি ঘোষ। এই লতিকা এতটা ছড়িয়ে পড়ছে পাঠক হয়ত তাল রাখতে পারবেন না,

তাই তালিকাবদ্ধ করা যাক সবটা।
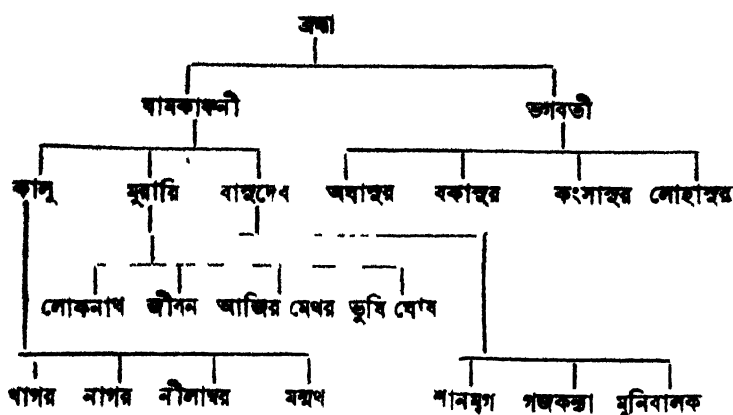
এখানে এসে আমরা একটু বিশেষ দৃষ্টি দেব কয়েকটি নামের দিকে। যেমন কালু ও জীবন। অন্যদিকে আজির মেথর এবং চারজন অসুর। প্রথমেই বলতে হয় আজির মেথরের কথা। মেথরের মত ঘৃণ্য ও নিম্নতম পর্যায়ের শূদ্রকে হাড়িরাম যে তাঁর বংশ তালিকার অন্তর্গত করেছেন তার কারণ মেথর হাড়িদের ঘনিষ্ঠ স্বজাত। এইচ. এইচ. রিসলি তাঁর বইতে হাড়ি, মেথর ও হড়সন্তান এই তিন শ্রেণীকে এক পর্যায়ে ফেলে লিখেছেন :

> Hari, Mihter, Har-Santan, a menial and scavenger caste of Bengal proper, which Dr. wise identifies with the Bhuimali and regards as 'the remnant of a Hinduised aboriginal tribe which was driven into Bengal by the Aryans or the persecuting Muhammedans.'···The internal structure of the Hari caste throws no light upon its origin, as at the present day there are no sections, and marriage is regulated solely by counting prohibited degrees.
>
> The sub-casts are the following—Bara´-bha´giya´ or Keora´ Pa´ik, Madhya-bha´giya´ or Madhyakul, Khore or Khoriya´, Siuli, Mihtar, Bangali, Maghaya´,

Karaiya', Purandar. Of these the Mihtar sub-caste alone are employed in receiving night-soil; the Bara-bha'giya' serve as chowkidars musicians and Palki-bearers; the Khore keep pigs, the Seuli tap date-palms for their juice; and the rest cultivate.*

এই বিবরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে হাড়ি জাতির মধ্যে যে সব ছোটখাট উপশ্রেণী আছে তার মধ্যে মেথর একমাত্র ময়লা পরিষ্কার করে, শিউলিরা খেজুর রস সংগ্রহ করে, খোররা শুয়োর চরায়, বড়-ভাগিয়ারা গানবাজনা, চৌকিদারী ও পাল্কী-বেহারার কাজ করে। বাকিরা জমি চষে। হাড়িরাম এই শ্রেণীকরণে বড়-ভাগিয়া পর্যায়ে পড়েন।

হাড়িরামের জাতিতত্ত্বে আজির মেথরের অন্তর্ভুক্তি যুক্তিসংগত কিন্তু চারজন অসুরকে যে হাড়িরাম তাঁর বংশভুক্ত করেছেন তার মূলে অন্য রহস্য। এখানে বুঝতে হবে, অসুর দেবতার প্রতিস্পর্ধী সেই কারণে হাড়িরামের মূল শ্রেণীগত লড়াইতে তারা তাঁর আত্মীয়। ভারতের নানা উপজাতি ও আদিবাসী এই যুক্তিতেই দেবতা ও চন্দ্র সূর্যের বদলে দস্যু ডাকাত ও রাহুকে মান্য করে।

নিম্নজাতির মানুষের দস্যুপূজা বা দেবতাবিরোধী পৌরাণিক চরিত্রকে বন্দনা করার একটি ধারাবাহিক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এ প্রসঙ্গে কোশাম্বী ও রিসলি ছাড়াও জি. ডব্লু. ব্রিগ্‌স্ তাঁর The Doms and their near relations (1953) বইয়ে অনেক তথ্য দিয়েছেন। আমরা সে সব বিস্তারে না গিয়ে বরং সে সব বইয়ের নির্যাস নিয়ে এবং তাতে নিজের মন্তব্য যোগ ক'রে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে শ্রীরণজিৎ গুহ যা লিখেছেন তা উদ্ধার করি :

> কোশাম্বী লিখেছেন পশ্চিমাঞ্চলের সোলহাই দেবীর কথা, এই দেবী 'নাকি গিয়েছিলেন কতিপয় তস্করের সঙ্গে'। কোশাম্বির মতে, তাঁর এই যাত্রা সেই তথ্যেরই নিশ্চিত ইঙ্গিত যে, 'দেবী তেমনি এক উপজাতির রক্ষাকর্ত্রী, যারা কখনো বশ্যতা স্বীকার করেনি'। একই ভাবে দোসাদরা ডাকাতদেবতা গোড়াইয়া আর সালেসকে পূজা করে; সেই যে চোর গণ্ডক, যার ফাঁসি হয়েছিল আর তার বন্ধু সামাইয়া, দুজনকেই মাথাইয়া ডোমরা দেবতা বলে মানে; ডাকাত

* The Tribes and Castes of Bengal. Vol I. H. H. Risley. Calcutta 1891. pp 314-15

সর্দার জান নিয়েকে সব ডোমই ভাবে রক্ষাকর্তা ভগবান এবং নিজেদের পূর্বপুরুষী। এমন করে বার বার জাতিগুলির পূর্ব ইতিহাস প্রকাশ হয়।

একজন দস্যুসেবতার আরাধনা অন্যান্য অনুরূপ দেবতার মতো কোনো এক বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর নাম বাল্মীকি। ক্রিপস্ বলেছেন, বাল্মীকি 'মধ্য ভারতের দেশজ আদিবাসীদের একজন'। এ মত সন্দেহাতীত নয়। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, দক্ষিণ ভারতের নিম্নজাতির মানুষও তাকে ঈশ্বর বলে মানে। হিংসাত্মক জীবনে লিপ্ত বাল্মীকি প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। এই কাহিনী সব শ্রেণীর হিন্দুরাই মেনে নেয়। কিন্তু পশ্চিমরা তাঁর উপাখ্যানকে নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে বাল্মীকিকে একান্তই নিজের করে নিয়েছে। একটি আখ্যানে বাল্মীকি কালু আর জীবনের জনক। সেই কালু আর জীবন থেকে আবার ডোম আর ভাঙ্গিরা তাদের উৎপত্তি নির্দেশ করে।

এইখানে এসে আমরা ডোমদের সঙ্গে হাড়িদের লোকবিশ্বাসের মিল খুঁজে পেয়ে চমকে যাই। কেননা হাড়িরামের সৃষ্টিতত্ত্বের কাঠামোয়, কালু আর জীবনের নাম আছে। তবে তাদের জনক বাল্মীকি নন। কালুর জনক যামকাঞ্চনী, জীবনের জনক বুমারি। তার মানে জীবন হলো সম্পর্কে কালুর ভাইপো।

এখানে বলা উচিত যে ডোম একটি সার্বিক (Generic) জাতিগত নাম। এ-সম্প্রদায়ে হাড়ি মেথর মুদ্দফরাস সকলে অন্তর্ভুক্ত, যাদের এক কথায় Scavenger-জাতীয় বলা হয়ে থাকে। এক সময় হয়ত তাই ছিল। পরে এদের মধ্যে বৃত্তিগত বিভিন্নতা এসে যায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, মহাভারত-যুগে 'পুক্কশ' 'পুলিন্দ' 'আয়োগব' ইত্যাদি প্রাক্-অস্ট্রাল জাতিরা Scavenger-এর কাজ করতো। ডোম হাড়িদের মধ্যেও প্রাক্-অস্ট্রাল জাতিবৈশিষ্ট্য আছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' আদি পর্বে জানিয়েছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বিবৃত অসৎশূদ্রের নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য স্তরে 'হড্ডি' (হাড়ি) জাতি পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে উল্লেখ আছে ডোম জোলা ব্যাধ কাপালীদের। কাজেই হাড়িদের আদি উৎসে ডোমদের আদিমানব কালু ও জীবনের কথা আসতেই পারে। এই সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে ধর্মপুরাণে কালু ডোমের উল্লেখ যেমন আছে তেমনই উপজাতি পরিচয়ে 'কালিন্দী ডোম' ব'লে একটি

গোষ্ঠী আছে যারা দাবী করে নিজেদের কালু ডোম ও লক্ষ্মী ডোমনীর বংশধর ব'লে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি।*

> Kalindi Doms regard themselves as the descendants of Kalu Dom and Laxmi Domni. Kalu Dom is a mythical hero ot these people who is populary known as Kalu Bir and is worshipped by this community people for their welfare.

এই তথ্যের পরে জানানো হয়েছে বহুদিন আগে কালিন্দী ডোমদের বিহার থেকে বাংলায় আনা হয়েছিল নীলচাষের কাজে। তারাই কি তবে কালু ও জীবনের কাহিনী ব'য়ে এনে উপহার দিয়েছিল হাড়িদের? এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আরো দুটি তথ্য পেশ করা চলে। হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকার আদিবাসী 'গদ্দী'-রা মেনে চলে 'কেহলু বীর' নামে একজনকে। তেমনই অরুণাচল প্রদেশের আপাতানি আদিবাসীরা মানে কিলো ও কির নামে দেবদেবতাকে। বোঝা যাচ্ছে হাড়িরামের জাতিতত্ত্ব নিছক একজনের নিঃসঙ্গ কল্পনা নয়।

হাড়িরামের জাতিতত্ত্বের প্রসঙ্গ গুছিয়ে নিয়ে আবার ফিরে আসা যাক তাঁর কল্পিত সৃষ্টিতত্ত্বের পরের লতিকায়। এবারে শোনা যাক বিন্দুর বংশবৃত্তান্ত। বিন্দুর তিন সন্তান—বো-কালি, মুন্দরী কালী আর মুরুক কালি। তারমধ্যে বো-কালী নিঃসন্তান, কাজেই তার আর বংশবিস্তার নেই। কিন্তু মুন্দরী কালির সন্তান দুজন—হাওয়া আর আদম। অন্যদিকে মুরুক কালির সন্তান তিনজন—পরাশর মুনি, নরস মুনি আর কবভ মুনি। আপাতত মুরুক কালি আর তাঁর মুনি সন্তানদের প্রসঙ্গ থাক। আমরা দেখি মুন্দরী কালির বিস্তার।

হাওয়া আর আদম মানে বাইবেলকথিত ইভ ও আদম। মারফতী মতেও আদি নরনারী আদম ও হাওয়া। তবে সেখানে তাদের সন্তানের নাম শিশ্। সেই শিশের সঙ্গে মিলিত হন হুর। তার থেকেই মানব প্রজাতির সূচনা। দেখা যাচ্ছে হাড়িরাম ইসলামি সূত্র থেকে আদম হাওয়াকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাদের সন্তানের নাম দিয়েছেন অন্যরকম। এই ছকে আদম আর হাওয়ার দুই সন্তান—হাবেল আর কাবেল। এবারে জন্মালো আর মানুষ নয়, বরং জাতি।

---

* দ্র° The Koras and some little known Communities of West Bengal: Amal Kumar Das. Tribal Welfare Department. Govt of West Bengal. 1964.

হাবেল আর কাবেল পয়দা করলেন আর এক একটা জাতি বা বর্ণ। যেমন হাবেল থেকে জন্মালো চারজাতি—সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান। কাবেল থেকে জন্মালো তিনজাতি—নিকিরি, জোলা আর রাজপুত।

আশ্চর্য যে, হাড়িরাম মুসলমানদের জাতিকরণের উদ্দেশে তাদের দুটি স্তরের (আশরফ ও আতরফ) স্থান নির্দেশ করেছেন দুজনের সূত্রে। যেমন, সেখ সৈয়দ মোগল পাঠান এই চার উচ্চবর্গের (আশরাফ) মুসলমান পড়েছে হাবেলের ভাগে। নিকিরি আর জোলা অর্থাৎ গরীব নিম্নবর্গের (আতরফ) জেলে ও তাঁতির স্থান হয়েছে কাবেলের দিকে।* কিন্তু এই আতরফ-মুসলিম পর্যায়ে কেমন ক'রে রাজপুত জাতি চলে এলো তা দুর্বোধ্য। তবে একটা অনুমান করা সম্ভব। পাঠকদের মনে পড়বে, নিশ্চিন্তপুরে হাড়িরামের আখড়া না'কি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন জমিদার কানাই সিংহ রায়। যৌন বিচারে তিনি জাতে রাজপুত ছিলেন। জাতক্রোধ থেকেই কি হাড়িরাম তাই রাজপুতদের স্থান দিলেন বিধর্মীদের দলে? সঠিক কথা বলা কঠিন।

হাবেলের থেকে উদ্ভূত চারজাতি সেখ সৈয়দ মোগল ও পাঠান হাড়িরামীদের সৃষ্টিতত্ত্বে বিস্তার লাভ করে বিপুল ভাবে। অথচ কোন অজ্ঞাত কারণে কাবেলের অন্ত্যজ জাতি জোলা নিকিরির বংশ বিস্তার দেখানো হয় না। আসলে বোধহয় নিম্নবর্গের আর শ্রেণীগত বিভাজন হয় না। হাড়ি থাকে হাড়ি হ'য়ে, ডোম থাকে ডোম। যতকিছু শ্রেণী ও বিভাজন বুঝি ভদ্রসমাজেই। যাইহোক এবারে দেখা যাচ্ছে সেখ থেকে জন্মালো আরো চার রকমের সেখ—জিন সেখ, পরী সেখ, হাইতুলি সেখ আর জলতুলি সেখ। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে হাড়িরামের স্বজনকল্পনা এবার আমাদের চমকিত ক'রে প্রবেশ করতে চাইছে বাস্তব থেকে জিন পরীর রাজ্যে। হাইতুলি আর জলতুলি কি সেই অলীক অশ্ব যা আমাদের নিয়ে যাবে স্বপ্নরাজ্যে?

কিন্তু দেখা যাচ্ছে সৈয়দ বংশও চার অংশে ছড়িয়ে যায়। তাদের নাম—হুমানী সৈয়দ, আলী সৈয়দ, হুমরা সৈয়দ আর হয়ানা সৈয়দ। এবারে আমরা আর ব্যাখ্যা করতে পারবো না। বরং দেখা যাক মোগল বংশের দিকে।

---

* আশরফ-আতরফ মুসলমান সমাজের এই বিভাজন যাঁরা বিস্তারিত জানতে চান তাঁরা পড়বেন Rafiuddin Ahmed এর লেখা 'The Bengal Muslims (1871-1906)' বইয়ের প্রথম অধ্যায় The Bengal Muslims: Problems in Social Integration.

পৌগলও চার জাতের—শিয়া বোগল, যুরি বোগল, লাল বোগল আর নীল বোগল। এবারে শিয়া যুরির বাস্তব অস্তিত্বে লেগে যায় রূপকথার আবেশ। লালকমল আর নীলকমলের অনুষঙ্গে এসে যায় লাল বোগল আর নীল বোগল। সৃষ্টিতত্ত্ব তো নয়, যেন অবন ঠাকুরের রচনা পড়ছি। সবশেষে উল্লেখ্য পাঠানদের চার প্রজাতি—ছুর, ছুরানি, লুখি, লোহানি।

'ব্যাস্, হাবেল কাবেলের বংশ কথা শেষ'—এইভাবেই বলেছিলেন নিশ্চিন্তপুরের বিপ্রদাস হালদার। প্রবাক্ত মানুষটির কথকতার ঢংয়ে বলা হাড়িরামের সৃষ্টিতত্ত্ব এখনও আমার টেপ রেকর্ডারে বাজিয়ে শোনা যায়। কেমন অলীক লাগে। বিপ্রদাসের মত অসামান্য স্মৃতিধর মানুষও কি দিন দিন অলীক হয়ে যাচ্ছেন না ?

কিন্তু এখনও মুন্থক কালির বংশধারা বলা বাকি। মুন্থকের তিন সন্তান—পরাশর, নমস আর ঋষভ। তিনজনই মুনি। এবারে দেখা যাক হাড়িরামের হাতে পড়ে মুনিদের কী দুর্দশা। প্রথমে আসে পরাশর মুনির কথা। তাঁর এগারো সন্তান। তারা কারা ? ছাগ শংখ নাগ শকুন মুসক (ইঁদুর) মশক হাতি ঘোড়া বিড়াল উট হনুমান। হাড়িরামের বিস্মিষ্ট মনের কল্পনায় তাহলে জন্তুজানোয়ারদের উৎপত্তি মুনির অংশে ? * নমস মুনির সন্তান সংখ্যা বারো। তাদের নাম—অরলাল করলাল গ্রহক নৈনি শিউলি হুলো আলতাপেটে মুগলবেড়ে মালদহী ঝাপানি পুরকাটা চং। বেশির ভাগই দুর্বোধ্য শব্দ। তারমধ্যে শিউলি বলে তাদের হাড়িদের মধ্যে যারা খেজুর রস পাড়ে। বাকি শব্দগুলি কি জাতিবাচক ? সে মীমাংসা স্থগিত রেখে অন্তপ্রসঙ্গ আনা যাক।

এবারে লিখি ঋষভ মুনির চারসন্তান—নরশন, পরশন, পদ্ম আর দরশন। নরশন থেকে জন্মেছে নাপিত, পরশন থেকে ধাই আর পদ্ম থেকে মুচিরাম। এই তিন জাতির পরে থাকে ব্রাহ্মণদের কথা। হাড়িরাম কি তাদের কথা ভাবেন নি ? সেখানে দেখা যাচ্ছে যাবতীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে দরশন থেকে। মোট তেরো রকম ব্রাহ্মণ। যথা—দোবে তোবে চোবে পাঠক পাড়ে উবিদ্ধি তেওয়ারি মিশির মেতেল দেবেল ঠাকুর বিষণ শুকুর। কিন্তু সত্যই ব্রাহ্মণদের এতগুলি শ্রেণী কোন্ দেশে আছে ? অন্তত বাংলায় নেই তবে বিহার ও উত্তর-প্রদেশ মিলিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। মনে পড়ে যায়, স্বতই যে, ডোম আর হাড়িরা এসেছিলেন একদা ঐসব দেশ থেকেই। তাঁদেরই স্মৃতিতে কি ধরা ছিল ব্রাহ্মণদের এত অনুপুঙ্খ শ্রেণী বিভাজন ? অথবা বলরাম তাঁর কৈশোরে দেখেছেন

পুরুর জমিদার বাড়িতে কর্মরত অবস্থায় কেষ্ট জোতদারী ও পুরোহিত ব্রাহ্মণকে সেইভাবে ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই কি এইসব ব্রাহ্মণ শ্রেণীর 'থাক' সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন ? (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২২)

সৃষ্টিতত্ত্ব এবারে বাঁক নেয় আবার লৌকিক থেকে পুরাণে। সেই একই পর্যায়ে বাবকাঞ্চনীর সন্তান বাসুদেবের তিনসন্তানের নাম আমরা খুঁজে পেয়েছি কেবল। অদ্ভুত তিনটি নাম তাদের—শানকুল, গজকচ্ছা আর মুনিবালক। যেন আধা পৌরাণিক আর আধা রূপকথার স্পর্শময় এসব চরিত্র। ব্যাখ্যাতীতও বহুলাংশে।

সৃষ্টি আর জাতিতত্ত্বের একটা ব্যাপক অংশ জুড়ে আছে বিষ্ণুর বংশ। সেই দিকেই আছে মানব ও জীবজন্তুর নানা প্রজাতি। এর কারণ হাড়িরাম সম্প্রদায় মনে করে বিষ্ণু পালন কর্তা। এই বিপুল বিস্তারিত এবং সতায় পাতায় ছড়ানো যে-নানা জাতের নানা শ্রেণীর মানবসমাজ, তার পালক বিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণুরূপী হাড়িরাম। সবশেষে আসে শিবের বংশ। তা কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত তবে অভিনব মৌলিক কিছু ভাবনা সেখানেও আছে। বলা হয়েছে শিবের সন্তান তিনজন—কার্তিক গণেশ আর সরস্বতী। এই জায়গায় মহাভারত বা পুরাণকে অগ্রাহ্য ক'রে হাড়িরাম জানিয়েছেন কার্তিকের সন্তান অর্জুন। সে কি যোদ্ধা ব'লে? গণেশের সন্তান ভূঁইমাস্তর। আর সরস্বতী চিরকুমারী ব্রহ্মচারী। এখানেই শিবের বংশ শেষ। সৃষ্টিতত্ত্বও সমাপ্ত।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, আমাদের ঐতিহ্যবাহিত বিদ্যা বা শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে হাড়িরামের সৃষ্টিতত্ত্বের সব কিছুর ব্যাখ্যা বা মীমাংসা করতে পারবো না। তবে চিন্তার নবীনতা বা কল্পনার ঐশ্বর্য আমাদের মুগ্ধ করবেই। এই বিবরণ মুখে মুখে চলছে তাই কিছু কিছু শব্দ ধ্বনিগত বিকৃতির ফলে অন্যরকম হয়ে গেছে। নানা জনের কাছে এই সৃষ্টিতত্ত্ব আমি নানা কাঠামোয় পেয়েছি। তবে মূল সূত্র সর্বত্র এক। কিছু পরিশিষ্ট আছে খণ্ড খণ্ড। কাব্যের যেমন পাঠান্তর থাকে, তেমনই হাড়িরামের সৃষ্টিতত্ত্বের অন্ত নানা কাঠামো থাকতে পারে। নিশ্চিন্তপুর, মেহেরপুর, থাওয়াপাড়া নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে আমি সৃষ্টিতত্ত্বের নানারকম সংযোজন পেয়েছি। মৌখিক লোকসাহিত্যের স্বভাবই তাই। মূল কাঠামোতে পড়ে নানা মানুষের সৃজন স্বাক্ষর। তাতে গতিশীলতা বেড়ে যায় মূল রচনার। এখানে তেমনই এক পাঠান্তর পাঠকদের বিচারের জন্য পেশ করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণদের বিষয়ে এই জাতিতত্ত্ব হাড়িরাম নিজে বানিয়েছিলেন অথবা

তাঁর কোন অনুগামী পরবর্তীকালে এই ছক বানিয়েছিলেন বোঝা মুস্কিল। ব্রাহ্মণ বিষয়ক যে সৃষ্টিতত্ত্ব আমরা আগে শুনেছি (দত্তাত্রেয় সন্তান ভেড়োরবংশের ব্রাহ্মণ) তার সঙ্গে এর সূচনায় মিল থাকলেও পরিণামে মিল নেই। এই ছক হ'ল :

কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসেছিল আদিশূর রাজার চেষ্টায়।

তাদের বলে—দেবে ভেবে চোবে পাঁড়ে আর পাঠক।

পাঠকের সন্তান দুজন—বৃষ আর মেষ।

বৃষ হ'ল বেদের মেয়ে আর মেষ হ'ল বাগদির মেয়ে।

বৃষের সন্তান মুরারি।

মেষের সন্তান মুকুন্দ।

এই মুকুন্দ আর মুরারীর বংশ থেকে যত্তেক ব্রাহ্মণ। যথা—ভাটচাজ্জে বাড়ুজ্জে মুখুজ্জে গাঙ্গাল ঘুষাল বাগজি লহড়ি ভাদরীয়।

খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ছক। এর পরতে-পরতে মেশানো আছে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ। বৃষ আর মেষ থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি? তাদের রক্তে রয়েছে বেদে আর বাগদির রক্ত? এই কি সেই যোগেন্দ্রনাথ কথিত 'hatred that he taught his foll-owers' তারই ফলিত নমুনা? ভট্টাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় ঘোষাল বাগচী লাহিড়ী ও ভাদুড়ী এইসব উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণপদবীর যা ধ্বনিবিকৃতি ঘটেছে তা রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টিকারী। সমাজ-বিজ্ঞান আর সমাজ ইতি-হাসের যাঁরা গবেষক তাঁদের সামনে হাড়িরাম সম্প্রদায় যেন জীবাশ্মের মত রেখে গেছে উল্টো একটা সমাজ ভাবনার দিক। সমাজবিদ্‌রা যে ভাবেন নিম্নবর্গের মধ্যে থাকে Parallel Tradition এর স্রোত তা ঠিক। হাড়িরাম সম্প্রদায় বিপরীতে এটাও দেখান যে উচ্চবর্গের শ্রেণীক্রমকে প্রয়োজনে তাঁরা কেমন নয়-ছয় করতে পারেন।

এতক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করলাম হাড়িরাম সম্প্রদায়ের একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা। সে-মন্ত্রে মূলকথা ছিল 'জাতিতত্ত্ব ভাবসত্য তোমা হতে চিনি'। সেই জাতিতত্ত্ব এবারে বোধহয় স্পষ্ট হলো। এর পিঠোপিঠি স্মরণে আনি তাদের পদকারদের লেখা দুটি পদাংশ।

১ আমার হাড়িরামের চরণ কৃপাতে
   মেলে সব জাতে।

২ জল জলে পাক জল

জেনে নাই ছত্রিশ বর্ণ
এ সংসারে আর কে পারে
হাড়িরাম ভিন্ন ?

দুটি বহুশ্রুত পদাংশে বলার কথাটি বেশ দর্পিত প্রত্যয়ে ভরা। দুটি উক্তিতেই হাড়িরাম সম্প্রদায় সম্পর্কে একটু অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে এবং সে-অহংকার খুব সংগত। বাংলার বেশির ভাগ লোকধর্ম এতবড় দাবী করতে পারে কি ? পারে-না, তার কারণ সেসব লোকধর্মের প্রবর্তক যত নিম্নবর্গের অন্ত্যজ বা এমনকি আতরাফ মুসলমান হোন পরবর্তীকালে তার প্রসারে ও জনাদরে আকৃষ্ট হয়ে এসেছেন বহুতর বর্ণহিন্দু ও ধনাঢ্য গোষ্ঠি। কর্তাভজা ধর্মে তো সামন্ত শ্রেণী ও ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত উৎসাহী হ'য়ে উঠেছিলেন। যেমন ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল, ব্রাহ্ম সেবাব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণুড়ের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রাম-চরণ চট্টোপাধ্যায়। কর্তাভজাদের এককালীন বিখ্যাত নেতা দুলালচাঁদের পার্ষদ ছিলেন কাশীনাথ বসু, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, রামানন্দ মজুমদার ও নীলকণ্ঠ মজুমদার। এঁরা শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য। সাহেবধনীদের প্রবর্তক বংশ ছিলেন স্বচ্ছল ও প্রতিষ্ঠিত গোপ সম্প্রদায় ভুক্ত। লালন শাহের ধর্মে অনেক খানদানী মুসলমান যুক্ত ছিলেন। লালন পূর্বাশ্রমে নিজেও ছিলেন কায়স্থ। রামবল্লভী সম্প্রদায় গড়েছিলেন বেশ কজন ব্রাহ্মণ। এই সব উদাহরণের পাশে যদি বলরামের চেলাদের পরিচয় নিই তবে কাদের দেখি ? হাড়ি, মুচি, মালো, মুনী, বেদে, নমঃশূদ্র, বাউড়ি। এঁদের চেয়ে উঁচু পর্যায়ে বড়জোর মাহিষ্য। আজ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাই এমন গর্ব তো তাঁরা করতেই পারেন যে হাড়িরাম ভিন্ন কে আর ছত্রিশ বর্ণকে মেলাতে পারে ? জাতিতত্ত্বের বজ্রাভিতে ডংকা মেরে, স্পষ্ট উচ্চারিত ব্রাহ্মণবিরোধিতা ক'রে তবু হাড়িরামীরা স্বধর্মে নিধন বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। তবে বিশ শতকে এ-ধর্মে মাহিষ্যদের একটা বড় অংশ যুক্ত হয়ে বেশ কিছু হিন্দু স্মার্ত আচরণবিধি ঢুকে গেছে। নদীয়ার মাহিষ্য-দের অনেকেই সম্পন্ন গৃহস্থ, চাষবাসে সম্পৃক্ত। কাজেই বলরামের শিষ্যদের প্রথম যুগের ভিক্ষাবৃত্তি এখন আর তেমন দেখা যায় না। সোমপ্রকাশ যে লিখেছিল : 'এই ধর্মে ভিক্ষাকেই একমাত্র প্রশস্ত ব্যবসায় বলিয়া থাকে' কিংবা যোগেন্দ্রনাথ যে লিখে গেছেন : 'They are known···by their refraining from mentioning the name of any God or Goddess at the time of asking for alms' তা নিশ্চয়ই সত্য। এই রকমই বদলে গেছে এই ধর্মের

মুসলমান সংস্কার পদ্ধতি। একদিকালে এঁদের মৃতদেহ 'অগ্নিদাহ' 'জলদাহ' বা 'মৃত্তিকাদাহ' করার রেওয়াজ ছিল না। বলরামকেও তা করা হয়নি। অর্থাৎ তাঁর মৃতদেহ নদীতীরে নির্জন জঙ্গলে রেখে আসা হয়েছিল। তাঁর দেহ হয়েছিল জীবাহার। এখন অবশ্য হাড়িরাম সম্প্রদায়ে এমন সংস্কার পদ্ধতি অসম্ভব। একমাত্র ব্যতিক্রম পুরুলিয়ার দৈকিয়ারী আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বাউড়ি শ্রেণীর হাড়িরামীরা। তারা মৃতদেহ প্রোথিত করেন। এ সম্পর্কে আমার অনুসন্ধান থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি। হাড়িরামের প্রয়াণের আগেই তাঁর বিশহাজার শিষ্য ছিল। প্রয়াণের পর তাঁর ধর্মমতে হাড়ি বেদে মুচি ইত্যাদি খুব নীচুস্তরের মানুষের কর্তৃত্ব ক্রমশ কমে আসে। নেতৃত্ব নেন মাহিষ্যজাতের লোক। নিশ্চিন্তপুর ও মেহেরপুর দু আয়গাতেই তাঁর জোর ছিল। নিশ্চিন্তপুরের আশপাশে হাড়িরামের ধর্ম সম্ভবত তাঁদের প্রয়াসে ছড়িয়ে পড়ে (দ্রষ্টব্য মানচিত্র) মাহিষ্য অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে। তাঁদের পর হাড়িরাম সম্প্রদায়ে ক্রমান্বয়ে 'সরকার' হন নিশ্চিন্তপুরের শ্রীমন্ত, সাহেবনগরের গোবিন্দদাস বিশ্বাস ও ধাওয়াপাড়ার চারুপদ মণ্ডল। তিনজনেই জাতে মাহিষ্য। এ সময়ে কি হাড়িরামের অনুজ্ঞা ও এককেন্দ্রত্বের বদলে 'সরকার' প্রধান হয়ে উঠছিলেন কোনভাবে? এই সন্দেহের ভিত্তিতে রয়েছে হাড়িরামীদের একটি অন্তধরণের মন্ত্র। যথা :

> হক হাড়িরাম যিনি কোন্ ব্যক্তি?
> যিনি নাম মন্ত্র দিলেন সেই ব্যক্তি আর কে?
> ইহাকে সরকার বলা দোষের কথা।
> গুরুই বলরামচন্দ্র মূল কথা।
> ঠিক সত্য। ৩ বার।

নির্দোষ অকলংক হাড়িরাম সম্প্রদায়ে একবার মাত্র বিভেদ বিদ্বেষের অন্তর-চিহ্ন আমি খুঁজে পাই এই অদ্ভুত মন্ত্রে। মন্ত্র তো নয়, যেন অনুজ্ঞা। সরকারের কর্তৃত্বকামনাকে খর্ব করে এই মন্ত্র প্রবর্তককে পরমসত্যরূপে প্রোথিত করতে চেয়েছে। আশ্চর্য যে এই এখানে একবারের জন্য 'গুরু' বিশেষণ পর্যন্ত জোড়া হয়েছে হাড়িরামের আগে যা মূলত এই ধর্মে নিতান্ত অনভিপ্রেত। এঁদের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীসংকট তাহ'লে এতটাই প্রবল হয়েছিল কোনসময়ে?

যাইহোক, উঠেছিল হাড়িরাম সম্প্রদায়ে হিন্দু আচার আচরণের প্রসঙ্গ এবং বিশেষত সংস্কার পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনা। এ ব্যাপারে আমি সরাসরি প্রশ্ন রাখি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যিনি 'সরকার' হন সেই

গোষ্ঠদাসের অন্ত্যেষ্টি বিষয়ে তাঁর সন্তান সাহেবনগরের ফণী বিশ্বাসকে। তিনি বললেন, গোষ্ঠদাস তাঁকে বলেছিলেন মৃত্যু হলে তাঁর দেহও হাড়িরামের দেহের মত জীবাহার করাতে। কিন্তু গোষ্ঠদাসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উঠলো দুটি প্রবল বাধা। গোষ্ঠদাসের পত্নী ঐ সংকার পদ্ধতি অনুমোদন করলেন না, সন্তান ফণীরও মন সায় দিলো না। প্রধানত লোকভয় এবং তাছাড়াও নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ বিবাহে অবশ্যম্ভাবী সামাজিক বিরোধের আশংকা তাঁকে নিবৃত্ত করলো।

'তখন কি করলেন?' আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবে বাচক ও বুদ্ধিমান ফণী বিশ্বাস বললেন, 'তখন তাঁর দেহ ভাসিয়ে দিলাম গঙ্গায়'।

'গঙ্গায় কেন? গঙ্গাকে তো আপনারা মানেন না।'

ফণী বিশ্বাস বললেন, হিন্দুদের মত গঙ্গার পবিত্রতা মানিনা। পুণ্য মনে ক'রে স্নান করিনা। গঙ্গাজল আমরা হাড়িরামের সেবা পূজা স্নানেও নিইনা। ওসব মানে ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব। আমাদের কাছে গঙ্গার মান আর পাঁচটা প্রাকৃতিক জিনিসের মত। যেমন আব আতস খাক বাত, তেমনই গঙ্গা। জানেনতো হাড়িরামের পদ ধেয়ে গঙ্গানদীর সৃষ্টি?

ফণী বিশ্বাসের কথামত হাড়িরামের সৃষ্টিতত্ত্বে যোগ হলো আরেক নতুন তথ্য। এ সম্পর্কে গান আছে নাকি? জিজ্ঞাসা করার আগেই গান ধরে দিলেন দরাজকণ্ঠে:

মুনির মন হয়
পয়দা কলমদার
পদ ধেয়ে তোমার গঙ্গা হয় প্রচার।
ছিটে পারা তার
চেনে সাধ্য কার
জানেন মহেশ্বর অতি দুষ্করে।

এইবারে তো ব্যাপারটা বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্তের স্তরে চলে এলো। প্রকৃত পক্ষে দরকার গোষ্ঠদাসকে সেই জীবাহার না ক'রে জলসাৎ করা হলেও তার পরবর্তীকালে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের শব সংকারে হিন্দুদের মত শ্মশানকৃত্যেই বা বাধা কোথায়? তা তো পরিবর্তনশীল বাহিরের সমাজভুক্ত হাড়িরাম অনুগামীদেরও মনোমত। কাজেই এখন সেটাই সচল এবং প্রবল। ব্যতিক্রম অবশ্যই বৈকিমারী।

কিন্তু উনিশশতকে হাড়িরাম বস্তুত চেয়েছিলেন বর্ণভিত্তিহীন এক সার্বজনিক ব্রাত্য ধর্ম। তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছিল। তাঁর চরণকমলতে সত্যই মিলে গিয়েছিল সব নিচু জাত। প্রায় বৈষ্ণবদের মত তাঁদের গানে বলা হয়েছিল :

ভক্তিভাবে তিনি চণ্ডালের হয়।

অভক্তিতে তিনি ব্রাহ্মণের নয়॥

আর একটা গানে বলরামের ভক্তিতত্ত্ববিষয়ে বলা হয়েছিল সম্প্রসারিত ভাষ্যে, আরও গভীর উচ্চারণে যে,

প্রেমিক না হ'লে রে মন প্রেমিক না হ'লে

সে-প্রেম কীসেতে মেলে ?

প্রেম-ফল পায় কি প্রেমে হাত বাড়ালে ?

সে প্রেম গাঁথা আছে ঐ দেখো ফুলে আর ফলে॥

সে প্রেম জানে গুহক

জাতে চণ্ডাল হয়—

ও তার ভক্তি চণ্ডাল নয়॥

এই ভক্তির জোরে, বিশ্বাসের আন্তরিকতায় হাড়িরাম সম্প্রদায় দাঁড়াতে পেরেছিল উনিশ শতকের বাংলায়। মানবধর্মে তাঁদের আস্থা ছিল। ছিল একজন পূর্ণমানুষের দুর্লভ উদাহরণ, যিনি জাতের বিচারে কাউকে অধম মনে করেননি। অথচ মানুষটি ও তাঁর পরিকল্পিত ধর্মমত নিয়ে জীবিতকালেই যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। একজন পদকার লিখেছেন 'তারে কেউ বলে ম্লেচ্ছ কেউ বলে হাড়ি'। আরেকজন পদকার লিখেছেন, 'হাড়ি ব'লে ঘৃণা করে কেউ নিলে কেউ নিলে না'। কিন্তু যাঁদের জন্য হাড়িরাম প্রণয়ন করেছিলেন তাঁর বিচিত্র গৌণ ধর্ম সেই ব্রাত্যজন তাঁর জাতিতত্ত্ব ও ভাবসত্য দুটোই গ্রহণ করেছিলেন। এবারে উঠবে সেই ভাবসত্যের প্রসঙ্গ।

বলরামের ধর্মে ভাবসত্য বলতে বুঝতে হবে তাঁদের মূল জীবন বা যৌনতত্ত্ব যার উপর নির্ভর করে আছে তাঁদের সমগ্র বিশ্বাসের বিশ্ব। তাঁর সৃষ্ট মানুষ এই দুনিয়ার একরকম অসহায় বলা যায়। বিশেষত পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক বিচারে। তাঁদের জীবনের আচরণ ও নিয়ন্ত্রণকারী যে-সত্যতত্ত্ব তাকেই হাড়িরামের ভাবসত্য বলা হয়েছে। সব লোকধর্মেই সাধারণত একটি ভাবসত্য থাকে। সেই ধর্মমতের মানুষজন চালিত হন নিজস্ব নিগূঢ় আচরণীয় নিজস্ব ভাবসত্যের নির্দেশে। যেমন লালন ফকির তাঁর শিষ্যবর্গকে বলে গেছেন :

অন্ত গোলমাল ছাড়ো

আত্মতত্ত্ব ধরো—

তবে তীর্থব্রতের কর্ম নয়।

অন্ত গোলমাল বলতে মূর্তিপূজা, মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, অপদেবতা-উপদেবতার কল্পনা, ব্রত পার্বণ মানসিক ইত্যাদি। এইসব ছেড়ে ধরতে হবে আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্ব বলতে আমি কে আমি কি, কোথায় শরীরের কোন্‌খানে সাঁইয়ের বারামখানা, কেমন তাঁর গতায়াত, কেমন ক'রে সেই পরম বস্তুকে আশ্রয় করা যায়—এইসব।

সাহেবধনী গীতিকার তাঁদের ভাবসত্য স্পষ্টতর ক'রে বলেন :

মানুষে কোরোনা ভেদাভেদ

করো ধর্ম যাজন মানুষ ভজন

ছেড়ে দাও রে বেদ।

মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে

মানুষের উদ্দেশে ফেরো ॥

শিলা বিগ্রহ, সিজবৃক্ষ, মাটির ঢিবি, কাঠের ছবি এইসব ভ্রান্ত সাধনার পথকে পরিহার করবার জন্য লোকধর্মে সবিদ্রূপ প্রশ্ন তোলা হয়েছে : 'বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর?' পাশাপাশি লালন গভীর অহংকারে এইসব বস্তুহীন আচরণকে পরিত্যাগ ক'রে ঘোষণা করেছেন 'লালন বস্তু ভিখারী'। অর্থাৎ মূলবস্তুর ভিখারী।

কখনও কখনও অন্য ধর্মের প্রতিতুলনায় নিজেদের ধর্মের ভাবসত্তাকে সনাক্তকরণ করা সহজ হয়। যেমন লালন ফকিরের প্রত্যক্ষ শিষ্য দুদ্দু শাহ্‌ একটি পদে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছেন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে তাঁর বাউল তত্ত্বের পার্থক্য এই ভাবে :

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই

বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই।

বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব

পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ

তুলসী মালা অনুষ্ঠানে সদাই।

বাউল মানুষ ভজে

যেখানে নিত্য বিরাজে

বস্তুতে অমৃতে মজে, নারী সঙ্গী তাই।

ভাবসত্যের ব্যাখ্যায় চমৎকার লক্ষিত হয়েছে এখানে। বৈষ্ণবদের সাধনাকে তাঁরা মর্কট বৈরাগ্যের সাধনা বলতে দ্বিধা করেননা। অথচ নিজেদের ধর্মসাধনায় নারীসঙ্গের কারণ খুব সহজেই ঘোষণা করেন। সবিস্তারে বলতে চান যে, বাউল তত্ত্বে মানুষভজন মূল কথা। তাই নারীসঙ্গী নিয়ে পুরুষপ্রকৃতি সাধনায় অমৃতে মজে তাঁরা পেতে চান বস্তু। অর্থাৎ নিত্যবস্তু। এইসব প্রচলিত লৌকিক ভাবসত্যের পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিতুলনায় হাড়িরাম ধর্মের ভাবসত্য একটু অন্যরকম মনে হবে। তাঁরা তো প্রথম থেকেই পুরুষপ্রকৃতি সাধনায় কায়াবাদ ত্যাগ করেছেন। অথচ আশ্চর্য যে, বৈরাগ্যসাধনও তাঁদের ধর্ম নয়। তবে এই ধর্মমত মূলত গৃহীর আচরণীয়। অবশ্য এঁদের বিশ্বাসে অবিবাহিতেরও একটি সাধনমার্গ আছে। তবে সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল বা মারফতীদের মত প্রকৃতিভজন ও চারিচন্দ্র সাধন এ মতবাদে একেবারে নিষিদ্ধ।

এখানে প্রশ্ন উঠবে, বলরাম নিজে কি ছিলেন? ব্রহ্মচারী বা বিবাহিত? ব্রহ্ম মালোনী তাঁর কে ছিলেন? বৈধ পত্নী, সাধনসঙ্গিনী, নাকি শুধুই সেবিকা? সম্প্রদায়ের বিশ্বাসীরা তাঁকে ব্রহ্মমাতা বলেন সর্বদা। সেবিকারূপেই তাঁকে স্থাপন করা হয়েছে পদে। যোগেন্দ্রনাথ তাঁকে হাড়িরামের বিধবারূপে বর্ণনা করেছেন। সেটাই সম্ভব। বৈধব্যের কিছু স্পষ্ট চিহ্ন ও বহিলক্ষণ নিশ্চয়ই তাঁর চোখে পড়েছিল। এই বিতর্ক না বাড়িয়ে আমরা বরং দেখতে চেষ্টা করি হাড়িরাম-প্রচারিত ধর্মে ভাবসত্য কি? অন্যান্য লোকধর্মের মত স্পষ্টভাবে লেখা না থাকলেও বুঝতে বাধা নেই যে, হাড়িরাম তত্ত্বের নিগূঢ়তা উপলব্ধি করাই তাঁদের সাধনা। সেই নিগূঢ় উপলব্ধি বৈরাগ্যের পথে হ'তে পারে, সংসারের পথেও হ'তে পারে। তবে সেইখানে আছে কিছু বাধা। তার অপসারণের জন্য আছে কিছু নির্দেশ।

আলোচনার শুরুতেই শোনা যাক একটা গান, যাতে বলা হয়েছে আত্ম-দোষের প্রসঙ্গ। কথাটা অবশ্য বলা হয় একটু ঘুরিয়ে:

ওরে ক্ষ্যাপা, মনকে দুষো না—
তোমারই দোষ ষোলআনা
যেন মনকে দুষোনা॥
মনের রঙ্গ দেখে ভুলো না
মনের সঙ্গে যেও না।

মনকে ছাদো মনকে বাঁধো
ও যে মত্ত হস্তী বাগ মানে না।
যেন অন্ত ভুলো না।

শেষ পংক্তিতে আসল কথা আছে। অন্ত ভুললেই সর্বনাশ। অন্ত ভুললেই মনের ধৈর্যহীন কুপথ নিতে হবে। মনে মনে মানুষের গতি হবে নিম্নগামী, যেমন:

মনের মতন কিছু নাই—
ওরে খ্যাপা মনে মনে মিছরী খাই
মিছরীর নাড়ু কিনে খাই।

মিছরীর নাড়ু হ'ল কামবশীভূত জীবনের প্রতীক। একবার তার বশীভূত হ'লে সাধক হারিয়ে ফেলবে জীবনের খেই। তাই আর এক পদে বলা হয়:

সদানন্দ বলে খ্যাপা
হলি রে তুই কাজে খ্যাপা।
খ্যাপের খ্যাপ ছাড়ালি খ্যাপা
জনমের মত।

এখানে 'খ্যাপের খ্যাপ' মানে জন্মান্তরের সূত্র। হাড়িরামের ভাবসত্ত্ব জীবনকে এড়াতে চায় না। মানতে চায় জন্মান্তরের বন্ধন। মুক্তি কামনা নেই সেখানে। বরং গভীর বিশ্বাসে প্রার্থনা করা হয় পুনর্জন্ম তথা মানবজীবন। লোভ দেখিয়ে গীতিকার সেইজন্য উচ্চারণ করেন:

এমন মানবজীবন পাবি যদি
ধর গা হাড়িরামের চরণ।

কিন্তু শুধু চরণ ধরলে বা রামদীনের নাম নিলেই তো হবে না, চাই আত্ম-সংযম যা আসে আত্মচেতনা থেকে। গানে বলা হচ্ছে তাই:

লোকমধ্যে যদি মানুষ হারা হয়
তারেও খুঁজে পাওয়া যায়।
আপনি হারা হ'লে কোথায় পাওয়া যায়?
আপনাকে আপনি হয়েছ হারা
খুঁজে কর গা তার অন্বেষণ।

নিজেকে নিজে খুঁজে পাওয়া মানেই প্রকৃত হাড়িরামের সাধনা। কথাটি বলতে বা শুনতে খুব সোজা কিন্তু উপলব্ধি করা ও কাজে পরিণত করা কঠিন।

কেননা নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আসল মানে তো বীর্যরক্ষা। সেটাই প্রকৃত পুঁজি। সাধন-ভজন ধ্যান কারবার সব কিছুর উপরে হল বিন্দুধারণ। কথাটা এবারে শোনা যাক হাড়িরামীদের গীতিকার রামদাসের গানে হাল্কা রূপকে মোড়া:

ভবের হাটে এসেছো মন লাভ করিব বলে।
লাভ লোকসান সব বুঝা হবে
যেদিন দেখবে খাতা খুলে॥
পুঁজি লয়ে এলি তুই ভবের বাজারে—
লাভ করা যাক চুলোয় প'ড়ে,
ও তুই আসল পুঁজি ফেললি পেড়ে
এমনই তুই উদ্‌গেড়ে
দেখলিনে চোখ মেলে॥

এই আত্মধিক্কারের গানে আসল লক্ষ্য কিন্তু আত্মচেতনা ঘটানো। অনুতাপ ও শোচনা সব লৌকিক ধর্ম সাধনার ও আচরণবাদের সাধারণলক্ষণ। সেই শোচনা ও আত্মবেদনার তাপ আরেক সফল পদকার দীনু আরও মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন:

মন কেন তুই বেহুঁশ হলি—
কেন মিথ্যা কাজে মরতে গেলি।
ধর্মতলায় গিয়ে কেন তলিয়ে না বুঝিলি॥
তোর বক্ষে বইছে চক্ষের ধারা
কার কাছে এ শিক্ষা নিলি?
করতে গেলি সাধুসঙ্গ
সে সঙ্গ তুই ভঙ্গ দিলি।
আপন মাতৃধনে লুব্ধ হয়ে
পিতৃধন সব খোয়াইলি॥
ক্রমে ক্রমে মনের ভ্রমে
তুই মজালি আমায় মেলি,
প'ড়ে সঙ্গদোষে রঙ্গরসে
সদাই করলি রসকেলি।
মন রসনা তাব জানো না

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি
দীক্ষার কর্মদোষে সবাই দোষে
সেই দোষেতে দোষী হলি ॥

হাড়িরাম তত্ত্বের ভাবসত্য বোঝবার পক্ষে এই গানটি খুব দ্যোতক। 'মাতৃস্থানে লুব্ধ হয়ে পিতৃধন সব খোয়াইলি' এই পংক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যেকার কথা হল, যৌনতার টানে আপন বীর্যের অকারণ ও অন্যায় নাশ। হাড়িরাম সম্প্রদায়ে পিতৃধন বা শুক্রকে বলা হয় রত্নমণির মত দুর্লভ ও সংরক্ষণযোগ্য বস্তু। নারীর শরীরী সঙ্গের নেশায় তার বেহিসাবি ক্ষয়কে বলা হয়েছে বেহুঁশ হওয়া। তাই রামদাসের একটি গানে বলা হয়:

পিতা আমায় যে-ধন দিলে
রত্নমণি তারে বলে।
ভবকূপে দিলেম ঢেলে
ছড়াইলাম অকারণ ॥

নিজেকে আত্মসংযত না করতে পেরে উল্টে আবার নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ বিস্তৃত করা অতিপ্রজতার সাহায্যে বহুসন্তানজন্মের আসক্তিতে, তাকেই ভবকূপ বলা হয়েছে এখানে। ভবকূপে বন্দী হ'লেই ঐহিক বেদনা শোচনায় গ্রস্ত হ'তে হয়। তাতে যে দোষ জন্মায় তা হল ভাবসত্যকে লঙ্ঘন করার অপরাধ দোষ। তার ফলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারযুগের ফেরে অর্থাৎ বৈদিক সংস্কারে আবদ্ধ হ'তে হবে। তাহ'লে তো হাড়িরামকে পাবার পথ থাকবে না, কেননা বৈদিক পথ ত্যাগ না করলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। হাড়িরামীদের সবচেয়ে বড় ভয় এই চারযুগের চক্রে আটকে যাওয়া। সেই চক্র মুক্ত হয়ে দিব্যযুগের চেতনায় নিজেকে যুক্ত করাই তাঁদের দুর্লভ্য সাধনা। তাই তাঁদের গানে 'পড়িসনে চারযুগের ফেরে' কিংবা 'পড়বি রে চারযুগের ফেরে' এমন সাবধান বাণী প্রায়ই থাকে।

এইবার তাহলে হাড়িরামের ধর্মের মূল ভাবসত্যের প্রবেশদ্বারে আমরা পৌঁছে গেলাম। তাঁদের তত্ত্ব সাধনার চারতত্ত্ব—খাসতন, নিত্যন, এয়োতন ও বোধিতন। নদীয়া জেলার গ্রাম্য উচ্চারণে এয়োতন অনেক সময় হয়ে যায় য়েয়োতন বা রায়তন। এর প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা তাত্ত্বিক ও আচরণীয় অর্থ আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ এই চারতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করেন তার

সঙ্গে আমার অনুসন্ধানের মিল নেই। যেমন একজন গবেষক লিখেছেন :*

> চারটি পৃথক শব্দ দিয়ে এঁরা জগতের মানুষ কিংবা দেবতাদের বোঝেন : এক, খাসতন—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। দুই, নেকিতন—হাড়িরাম সাধক উদাসীন ; রায়তন—গৃহীভক্ত ; বদিতন—যাঁরা হাড়িরাম তত্ত্বে বিশ্বাস করেনা—নাস্তিক। লালন শাহের গানে খাসতন, সুরীতন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। চারটি তনের এই বিচার সুফীদের তন লতিফা, তন কসিফা, তন ফানি, তন বাকাউ-য়ের অনুসারী। বৌদ্ধদের মধ্যেও চতুঃকায়ের আদর্শ ছিল। তবে শব্দ হিসেবে তন এসেছে ব'লে সরাসরি সুফী প্রভাবের কথাই আসে।

মুস্কিল যে উপরের মন্তব্যে যতটা পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা আছে ততটা বিশ্লেষণ নেই। হাড়িরামের ধর্ম যারা ভাল ক'রে বুঝবেন এবং লক্ষ করবেন তাঁদের গান, তাঁরা খাসতনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে মেনে নিতে পারবেন কি ? নেকিতন (আমাদের মতে, নিত্যন্) ও রায়তনের তাৎপর্য এই উক্তিতে কিছুটা মানানসই তবে খুব সংক্ষেপে দায়সারা এই সংজ্ঞা। ব্যাপক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। গবেষকের রচনায় বদিতন (আমাদের মতে, বোধিতন) শব্দটি তো একেবারে ভুল অর্থ বহন করছে। যারা নাস্তিক ও হাড়িরামতত্ত্বে অবিশ্বাসী তারা কেন গৃহীত হবে তাঁদের হাড়িরাম ধর্মের চার কুঠুরীতে ? আসলে গভীরতর সরেজমিন অনুসন্ধানে এবং গানগুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে অন্য তাৎপর্য মেলে। মেহেরপুর ও নিশ্চিন্তপুরের তাত্ত্বিকদের ভাষ্য (প্রয়াত পূর্ণদাস ও বিপ্রদাস হালদার বিশেষত) এ প্রসঙ্গে অধিকতর নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়ই। তনের সাধনা হাড়িরামীরা কোথা থেকে পেলেন, তার উৎস ইসলাম না বৌদ্ধ সে বিতর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই। গবেষক নিজেই মেনে নিয়েছেন হাড়িরামের তনের ধারণা ইসলাম ও বৌদ্ধ মতের সঙ্গে খুব বেশি সংলগ্ন নয়, অন্তত তাৎপর্যে। লালন ফকিরও এসব শব্দ ভিন্ন অর্থে ভেবেছেন। এয়োতন (রায়তন) ও বোধিতন (বদিতন) তো আনকোরা নতুন শব্দ। কাজেই সংগত বিচারে মনে হয় এসব শব্দের গভীরার্থ অন্যভাবে ভাবা উচিত। ভাবা উচিত মূলত প্রজনন তত্ত্বের দিক থেকে। আগে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে, বলরামের ধর্ম মূলত দুভাগে বিভাজিত। তার এক অংশ বৈরাগ্যব্রতী

---

* দ্র° । বলা হাড়ি সম্প্রদায়ের কথা ও গান : বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। ৮২ বর্ষ। ১-২ সংখ্যা। ১৩৮২

উদাসীনের আচরণীয়, আরেক অংশ গৃহীর আচরণীয়। কল্পনা করা চলে একটা তৃতীয় অংশও, যেখানে একটা পর্যায়ে গৃহীব্যক্তিও হ'তে পারেন বিবিক্ত উদাসীন।

হাড়িরামের ধর্মসাধনায় সবচেয়ে উঁচু স্থান খাসতনের। পৃথিবীর আলো হাওয়া আকাশ আগুন জল এসবই ঈশ্বরের খাসতালুকের প্রজা। এরা কাউকে খাজনা দেয়না। অর্থাৎ এদের অস্তিত্বের বিনিময়ে কোনরকম মূল্য (যেমন এখানে বিশিষ্ট অর্থে বীর্যপাত) দিতে হয় না। হাড়িরাম এঁদের মতে ছিলেন খাসতনের সাধক।

খাসতনের একেবারে উল্টো ধর্ম বোধিতন। সেখানে অজ্ঞানতা ও অসহায়তার জন্য কেবলই দিতে হয় মূল্য অকারণ বিন্দুপাতে, অতিপ্রজতায় ও বন্ধনে। একটা গানে গোষ্ঠ দাস দারুণ আর্তিতে বলেছেন :

আপেরি এইবার ভক্তিভাবে ডাকো তারে
যদি বোধিতনে হবি উদ্ধার
নইলে উপায় নেইকো আর।
বোধিতনে থাকলে পরে
পড়বিরে চারযুগের ফেরে—
দেখ বিচারে।
আর বোধিতনে বদ্ধ হয়ে থেকোনাকো মন আমার।

হাড়িরামের ধর্ম গৃহীর ধর্ম কিন্তু যে-গৃহী অজ্ঞভাবে রোজ দেহ সঙ্গম করে এবং অকারণ বীর্যক্ষয় করে সে-ই বদ্ধ হয় বোধিতনে। এ সম্প্রদায়ে তাই বোধিতনের বন্ধন থেকে সব ভক্ত মুক্তির আকুল প্রার্থনা জানায়।

সেই বন্ধন থেকে মুক্তির আকুলতা যেমন সত্য তেমনই বন্ধন মুক্ত হয়ে গৃহীভক্ত সাধনার যে-স্তরে যেতে চান তা কিন্তু বৈরাগ্য নয়। সেই স্তরের নাম এয়োতন। এয়োতন ধর্মই এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে আচরণীয় ও প্রধান অবলম্বন। এয়োতন পরিকল্পনায় আছে এই অন্ত্যজ বর্গের জীবন ভাবনার ও যৌন চিন্তার এক বিচিত্র বিন্যাস। তাঁরা মনে করেন বিবাহিত গৃহী ব্যক্তির দেহসঙ্গমের একমাত্র লক্ষ্য সন্তানের জন্ম দান। সুলক্ষণসম্পন্ন সন্তান জন্মের উপায় হ'ল পত্নীর ঋতু-দর্শনের চতুর্থদিনে সঙ্গম করা। একেই এঁরা বলেন সাড়ে তিনের তত্ত্ব অর্থাৎ নারীর রজঃপ্রবৃত্তি থেকে সাড়ে তিন দিন পরে দেহ মিলন করলে সন্তান হবে। তাঁদের বিশ্বাস সাড়ে তিন দিনে রক্তের রং হয় পীত। ঐ রং সন্তান জন্মের

অনুকূল। এয়োতনের ধর্ম হলো একমাত্র ঐ লগ্নেই বিন্দুপাত করা শুধু সন্তান জন্মেরই প্রয়োজনে। মাসের অন্য দিনগুলিতে বিরত থাকাই এয়োতনের পালনীয় কৃত্য। সেই জন্যেই বলরাম তাঁর বাচনিকতায় ব'লে গেছেন 'মাসে এক বছরে বারো/ তার কমে যতটা পারো'। তিনি আরও ব'লে গেছেন একটি বা দুটি সন্তানের জন্ম হ'লেই নেওয়া উচিত বিন্দুরক্ষার মার্গ। সন্তান জন্মের পর যতদিন পর্যন্ত নারী আবার রজঃস্বলা না হয় ততদিন উভয়কে থাকতে হবে সংযত।

এয়োতনে আরও কয়েকটি বিধিনিষেধ আছে যার কথা এর আগে অন্যতর প্রসঙ্গে বলেছি। এয়োতনের বিশ্বাসী সাধকরা মনে করেন সন্ধ্যাবেলার সঙ্গমজাত সন্তান হয় চোর বা গুণ্ডা। সন্ধ্যার পর কিন্তু রাত বারোটার মধ্যে সঙ্গমজাত সন্তান হয় দস্যু বা ডাকাত। রাত বারোটার পরে সঙ্গম হ'লে সেই সন্তানকে বলা যাবে সুসন্তান। ভোরের সঙ্গমে জন্মাবে দৈবী ক্ষণজন্মা সন্তান, হাড়িরামের মত। সুতরাং এয়োতন ধর্মের সারবস্তু হলো মূলত বিন্দুরক্ষা ও তার সদ্ব্যয় একমাত্র সন্তান জন্মদানে। শ্রেষ্ঠ ও সফল দেহমিলনের সময় তাঁদের হিসেবে পত্নীর রজঃপ্রবৃত্তির সাড়ে তিন দিন পরে ভোর রাতে। কিন্তু এয়োতনের সাধকরা এরপরেও আরেকটা কথা বলেন। ঐ দুর্লভ যোগাযোগের পূত লগ্নে মিলিত হ'লেও যে সন্তান হবে এমন কোন নিশ্চিতি নেই। হাড়িরামের কৃপা হ'লে এবং পুরুষের মস্তকে অবস্থিত যে-শুক্র তা যদি পীতবর্ণ হয় তবেই সেই শুক্র সহযোগে পীত রজের সংযোগে সন্তান হবে এবং তা হবে পুরুষ সন্তান। এয়োতনের সাধক ঐকনে অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে হাড়িরামের কাছে তাই পীতধারার প্রার্থনা জানায়।

আশ্চর্য এই বিশ্বাসের জগৎ, এই ভাবসত্য। এয়োতন সাধক যখন সফলতা পাবেন অর্থাৎ অভিপ্রেত সন্তান লাভ ঘটবে একটি বা দুটি, তখন তাঁর সাধন মার্গ হবে নিত্যন্। এক কথায় বলা চলে, সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতা ও জন্মদ্বারে ঘৃণা—নিত্যনের এই দুই স্পৃহনীয় বিষয়। চিরতরে দেহাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে নিত্যপুরুষ হাড়িরামের ধ্যানজ্ঞানে মগ্ন থাকা নির্জন বনে বা নদী তীরে কিংবা পবিত্র বেলতলায়, এই হল যথার্থ নিত্যনের লক্ষণ। মেহেরপুরের আখড়ায় বৃন্দাবন আর নিশ্চিন্তপুরের বেলতলায় রাধারাণী আমার দেখা দুই নিত্যনের সাধক।

হাড়িরামের ভাবসত্য আসলে এক ক্রমিক সাধন মার্গ যার বিন্যাস খাড়াখাড়ি ও ক্রমারোহী। বোধিতন থেকে সেই মানব প্রবৃত্তি যেতে চায় এয়োতনের নিরূপিত

স্বর্গে এবং সেখান থেকে গিয়ে চিরশান্ত হয় বেহেস্তে বা ঊর্ধ্বলোকে নির্বাণে স্থিত হ'য়ে। জীবনের বিপরীত পরিণামে, দৌবর্ণে, হাড়িরামের অনুগামী বেশির ভাগ বিশ্বাসী মানুষদের প্রবঞ্চনায় পাংশু দিনযাপনে বস্তুত ঘটে যায় কিন্তু অন্যরকম। ক্রমারোহী সাধন মার্গের খাড়াখাড়ি আহ্বান মুখ থুবড়ে পড়ে আড়াআড়ি বিস্তৃত বোধিপথের প্রান্তচক্রে। নিম্নপ্রাণ করুণ ব্রাত্য মানুষগুলি কেবলই স্বপ্নভঙ্গের শাস্তি পান নিরন্তর প্রজননজনিত দারিদ্র্যে দুঃখে অনাচারে আর ক্লিষ্টতায়। তাঁদেরই সম্প্রদায়ী গায়ক যখন গান করেন, 'মন কেন তুই বেহুঁশ হলি। আপন মানুষে মুক্ত হবে দিচ্ছন সব খোয়াইলি' তখন নিঃস্ব ভক্ত অনুতাপে মাথা নাড়েন। কিংবা নিজেরই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পর্ণকুটিরে প্রবঞ্চিতার হাতে তুলে নেন অবসরের সঙ্গী একতারা আর গভীর সন্তাপে দীর্ঘশ্বাস লুকানো কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন, 'বোধি বনে বদ্ধ হলে থেকোনারে মন আমার'।

এইভাবে চলে আসছে প্রায় দু'শো বছর। হাড়িরাম তো কেবল ব্রাত্য নন, তিনি পথপ্রদর্শকও। ব্রাত্যজনের জন্য একটা পথ তিনি খুলতে চেয়েছিলেন গৃহী-ধর্মকে অস্বীকার করেই। একটা কঠিন আত্মসংযমের সাধন মার্গ তিনি রেখে ছিলেন ঐহিক মানুষদের জীবনস্বপ্নে। নিষ্কৃতি নয়, অবাধ সহচারী কাম নয়, বৈরাগ্যও নয়—তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অসহায় অন্ত্যজদের উদ্বুদ্ধ করা মানবধর্মে ও জীবন সাধনায়। মানুষগুলি হয়ত শতলাংশ হেরে গেছেন এবং হারিয়ে গেছেন আজ, কিন্তু মনে তাঁদের একজন পূর্ণমানুষের দীপ্র ধ্যান রয়েছে অকম্প্র গভীর। একজন সুদীর্ঘ মানুষ আর অগণিত ম্লান অনুগামী এই হলো হাড়িরাম সম্প্রদায়ের যথার্থ চিত্রকল্প।

'জলের সুঁই পবনের সুতো'

হাড়িরাম সম্প্রদায় আর তাঁদের গান বৃহত্তম বাংলার সামগ্রিক লোক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন দাবী করা যায় না। আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতিবিষয়ক পণ্ডিত ব্যক্তি ও গবেষক-লেখকরা এঁদের কথা লেখেননি। তার কারণ উপেক্ষা বা অবজ্ঞা নয়, অনেকটাই অজ্ঞতা। সামূহিক জনসমাজ যে হাড়িরাম অনুগামীদের ও তাঁদের তত্ত্ববহুল জীবন সাধনার কথা জানেন না তার কারণ এই সম্প্রদায়ের বৃত্ত খুব সম্বৃত। উচ্চতর সমাজে নিজেদের পরিচিত করাতেও এঁদের কোন উৎসাহ নেই। কোন সার্বজনীন মেলা মহোৎসবে এঁদের গায়করা অংশ নেন না। বিশেষত বাংলার বেশির ভাগ মেলা বসে বৈষ্ণব অনুষঙ্গে এবং হাড়িরাম সম্প্রদায় বৈষ্ণব বিরোধী। এই দল খুব ঘনিষ্ঠ পরিধিতে লগ্ন থেকে একান্তে ধর্মসাধনা করেন। এঁদের ধর্মতত্ত্ব ও গানের বিষয়ে কোন জনচিত্তজয়ী উপাদান নেই এবং পদকারদের মধ্যে নেই কৌশলী ও প্রতিভাবান গীতিকার। দেখা যায়, দেড়শো বছরে এই সম্প্রদায়ে সাকুল্যে জনদশেক পদকার আত্মপ্রকাশ করেছেন। গড়পড়তা হিসাবে তাঁদের শিক্ষিত বলা যাবে না। জাতিগত পরিচয়ে শূদ্রত্বের এতটাই নিম্ন পর্যায়ের এই সব মানুষ যে ভাষার মার্জনা বা উন্নত সমাজবিন্যাসগত লোকশিক্ষা তাঁরা পাননি। মুচি, মুসলমান-বেদে, নমঃশূদ্র, হাড়ি এই সব জাতিভুক্ত একজন উনিশ শতকীয় প্রায় অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ কেমন ক'রে ভাল গান লিখবেন? তাছাড়া তাঁদের গানের মূল প্রসঙ্গ তো একজন ব্যক্তি ও তাঁর মহিমার বন্দনা, কাজেই একঘেয়েমি থাকবেই এবং কল্পনার অবাধ

বিস্তার করার সুযোগ থাকবে না। সুতরাং বলতে বাধা নেই, বাংলার সামগ্রিক লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায় যেমন নিঃসঙ্গ ও আত্মযুক্ত বন্দী, তেমনই বাংলা লোকসংগীতের বিপুল রত্নভাণ্ডারে এঁদের গান রচনার স্বীকৃতি স্বাভাবিক কারণেই তেমন স্বতঃসিদ্ধ হ'তে পারেনা। কিন্তু বাংলা লোকসংগীত সংকলনগুলিতে এঁদের গান পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তত সংযোজনের বিনত দাবী রাখে। ঠিক তেমনিই বাংলার পণ্ডিতজনের লেখা লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যবিষয়ক ভারী বইগুলিতে এই সম্প্রদায় খুব করুণ অভিমানে একটু ফুটনোট-উল্লেখও পেতে পারে না কি ?

এইবারে একটি মূল কথায় আসা যাক। দীর্ঘকালের বাংলা লোকসংগীতের মধ্যেকার যে ধর্মগত অংশ (তত্ত্ববিচারে ধর্মসংগীতকে খাটি লোকসংগীত বলা যায় না) তাতে সাধন ভজনের পর্যায় বাদ দিলে কয়েকটি শ্রেণীবদ্ধ বিষয় পাওয়া যায়। আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব মোটামুটি পাচটি বিন্যাসে আমরা বাংলার গূঢ় ধর্মসংগীতগুলি সাজিয়ে ফেলতে পারি। এর মধ্যে একমাত্র দেহতত্ত্ব পর্যায়ের কিছু গান হাড়িরামীদের রচনায় আমরা পাই।

* বাংলার লৌকিক গানের ধারায় সম্প্রদায়ভিত্তিক গান রচনার ঐতিহ্য খুব পুরানো। আদি গান চর্যাপদ দিয়ে তার সূচনা, বৈষ্ণব ও শাক্ত গানে তার চরম ও বিস্তৃত বিকাশ। অবশ্য সেই সব ধর্মসম্প্রদায়ভিত্তিক গানের মধ্যেও আমরা আলাদা ক'রে ব্যক্তি-গীতিকারকে চিহ্নিত করতে পারি তাঁদের উচ্চারণের বিশিষ্টতায়, রচনা কৌশলে অথবা জীবনকে দেখা ও দেখানোর কোন উজ্জ্বল মৌলিকতায়। এইভাবেই আলাদা ক'রে আমরা সনাক্ত করেছি চর্যাপদের মধ্যে কাহ্নপাদ ও ভুসুকুপাদের রচনা, চৈতন্যপূর্ব কালের পদ সাহিত্যে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, চৈতন্যোত্তর কালে গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস, শাক্তগানে রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত, বাউলগানে লালন শাহ্ ও ফিকিরচাদের রচনা। পাঁচালিতে দাশরথি, মঙ্গলকাব্যে মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র, কবিগানে ভোলা ময়রা, ঢপ কীর্তনে মধুকান, মারফতী গানে হাসন রাজা এই ভাবেই স্বতন্ত্রতা পেয়েছেন। ফকিরি গানে পাঞ্জু শাহ, কঠিন দেহতত্ত্বের গানে হাউড়ে গোসাই, কর্তাভজাদের গানে লালশশী, সাহেবধনীদের গানে কুবির-যাদুবিন্দু, লালন শাহী গানে দুদ্দু শাহ্ এককভাবে রসিক শ্রোতাদের অনুমোদন পেয়েছেন। রত্নমণির হারে যেমন অজস্র মণিরত্নের মাঝখানে কৌস্তভ মণি শোভা পায় তেমনই অজস্র অনামিকা লৌকিক পদকারের গানের পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট এই সব পদকারের একক মহিমা ধরা পড়ে বিশেষ

ভাবে। সেইসব অজস্রবিধ রচনার সামান্যতার পাশে এঁদের মৌলিক রচনা যেমন জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে, তেমনই এঁদের রচনা আস্বাদন করার পর অন্যদের রচনা বড় ম্লান মনে হয়। এইভাবে কিছু বিশিষ্ট লৌকিক গান ও তার বিখ্যাত রচয়িতাদের আমরা যে চিহ্নিত করতে পেরেছি তার কারণ বাংলা লৌকিক গানে ভণিতা দেবার বিশিষ্ট পদ্ধতি। তাতে আমাদের লাভ হয়েছে এই যে, বেশ কিছু ব্যক্তিকে আমরা আলাদাভাবে মর্যাদা দিতে পেরেছি। যেমন 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই অসামান্য উচ্চারণের সঙ্গে প্রতীকায়িত হয়ে গেছেন চণ্ডীদাস। এই পদ্ধতিতে আমাদের ক্ষতিও হয়েছে, কেননা এর ফলে অনেক অনামিকা রচনা পায়নি তার মর্যাদা। যে-ধর্মসাধনা সকলের বা একটি গোষ্ঠীর তার মধ্যে থেকে আমরা খুঁজে নিয়েছি একজন ব্যক্তি-পদকারকে। ফলে, তাঁর পটভূমি আর তাঁর গ'ড়ে ওঠার খবরটুকু আমরা আর পাই না। দেশের শাক্ত পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া কি একক রামপ্রসাদ অমন গান লিখতে পারতেন? বাউল গানের নিজস্ব সন্ধ্যাভাষার ধারা না থাকলে কি লালন শাহ্ খাঁচার ভিতর অচিন পাখিকে দেখাতে পারতেন অথবা আরশিনগরের পড়শিকে বুঝতে পারতেন সাধারণ শ্রোতা? বাংলা বিশেষ ক'রে রূপকের দেশ ব'লেই এখানে রূপক রীতির দেহতত্ত্বের গান এত চালু হয়েছে। কথাটা বোঝাবার জন্য এখানে উদ্ধৃত করা চলে সংগীতবিদ্ অমিয়নাথ সান্যালের এক রচনাংশ :*

> ভারতে যত দেশ আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ যেমন রূপকপ্রিয় ও যেমন রূপকশিল্পী এমন কোন দেশ নয়। উত্তর-ভারতের কালোয়াতী গান, কাজরী, সাবন, ঝুলন, হোরী, চৈতী প্রভৃতি সাধারণ দেশজ রূপগুলি এবং দক্ষিণ ভারতের মহাত্মা ত্যাগরাজ প্রচারিত জনপ্রিয় গীতরূপগুলির সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমার এই ধারণা হয়েছে এই সকল গীতরূপের মধ্যে কল্পনা, ভাবুকতা বলতে বিশেষ এমন কিছু নেই—যাকে বাঙ্গালীর কল্পনা, উচ্ছ্বাস বা ভাবুকতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। হিন্দী ভাষার গানে—হরিদাস স্বামী, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ, কবীর, কুম্ভনদাস, যুগরাজদাস, কৃষ্ণানন্দজী, চতুর্ভুজদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গীতিকারদের গানের মধ্যে যে রূপক একেবারেই নেই, এমন কথা কখনও বলিনা। মাত্র এই কথা বলি, হরিদাস স্বামীজি

---

* দ্র° 'শতবর্ষের বাংলা গানের দিগ্দর্শনী'। দেশ, বিনোদন সংখ্যা ১৩৮১, পৃষ্ঠা ২৩

প্রকৃতির রচনায় যেখানে একটি রূপক পাওয়া যায়, সেখানে বাঙালী পদকারদের পদে পাশাপাশি পাওয়া যাবে।...

বাঙালীর মন নিভাঁজ বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ভাবুকতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে লালায়িত।

বাস্তবতাকে ভাবুকতা দিয়ে দেখতে পারলেই রূপক জন্মায় খুব স্বতঃস্ফূর্ততায়। চর্যাপদ থেকে রামপ্রসাদ বাংলা ধর্মগীতির সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতায় রূপকের অভিব্যক্তি দেখবার মত। অবশ্য বাউল গানে রূপক ব্যবহারের সবচেয়ে আনন্দদায়ক জোতজাগুলি আছে। যেমন লালন শাহের গানে দেহ-পিঞ্জিরায় প্রাণপাখির যাতায়াত কত সাবলীল রূপক বর্ণনায় ধরা আছে :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি
দিতাম পাখির পায়॥

কাঙাল হরিনাথ তাঁর ফিকিরচাঁদী গানে জীবন-সন্ধ্যার রূপক তো অনবদ্য কথিয়ে বলেছেন :

হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো
পার কর আমারে।

সম্ভবত এই স্বতোজ্জ্বল রূপক রচনার দীর্ঘবাহিত দেশজ ধারাতেই স্নাত হ'য়ে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের পদকার সদানন্দ লিখে ফেলেন :

এই মানুষে মানুষ মিশেছে—
তারে চিনে নিতে হয়েছে।
দশ ইন্দ্রিয় রিপু ছজন পঞ্চআত্মা সঙ্গে মিলন
তারা দেহে বসে রয়েছে।
আগুন জল মাটি হাওয়া দেহের মধ্যস্থলে রয়েছে॥

এই পর্যন্ত বর্ণনা খুব প্রথাবদ্ধ। রূপক প্রতীকগুলিও চেনা জানা। কেবল আগুন জল মাটি হাওয়া অর্থাৎ 'আব আতস খাক বাত' তত্ত্বটুকু সম্প্রদায়গত পরিভাষা। কিন্তু এর পরে বলা হয়,

প্রাণ-দারোগা দেহ-থানা আত্মা-মন দফ চৌকিদারী
দেখ এ মাল যায় না রে চুরি ;
এ মাল চুরি গেলে পরথ হবে

জবাব দিবি তুই কীসে ?

চার যুগে চার অবতারে
তার ভিতরে মানুষ খেলে
এবারে মন থেকোনা ভুলে।
এই থানার মালিক কারিগর
দেহে জেলা বসিয়েছে।

মানবদেহকে থানারূপে বুঝিয়ে সেই সঙ্গে এটাও বলা হলো যে, সেই দেহ-থানার কারিগর হলেন হাড়িরাম। মনের চৌকিদারী এবং প্রাণের দারোগাগিরি সত্ত্বেও যদি মাল অর্থাৎ বিন্দু চুরি যায় তবে জেলায় চালান হ'তে হবে। অপরাধ প্রবণতার প্রসঙ্গ বাদ দিলেও এ-পদে ভাবুকতার যে ব্যঞ্জনা আছে তা উচ্চ কবিত্বমণ্ডিত। আফশোস এইখানে যে, এমন সব গান আটকে রইলো কেবল নিশ্চিন্তপুরে বা আশেপাশে, ছড়িয়ে পড়লো না তেমন ক'রে সারা দেশের গ্রহিষ্ণু বাউল বৈরাগীদের কণ্ঠের প্রসন্নতায়, মেলায় মহোৎসবে। এসব গান তো কোনদিন বাউল ফকিররা গাইবে না। কেননা তত্ত্বগতভাবে তারা নরনারী যুগলভজনে বিশ্বাসী। এ-গান তার সম্পৃক্ত নয়।

পনেরো বছরের চেষ্টায় আমি হাড়িরাম সম্প্রদায়ের মাত্র তিনশো গান সংগ্রহ করতে পেরেছি। যে কোন বাংলা লোকধর্মের ক্ষেত্রে এত কমসংখ্যক গান রচনা সর্বনিম্ন সৃজনশীলতার একটা রেকর্ড। এ ব্যাপারে কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথমত, এঁদের মধ্যে শিক্ষিত মানুষ তথা পদকার অঙ্গুলিমেয়। দ্বিতীয়ত, গানগুলির লিখিতরূপ প্রায় অনুপস্থিত। বেশিরভাগ গান কণ্ঠবাহিত, ফলে পাঠান্তর প্রচুর এবং বিস্মৃতির নিয়মে গান নষ্টও হয়েছে অনেক। তৃতীয়ত, এসব গানের কোন বিনোদন-মূল্য নেই, নেহাৎ সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে হাড়িরাম-তত্ত্ব বোঝাবার জন্য বা তাঁর বন্দনায় এর সীমায়িত ব্যবহার। চতুর্থত, ভালরকম তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে এ-জাতীয় গান সচরাচর গাওয়াও কঠিন। তবে লোক-সংগীতের একটা সাধারণ লক্ষণ যে-Community composition তা এসব গানে টের পাওয়া যায়। যদিও একজন পদকার এককভাবে এসব গান লিখেছেন তবু গানের তত্ত্ব ও বক্তব্য অবশ্যই সম্প্রদায়গত সার্বিক। সেই জন্য কতকগুলি অনুষঙ্গ প্রায় ক্লিশে-র মত লাগে। এখানে তেমন কটা পৌনপুনিক অনুষঙ্গ উদ্ধৃত হচ্ছে।

১ নিত্যপুরুষ হন্ চৈতন্য

ব্রহ্মা যারে করে মান্ত।

২ কিঞ্চিৎ জানে মহেশ্বর।

৩ তোর ব্যাসের কলম
নাইকো মালুম।

৪ ঐ নাম প্রহ্লাদ জপে দণ্ডে দণ্ডে
অগ্নিকুণ্ডে মলো না।

৫ গয়া গঙ্গা যত তীর্থ ধাম
নহে তুল্য রামনামের সমান।

৬ হাড়িরামের চরণ ভেবে
নিমাই হয় সন্ন্যাসী নবদ্বীপে।

৭ রামনামেতে সদাই ছাড়রে জিগিরি
যে বলেতে কৃষ্ণ ধরেছিলেন গিরি।

সব কটি উদাহরণের লক্ষ্য এক, অর্থাৎ পৌরাণিক প্রসিদ্ধ ঘটনা ও প্রখ্যাত দেবতাদের শক্তির উৎসে হাড়িরামকে স্থাপন। উক্তিগুলি পরপর গন্ত করলে বক্তব্য দাঁড়ায়: হাড়িরাম নিত্যপুরুষ, তাঁকে ব্রহ্মা হেন দেবতা মান্ত করেন, তাঁর মহিমা কিছুটা জানেন কেবল শিব। তাঁর কথা স্বয়ং বেদব্যাসের কলমেও ধরা যায় না, প্রহ্লাদ ঐ নাম জপেছিলেন বলেই অগ্নিদগ্ধ হননি। ঐ নামের সমতুলা নয় কোন তীর্থ। ঐ নামের জোরেই কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন ধরেছিলেন। তাঁর চরণ ভেবে নিমাই নিয়েছিলেন সন্ন্যাস।

মনে রাখা দরকার যে, এর একটা গানও আমাদের জন্ত লেখা নয়। এ গানগুলির উদ্দেশ্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব সদস্যদের হৃদয়ের মধ্যে হাড়িরামের অমোঘতা ও সঠিক পথকে লজিক দিয়ে শক্তপোক্ত করা। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবন যেহেতু নিয়ন্ত্রণ হয় পুরাণের প্রসঙ্গে, দেবদেবীর উল্লেখে, তাই সেসব প্রসঙ্গ এই গানে এসেছে। উদ্দেশ্য কেবল ভিন্ন। দেবদেবী তীর্থ ও পুরাণের ঊর্ধ্বে বা নিয়ন্ত্রণকারীরূপে হাড়িরামকে দেখানো। এই জাতীয় গানকে Sectarian পর্যায়ভুক্ত বলা চলে। কিন্তু হাড়িরামদের গান মানেই যদি শুধু তাই হতো তবে তার তাৎপর্য হতো অদূর প্রসারী। এ সবের বাইরেও তাঁদের অনেক গান আছে। বেশ ভাল গান। তবে তাঁদের সব গানেরই মূল কাজ হল গান দিয়ে তত্ত্বের দরজা খোলা। তবু তারই মধ্যে ক্ষণপ্রভার বিচ্ছুরণের মত অত্যাশ্চর্য কবিত্বের ঝলক কিংবা অপূর্বকল্পিত চিত্রকল্পের রূপাঢ্য বিস্তার আমাদের চকিতে চমকে

দেয়। যেমন পদাবন্দের এক পদাংশে কারিগর হাড়িরাম যে-মানবদেহ গঠন করেছেন সেই কথাটি বলতে শুরু করেছেন খুব সাদামাটাভাবে,

হাড়িরাম দীন মানবদেহ গঠন ক'রে থো

পাঠাইয়াছে এ সংসারে।

এই পর্যন্ত ব'লে গানের অন্তরাতে পৌছে হঠাৎ পদকার বলে ওঠেন :

ও সেই জলের সুঁই পবনের সুতো

গড়লেন দেহ সেলাই ক'রে।

সঙ্গে সঙ্গে গানটা যেন চলে গেল এক অতীন্দ্রিয় লোকে, সুর-রিয়ালিজমে। শিষ্ট সাহিত্যের আন্তর্জাতিক পাঠক আমি, তবু নিশ্চিন্তপুরে এক রাতে এই গান বিপ্রদাস হালদারের গলায় শুনে যে শিহরণ বোধ করেছিলাম তার একটাই তুলনা আছে আমার জীবনে। একদিন দুপুরে অলসভাবে লালন-গীতিকার পদ পড়তে পড়তে হঠাৎ এক পংক্তিতে চোখ আটকে গিয়েছিল। প্রবল শিহরণে আমি উচ্চারণ করেছিলাম দুশো বছর আগেকার বাঙালী লোকগীতিকারের পদ থেকে 'যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে / তখন ভাবের খেলা ভেঙে যাবে'।

এমন যে হয় তার কারণ আমাদের ধারণা বাচনের অভিনবত্ব বা অনুভূতির অতল উচ্চারণ বোধহয় কেবল উচ্চশিক্ষার এক্তিয়ারে। আসলে উচ্চবর্গের অভিজাত সাহিত্য পাঠ ও ক্লাসিকচর্চা আমাদের প্রত্যাশাকে খানিকটা মেকি ক'রে দেয়। অনবরত মার্গ সংগীত শুনলে লোকসংগীতের স্বরগ্রামের মৌলিকতা আর স্বচ্ছ চলনকে মনে হতে পারে হাল্‌কা। আমরা অনেকসময়েই সহজ সরল উপাদানে গড়া সংহত নিরলংকার শিল্পকে খাটোভাবে দেখে আয়োজনপূর্ণ উপাদানবহুল সালংকার শিল্পকে বড় করে দেখি। এই রকম একটা তর্ক হয়েছিল একদা রবীন্দ্রনাথ আর দিলীপকুমার রায়ের মধ্যে। দিলীপকুমার বলতে চেয়েছিলেন ললিতকলায় থাকা উচিত এক Complex structure, আয়োজনের বৈচিত্র্য, গাঠনিক নানা কৌশল। রবীন্দ্রনাথ সে সমস্যার মীমাংসা করেছিলেন এইভাবে,*

> আমি কেবল বলতে চাই, সরলতার বস্তু কম ব'লে রস রচনায় তার মূল্য কম একথা স্বীকার করা চলবে না, বরঞ্চ উল্টো। ললিত-কলায় কোন একটি রচনায় প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, তাতে আনন্দ দিচ্ছে কিনা। যদি দিচ্ছে হয়, তাহলে তারমধ্যে উপাদানের যতই স্বল্পতা

থাকবে ততই তার গৌরব। বিপুল ও প্রয়াস-সাধ্য উপায়ে একজন লোক যে ফল পায় আরেকজন সংক্ষিপ্ত ও অনায়াস উপায়েই সেই ফল পেলে আর্টের পক্ষে সেইটেই ভালো।

এই হলো সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী। লোকসংগীত বিচারে এই মনোভাব অর্জন করতে পারলে আমরা বুঝবো কেন লালন ফকির অমন এক অত্যাশ্চর্য পংক্তি লিখতে পারলেন অথবা সদানন্দ গড়তে পারলেন অমন অতীন্দ্রিয় চিত্রকল্প। উচ্চশিক্ষিত স্রষ্টা তাঁর লেখাপড়ার একক বিপুল সামর্থ্যে জনজীবন থেকে কেবলই ছিন্ন হয়ে খাড়াখাড়ি উঠে যান ব্যক্তিত্বে ও প্রকাশের কৃটত্বে। লোক-কবি তাঁর আড়াআড়ি সমাজসম্পর্কে অভিজ্ঞ থাকেন ব'লে তাঁর অনুভূতি কূটত্বে দুর্বোধ্য হয়না বরং প্রকাশসারলো হয় সার্বজনীন। তাই কাড়িরাম সম্প্রদায় যখন গায়,

> তিনি হাড় হাড়্ডির থাম খুঁটি দিয়ে
> চাম দিয়ে আছে ঘেরা।

তখন শ্রোতারা বুঝে নেন এখানে মানবদেহের কথা বলা হচ্ছে, যাতে 'হাড়ের গাঁথুনী আর চামের ছাউনি'। কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়, কাঠামোই চরম নয়। সেইজন্য আরেক গানে বলা হ'ল :

> বল্ হাওয়াতে কইছে কথা
> ও মন আলেকলতা।
> আমায় ছেড়ে যাও কোথা ?

তখন বোঝা গেল দেহ কাঠামোর মধ্যে আছে রক্ত (বল্) এবং শ্বাস আর মন বিরাজ করে অলক্ষে। তাকে কুড়িয়ে এনে জড়ো করতে হবে দেহের কারণে, তবে আসবে সফলতা। এখন বোঝবার কথা এই, যে-পদকার এমন চমৎকার ক'রে ব্যাপারটা লিখলেন তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী নন কিন্তু উচ্চস্তরের সাধক। তাঁর বলবার কথা ক'টি এসেছে অনুভূতির গভীর তলদেশ থেকে, তাই তার অমন সরলতা ও চমৎকৃতি।

কাড়িরাম সম্প্রদায়ের গানকে আমি যে Community Composition বলেছি তার কারণ তাঁদের অনেকেই গান লিখেছেন কিন্তু বলবার কথাটা মোটামুটি এক, ধরনটাও খুব আলাদা নয়। রচয়িতাদের প্রকাশভঙ্গীর যে তারতম্য তার মূলে প্রতিভার উদ্ভাবচতা যতটা তারচেয়ে বেশি হ'ল সাধক হিসাবে অবস্থান। এইজন্য গৌরের গান বলবার ভঙ্গীতে চমৎকার কিন্তু সদানন্দর গান ভাবমূল্যে চমকপ্রদ। অন্যদিকে মুসলমান-ঘেঁষে যার দুখানা গানেই সফলতা

পেয়ে যান বিশ্বাসের জোরে। কিন্তু এসব কথার দূরপাতে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের গীতিকারদের একটু পরিচয় জানানো আবশ্যক।

হাড়িরামীদের মধ্যে প্রথম পদকার হলেন ব্রহ্মময়ী। তাঁর লেখা একটিমাত্র পদ পাওয়া গেছে। হাড়িরামের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে তদু, দীনু, নীলু, শ্রীমন্ত, সদানন্দ পদ লিখেছেন। প্রত্যক্ষ শিষ্য রামচন্দ্রের পৌত্র জলধর বেশ ভাল লিখেছেন। 'সরকার' হিসাবে পর্যায়ক্রমে গান লিখেছেন শ্রীমন্ত, গোষ্ঠদাস, চারুপদ ও বিপ্রদাস। বাবু ও মেও নামে দুই গীতিকার পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আছেন মদন, অক্রুর, নারায়ণদাস, মহেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে বিপ্রদাস, চারুপদ ও নারায়ণদাসের পদ গত একদশকের রচনা। তারমানে এ সম্প্রদায়ে গান রচনার ধারা আজও সজীব। গানের তত্ত্বভাবনায় দীনু ও সদানন্দ সবচেয়ে অগ্রগামী চিন্তার অধিকারী। নীলু দেহতত্ত্বের গানে খুব সিদ্ধি দেখিয়েছেন। বিপ্রদাস তাঁর গানে দেখিয়েছেন আকুলতা, চারুপদ ফুটিয়েছেন আর্তি। শ্রীমন্ত ও গোষ্ঠদাস তাঁদের গানে দেখাতে পেরেছেন সবচেয়ে নিগূঢ় ধর্মতত্ত্বের দিক। এঁদের সবাইকে নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে এক বৃত্ত। গানগুলি পরস্পর পরিপূরক। গানগুলির অন্তঃপুরে লুকানো কাছে কোন কোন তথ্য। যেমন হাড়িরামের সেবিকা ছিলেন ব্রহ্মময়ী এ কথা গান থেকেই আমরা জানি। তদু যে তাঁর প্রধান শিষ্য (রামানুচর হনুমানের মত) সেকথাও গানে আছে। তদু-র সঙ্গে সর্বদাই গঙ্গাধর নামে একজন শিষ্যের কথা আছে অনেক গানে। যেমন :

> মানুষরূপেতে আল্লা করছে খেলা
> বারিতালা মেহেরপুরে।
> আখেরেতে জীবের তরে বারাম দিলে
> তদু দেখলে নজর করে।
> মা সদাই থাকে ব'সে হর্ষচিতে
> গঙ্গাধর তুই দেখ্‌সে আয়রে॥

এখানে মা বলতে ব্রহ্মময়ী। আরেকটি গানে আছে :

> জানালেন তদু গঙ্গাধরে
> তারা এ নাম প্রচার করে।

অন্য আরেক গানে :

> হাড়িরামের নামে তরে গেল
> তদু গঙ্গাধর।

এসব গান থেকে বোঝা যায় হাড়িরাম সম্প্রদায়ে ব্রহ্মময়ীর চেয়েও অহু-গঙ্গাধরের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। যে হাড়ির নিগূঢ় মর্ম 'হাড়ির ঝি' হৈমবতীও জানেননা তা তিনি জানিয়ে দেন অহু-গঙ্গাধরকে। এই মর্ম জানা গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্লভ সুযোগ (এঁদের ভাষায় মর্মজ্ঞকে বলা হয় 'মর্মিক') কেননা :

জানলে রামের নিগূঢ় মর্ম

হবে জীবের পুনর্জন্ম।

কথাটা শুনলে খানিকটা খটকা লাগে। সাধারণভাবে আমরা ভাবি, ওখানে হওয়া উচিত ছিল 'হবে না আর পুনর্জন্ম'। কিন্তু না, হাড়িরাম অনুগামীরা মোক্ষের সাধনা করেন না। বারে বারে মানবদেহের গঠন পেয়ে আসতে চান পুনর্জন্ম পেয়ে এই পৃথিবীতে। মানবদেহের মূলে হাড়ের গঠন, সেখানেই হাড়িরামের আশীর্বাদ। তাই দেহই তাঁদের অভিষ্ট।

মেহেরপুর ও নিশ্চিন্তপুর দু' জায়গা থেকেই ব্রহ্মময়ীর পদ ব'লে একটি গান আলাদা ক'রে আমাকে দেওয়া হয়। তার প্রথম পংক্তি 'কিঞ্চিৎ করিও তুমি রসনা এই উপকার'। গানটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৭২ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যায় (১৩৭২) শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক টীকায় লিখেছেন : 'পদটি বলরামের প্রকৃতি বা সহচরী ব্রহ্মময়ীর'। যদিও যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ব্রহ্মময়ীকে বলরামের বিধবা হিসেবে চিহ্নিত ক'রে এতদূর বলেছিলেন যে, 'His widow inherited not only his position, but all his powers' তবু আমার ধারণা ঐ পদ ব্রহ্মময়ীর নয়। যুক্তি হিসাবে প্রথমে দীনুর লেখা একটি গানের ভণিতা উদ্ধার করছি :

ব্রহ্ম বলে ওরে দীনে কোন্ দিন আসবে রে তোর

ডাকের চিঠি।

যেদিন আসবে শমন বাঁধবে কষে

তুই কি সেদিন করবি কাঁদাকাটি ?

এখানে দেখা যাচ্ছে দীনু পদান্তে ব্রহ্মময়ীর পরামর্শ স্মরণ করছেন। এবারে দেখা যাক ব্রহ্মময়ীর নামে প্রচলিত গানটির ভণিতা :

যেদিন আঁধার হবে এ ব্রহ্মাণ্ড

কেঁদে কণ্ঠ হবে ভার।

কেঁদে ব্রহ্মমারে বলে, রামনাম থেকো না ভুলে—

এই রামনাম শুনায়ো কর্ণমূলে

আমি তোমায় দিলাম ভার॥

আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বলছে এ গানটিও দীনুর রচনা, যদিও তাঁর নামটি নেই সম্ভবত লিপি প্রমাদে। এ গান আগের গানটির মত শুধু তাই নয়, গানের মধ্যে ব্রহ্মমা শব্দটিই সব রহস্য ভেদ ক'রে দেয়। ব্রহ্মমা তো দীনুর তরফে ব্রহ্মমা। তিনি নিজে তো নিজের ভণিতায় অমন লিখতে পারেন না। তাছাড়া উক্তি থেকে দেখা যায় ব্রহ্মময়ী তাঁর অন্তিমকালে কর্ণমূলে রামনাম শোনাবার পরামর্শ দিচ্ছেন গীতিকারকে। এ পদ সুতরাং ব্রহ্মময়ীর নয়, বরং ব্রহ্মময়ীর জবানীতে দীনুর।

দীনু, নীলু, সদানন্দ, শ্রীমন্ত বা গোষ্ঠদাসের গানে যখনই কোন ভাবনার অভিনবত্বে চমকে উঠি তখনই মনে হয় এক ক্ষুদ্র শীর্ণ গৌণধর্মের গোষ্ঠীবদ্ধ থাকার ফলে এঁদের রচনা-প্রতিভার তেমন স্ফুরণ ও বিবর্তন হয়নি। একটি অন্ত্যজ বর্গের অহংকৃত ধর্মসম্প্রদায়ে থাকার ফলে কেবলই নিজেদের বিশ্বাসের সত্যকে বড় ক'রে ঘোষণা এবং প্রবর্তকের গরিমা বোঝানোয় তাঁদের কবিত্বের অপচয় ঘটেছে। বাউল ফকিরদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কথা ব'লে দেখেছি, হাড়িরাম সম্প্রদায় বিষয়ে তাঁরা অসহিষ্ণু। হাড়িরাম সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধা আছে। তাঁদের ভাষায় তিনি একজন 'বাস্তমান মানুষ', কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের সাধক ও সদস্যদের প্রতি প্রসন্নতা দেখিনি। সেই বহুকাল আগে কুবির গোঁসাই বলেছিলেন, 'বলরামের চেলার মত / কৃষ্ণকথা লাগে তেতো' সে মনোভাব এখনও আছে। প্রায় দুশো বছরের কাছাকাছি হলো গ্রামাঞ্চলে সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল ও ফকিরদের সঙ্গে বলরামের চেলাদের তাত্ত্বিক বিরোধ চলছে গ্রামে গ্রামে। বিরোধের কারণ বলরামের অনুগামীরা পরকীয়া রসরতিতে বিশ্বাসী নয়, অথচ অন্যান্য লোকধর্মের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি সেটাই। রাধাকৃষ্ণ কাহিনী তাঁদের সাধনায় শক্তি জোগায়। শ্রীচৈতন্যকেও তাঁরা পরকীয়া মিথুনাত্মক সাধনার প্রবক্তা ব'লে মানেন। অথচ হাড়িরাম তত্ত্ব কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে খর্ব করতে চায়। রাসলীলায় কৃষ্ণের অধিকার বিষয়েই তাঁদের প্রতিবাদ আছে (৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার ভিন্ন ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন :

> তোমার ঐ চরণ লাগি
> নিমাই পণ্ডিত অনুরাগী
> নবদ্বীপে কেঁদেছিল

হয়ে অতি দীনহীন।

এমন ব্যাখ্যা কোন্ বৈষ্ণবের পক্ষে রোচক হতে পারে? বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন ভজনের পদ্ধতি বিষয়ে হাড়িরামী গীতিকার তো পরিষ্কার বিদ্রূপবাণী শুনিয়েছেন:

তার মা জেনে কৌপীন আঁটা

গোপী ব্যবহার।

দীর্ঘদিনের এই ধর্মতত্ত্বগত গোষ্ঠী সংগ্রাম এখন হাড়িরামীদের বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত ক'রে দিয়েছে। এঁরা মূলত নিম্নশ্রেণীভুক্ত, তায় দরিদ্র, তাছাড়া নেই গুরুবাদ মহান্তগিরি, খাজনা বা প্রণামীর পিচ্ছিল আকর্ষণ। এ-সম্প্রদায় যে আজও শুদ্ধাচারে ও প্রতিবাদী তত্ত্ব নিয়ে বেঁচে আছে সেটাই বিস্ময়ের। কায়াসাধনার রহস্যময় হাতছানি, পরকীয়া সাধনার নামে অবাধ ও নির্বিকার যৌনতার কোন মোহময় আহ্বান এঁরা দিতে পারেন না। দ্বৈতবাদের দেশ আমাদের, কানু বিনে গীত নেই এখানে আর আছে শিব পার্বতীর উপাখ্যান। গ্রামে গ্রামে আপামর নরনারী মেনে চলেন ব্রত-পারণ-উপবাস, জন্মাষ্টমী, রাস ঝুলন, বিপত্তারিণীর ব্রত, মনসা পূজা আর নীলষষ্ঠী। পড়েন রামায়ণ, মহাভারত, লক্ষ্মীর পাঁচালী। তারমধ্যে মূর্তিমান বিদ্রোহবাদ নিয়ে হাড়িরাম সম্প্রদায় টিঁকে আছেন কোনরকমে গ্রামপ্রান্তের বেলতলায় বা বিশ্বাসী সাধকের অন্দরমহলে। এ-ধর্ম বংশানুক্রমিক নয় তাই হাড়িরামীর সন্তানই বহুক্ষেত্রে অন্য মার্গের সাধন করে। সবচেয়ে নির্মম সমাজসত্যও একটা আছে এসব ছাড়া। পল্লীসমাজে এখনও মানুষ দেবদ্বিজে আস্থাশীল। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আসলে হাড়িরামের সৃষ্টি এত বড় উচ্চাশার দাবী মেনে নিতে সাধারণ মুমুক্ষু মানুষের বুক কাঁপে। গ্রাম্যগুরুরা গরীব গৃহস্থদের ভয় দেখান, 'বেদ পুরাণকে অগ্রাহ্যি কোরো না। এখনও চন্দ্র সূর্য ওঠেন। এখনও গঙ্গাজলে পোকা লাগে না'।

'সখার সখী নেই সখীর সখা নেই' এই অত্যাশ্চর্য তত্ত্বে বিশ্বাসী হবার ফলে হাড়িরাম সম্প্রদায়ের গান রচনায় অনেকটা ঐতিহ্যবিরোধিতা ও শুষ্কতা এসে গেছে। বাংলা লৌকিক গানের একটা খুব বড় ঐতিহ্যগত মানবিক অংশ হলো নরনারীর প্রেমের সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবজগৎ। ধর্মচিন্তা ও নরনারী-প্রেম বাংলা গানে চমৎকার মিলে যায়। আমাদের কবিরা সাধক ও প্রেমিক একসঙ্গে। চণ্ডীদাস থেকে যাদুবিন্দু একই ধারা। সেইজন্যই মনে হয়, দীনু, শ্রীমন্ত, সদানন্দের মত অন্ত্যজবর্গের কুশলী গীতিকার যদি প্রেমের গান লিখতেন তবে বাংলা গান সমৃদ্ধ হতো, তাঁরাও বহু ভাবদৃঢ়তা ও মানবিকতায় গান রচনায়

বিরোধ সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা যখন হয়নি তখন খেদ ক'রে লাভ নেই। অবর্ণে স্থিত থেকে এই মানুষগুলি মেনে নিয়েছেন খণ্ডতার আত্মবেদনা কিন্তু উচ্চ আবর্ণের অহংকার। এটা তো ঠিক যে, কালের নিয়মে, সমাজ প্রগতির দ্রুত পট পরিবর্তনে এ সম্প্রদায় বিলীয়মান। নতুন ভক্ত সাধক যেমন আকর্ষিত হচ্ছেন না তেমনই জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন তাত্ত্বিকও আর তৈরি হচ্ছেনা। গ্রামে লেখাপড়ার বিস্তার যত হবে হাড়িরামীদের অদ্ভুত বিশ্বাসের জগৎ ততই সংকীর্ণ হয়ে আসবে এই তো স্বাভাবিক। সেইসঙ্গে কমে যাচ্ছে গান রচনা ও গায়নের সামর্থ্য। হাড়িতত্ত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসী না হ'লে গানের ভাব হবে অন্তঃসার-শূন্য। এই বিশ্বাসের জোরটুকু না থাকলে বিপ্রদাস বা ফণীর মত ওজস্বী কণ্ঠের স্থিতধীর গায়ক আর উঠে আসবেন না এই ধর্মগোষ্ঠীতে। সম্প্রতি নিশ্চিন্তপুরে সম্প্রদায়ীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রকাশ পায় এই সম্প্রদায়ের ক্রমিক আত্ম-বিলোপের কিছু কারণ। প্রথমেই ওঠে রাজনীতি ও রেডিও, টেপ রেকর্ডারের প্রসঙ্গ। গ্রামের যুব সম্প্রদায় এই তিন বিষয়ে এখন আকণ্ঠময়। নিশ্চিন্তপুরের একমাইল দূর দিয়ে চলে গেছে বাস রাস্তা। গ্রামের ছেলেরা উচ্চশিক্ষা পাচ্ছে, সমবায় প্রথায় মৎস্যচাষ হচ্ছে, প্রত্যক্ষ রাজনীতি এখন তুঙ্গে, হত্যাকাণ্ডও ঘটেছে। এছাড়া জানা গেল, উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষজন এখন অনেক উদারমতি এবং বিপর্যস্ত পল্লীসমাজে সমাজপতিদের কঠোর অনুশাসনের তাপ নেই। এই কথা থেকে ধরা যায়, হাড়িরামীদের সংখ্যাধিক্য ঘ'টে উনিশশতকের শেষার্ধে কেন বিশ হাজারে পৌঁচেছিল। উচ্চবর্ণের অনুশাসনের প্রতিরোধেই তাহলে এঁদের প্রসার? আরেকটি কথা বিচার্য, ভোগবাদী জীবন দর্শনের আদর্শ এখন গ্রামেও পৌঁচেছে। আধুনিক পোষাক, মোটর সাইকেল ও টেপরেকর্ডার এখন অনেকেই ভোগ করছেন। তাঁদের কাছে এয়োতন ও বোধিতনের কথা পরিহাসের মত। পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর বোধিতনে-বদ্ধ মানুষদের প্রাকৃতিক অসহায়তা থেকে মুক্ত করেছে। হতাশ বৃদ্ধ প্রবীণ হাড়িরামী গীতিকার এসব বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেন :

> আজ কেন মন কলিকালে
> হাড়িরামের বিরোধী হলে ?
> জ্ঞান বিজ্ঞান সব হারালে
> কোন্ মন্ত্রে গুণে মন্ত্রণা ?

ইতিহাসের চল যে কোথায় কিভাবে নামে! হাড়িরাম সম্প্রদায়ের উৎসমুখেই ছিল পতনের বীজ। অন্ত্যজ বর্ণের মানুষ যে-প্রতিবাদ কামনায় এই ধর্মমত

গড়েছিলেন সেই প্রতিবাদ সরলীকৃত হয়ে গেল সমাজ পরিবর্তনে। সামন্ততন্ত্রের জায়গায় এলো ধনতন্ত্র। বর্ণ শোষণের চেয়ে বড় হলো অর্থনৈতিক শোষণ। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পট পালটে মেহেরপুর পড়লো পূর্ব পাকিস্তানে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত হাড়িরাম সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ দেশত্যাগ করলেন। কিন্তু নতুন জায়গায় গিয়ে, ক্যাম্পে কলোনীতে উপনিবেশে তাঁরা সবচেয়ে আগে বিসর্জন দিলেন হাড়িরামকে। আগে প্রাণধারণ তারপরে ধর্মরক্ষা।

যাঁরা দেশত্যাগ করলেন না তাঁরা কুষ্টিয়া জেলার নানা জায়গায় আত্মগোপন করলেন। এখন মেহেরপুরে সাম্বৎসরিক ক্রিয়াকলাপ কোনরকমে পালিত হয়। সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুতে ঢ'লে পড়েছেন কালের নিয়মে। সে অনুপাতে নতুন ভক্ত সাধক জুটছে না। মেহেরপুরের পূজা মন্দির, দালান যেমন ক'রে ভেঙে পড়ছে তেমন ক'রেই ভাঙন লেগেছে সম্প্রদায়ে। নিশ্চিন্তপুরের দলও আর আগের মত মেহেরপুর যান না। নিশ্চিন্তপুরেও তো ভাঁটার টান। সেখানেও কোনগতিকে সেবা পূজা, বারুণী আর মহোৎসব চলছে। এইভাবেই হাড়িরাম সম্প্রদায় কি শেষ হয়ে যাবে ?

অবশ্য থেকে যাবে কিছু গান। বিশ্বাসীরা প্রয়াত হ'লেও থেকে যাবে জাতি-তত্ত্ব ও ভাবসত্যের স্বরলিপি, গানে গানে। একজন মানুষের নিজের মত ক'রে ভাবা কিছু ভাবনা ও প্রতিবাদের একটা ধরন হ'য়ে থাকবে সমাজ ইতিহাসের অঙ্গীভূত। কতকগুলি সামান্য নীচজাতি উচ্চ ভাবনাদর্শ থেকে রচেছিল যে সব বিচিত্র গান সেগুলি থেকে যাবে হয়ত। ছেলেভুলানো গানে যেমন রূপকথার কাহিনী থাকে তেমনই ঐ সম্প্রদায়ের মানুষদের অনাগত কালের জননী বার্ধক্যে গাইবেন তাঁর প্রপিতামহের বিশ্বাসের স্মৃতিভারাতুর গান :

আজব কলে বানিয়েছে তরী
গড়নদার হাড়িরাম মিস্তিরি
শোণিত শুক্র তরীর গঠন।

নীতিবাক্যের মত উচ্চারণ করা যাবে :

সত্যের সঙ্গ কর অসৎসঙ্গ যাবে
তবেই হাড়িরামের তত্ত্ব জানা যাবে।

দারিদ্র্যজর্জর এই দেশে এমন আশ্বাস বাক্য বহন করবে হাড়িরামীদের গান যে,

রামের নাম যে মুখে লবে
অমন পাপী তরে যাবে।

ক্ষুধার সময় খেতে পাবে।

আমি এতদিন ধ'রে এতগ্রাম ঘুরেছি, সংগ্রহ করেছি কয়েক হাজার অপ্রচলিত লৌকিক গান কিন্তু কখনও কোন গীতিকারের রচনায় আমি পাইনি এমন উপাস্যের কথা যার নাম নিলে ক্ষুধার খাদ্য মেলবার আশ্বাস আছে। এমনটা লিখতে পেরেছেন গীতিকার তার কারণ মেকি মুক্তি বাদ দিয়ে এ-সম্প্রদায় দেহ-বাদী জীবনে বেঁচে বর্তে থাকতে চেয়েছেন। জীবন যে নিত্যচঞ্চল, প্রতিদিনে মানুষের ভাগ্য যে পালটে যায় এ তাঁরা জানেন। ভক্তি দিয়ে তাঁরা দুঃখতপ্ত জীবনের বিনিময়ে চান শরণাগতি। তাই পরম বিশ্বাসে বলতে চান :

রামদীন ভক্তি ভালবাসে
ভক্তি দেখলে কাছে আসে
তিনি লুকায়ে রয় অবিশ্বাসে।

কিন্তু বিশ্বাসীর ভক্তির সীমান্তেও যখন তিনি ধরা পড়েন না, জীবন গড়িয়ে চলে নিবিড় বেদনায় আর বিপুল দারিদ্র্যে তখন ভাবদর্শনে তাঁদের মনে হয় :

বুঝতে নারি হাড়িরাম মহিমা তোমার
বুঝবে কে সাধ্য আছে কার?
বুঝতে নারি তোমার খেলা
ও হাড়িরাম উপরওয়ালা—
কারে দাও গো দুঃখজ্বালা
কারো ভাগ্যে সুখোদয়।

গভীর অভিমানে এমন দুঃখভারনত বাণী জেগে ওঠে যে :

যে করে রাম তোমার আশা
তারে ঘটাও দশম দশা
এমনই তোমার ভালবাসা।

হয়ত এমন গাঢ় উপলব্ধির প্রকাশে কখনও কখনও ব্রাত্য গীতিকার আর প্রতিষ্ঠিত গীতিকারে খুব একটা তফাৎ থাকে না। যেমন উপরে উদ্ধৃত তিন পংক্তি প'ড়েই আমার মনে প'ড়ে গেল কুবির গোঁসাইয়ের লেখা ক'টি পংক্তি :

তোমার প্রেমে যে হয় মাতাল
কর তারে হাল যে বেহাল
তার ভিটেতে চড়াও ঘুঘুর পাল।

এই জায়গায় বোধহয় মিলেমিশে যায় সব। উপাস্যের প্রতি প্রগাঢ় শরণাগতি

ভক্তকে দেয় দুঃখজয়ের সান্ত্বনা।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, হাড়িরামের ভক্তের সঙ্গে বাউল ফকির সহজিয়া বা সাহেবধনীদের একেবারে মিল নেই কিন্তু গানের বক্তব্যে অনেক সময় খুব মিল আছে। তার কারণ দু'দলেরই গীতিকার উঠে এসেছেন একইরকম গ্রাম পরিবেশ থেকে। ভাগ্যের পরিহাস, অর্থনীতির দোলাচল আর দৈনন্দিন জীবনে ভোজ-উপবাসের বৈপরীত্য দুজনকেই ছুঁয়ে আসতে হয় সমানভাবে। উপাস্যকে এঁদের কেউ বলেন 'কর্তা' কেউ বলেন 'দীনদয়াল' কেউ বলেন 'কারিগর'। একজন যাঁকে বলেন গড়নদার, আরেকজন তাকেই বলেন সূত্রধর। গড়নদার আর সূত্রধরের তো একই কাজ অর্থাৎ শোণিত শুক্রে দেহ-তরী বানিয়ে ভবসমুদ্রে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করা তার শক্তির জোর। এই সমাপতনের কারণেই বোধহয় দুই সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে ও আচরণে পার্থক্য থাকলেও জীবন-বৈপরীত্য দেখা ও দেখানোর ভঙ্গীটি থাকে সদৃশ। যেমন হাড়িরামী গীতিকার মহেন্দ্রনাথ লেখেন :

কাউকে কর ছত্রধারী কাউকে কর দিনভিখারী
রামদীন গো—
কাউকে কর বনচারী গাছের তলা সার।
কাউকে খাওয়াও মাখনছানা
কারও ভাতে নুন জোটে না
আবার কারেও খেতে একবার দাও না
কাউকে দশবার॥
শতপুত্র দাওগো কারে
কত সুখে রেখেছ তারে
একটি পুত্র দিয়েও কারে
কেড়ে লও আবার॥
শুনি সমান দয়া সর্বজীবে
এমন কেন কর তবে?
মূঢ়মতি আমি ভেবে
ঠিক না পেলাম তার॥

সমাজ বিন্যাসের ফাঁকটুকু, ধনতন্ত্রের স্ববিরোধী স্বভাব বুঝতে না-পারার ভ্রান্তি এই ভাবেই মুখে মুখে বাঙালী গীতিকার ধরে নিয়েছেন উপাস্যের স্বৈর-স্বভাব ব'লে।

ঠিক এরই সমান্তর শুনি সাহেবধনী গীতিকার যাদুবিন্দুর বর্ণনে :

কখনও দুধ চিনি ক্ষীর ছানা মাখন ননী
কখনও জোটে না ফেন আমানি
কখনও আ-লবণে কচুর শাক ভখি।
দুখ দিতেও তুমি সুখ দিতেও তুমি
মান অপমান তোমার হাতে
সুনাম বদনামী।
গোঁসাই যে ভাবেতে রাখো যখন
সেই ভাবে থাকি ॥

ব্যক্তি জীবনের দুঃখ ও সমাজবিন্যাসজনিত অসাম্যকে বিধাতার দান বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কি বিকল্প থাকতে পারে দরিদ্র গ্রাম জীবনে? বরং নিজেকে মানানসই ক'রে নেওয়া ভাল সবকিছুর জন্য। সবচেয়ে ভাল নির্দ্বিধ শরণাগতি।

বাংলার লোকধর্মের বহুযুগবাহিত দেহতত্ত্বের গানগুলির সঙ্গেও কোথাও কোথাও হাড়িরাম তত্ত্বের গানের মিল পাই। দেহ-তরীর সাধারণ রূপক তো সব রকম বাংলা গানে আছে এমনকি অতুলপ্রসাদের গানেও। কিন্তু হাড়িরামের তত্ত্বে দেহকে তুলনা করা হয়েছে ঘরেরও সঙ্গে। যেমন :

জানলাম ধন্য রাম কারিগর।
ঘরের ছাটনি ছেটে বাঁধন এঁটে
রেখেছে নবদ্বার।
ঘরের কেলে জোকাকাঠি
চারচিজে চার খুঁটি
গড়লেন পরিপাটি কী চমৎকার!
চার খুঁটির উপরে আড়া
মায়ার ঘর প্রবোধের বেড়া
স্থানে স্থানে দিয়ে জোড়া
রেখেছেন ঘর খাড়া।
ঘরে কত মহামায়া
চাম দিয়ে ঘর ছাওয়া
দীর্ঘে চৌদ্দপোয়া

কী খাসা ঘর।

বর্ণনার মধ্যে কিছুটা প্রথাবদ্ধতা থাকলেও কল্পনার চমৎকারিত্বও আছে অনেক। মানবদেহ তথা মানবজীবন যে আসলে মায়ার ঘর এবং তাতে দেওয়া আছে প্রবোধের বেড়া এমন কথা আমরা আগে শুনিনি। চার চিজ মানে আব আতস খাক বাত্, চার খুঁটি মানে হাড় হাড্ডি মণি মগজ। নবদ্বার বলতে দুই কান দুই নাক দুই চোখ, মুখবিবর, পায়ু ও উপস্থ। মানবদেহের দৈর্ঘ্য চোদ্দ পোয়া বা সাড়ে তিন হাত।

এই কথাগুলিই ঘুরে গিয়ে বসে যায় নৌকার উপমায়। তখন বলা হয়:

চারচিজে চারতক্তা দিয়ে করলে পাটাতন
শোণিত শুক্র তরীর গঠন।
তরী পবন ভরে আপনি চলে
কিবা তার কারিকুরি।

অর্থাৎ রজবীজে মানবদেহের মূল গঠন, তাতে আগুন হাওয়া মাটি জলের শুশ্রূষা। এ-তরী শ্বাসের বলে চলমান। এর পরে বলা হয়:

মানবতরী মাস্তলের গোড়া
বানের উপর বান দিয়েছে সহস্রজোড়া
কপিকলে কল বুলায়ে
টানছে তিনজন গুণারী।

এই তিনজন গুণারী অন্য লৌকিক গানে সত্ত্ব রজ তম আর হাড়িরামের গানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। এরপরে গানের শেষ অংশে বলা হয়:

মানবতরী চাম দিয়ে ছাওয়া
আড়ে দীঘে চোদ্দপোয়া
তার ভিতর হাওয়া।

ভিতরের হাওয়া অর্থাৎ শ্বাস কিন্তু দেহকে সঠিক পথে চালাতে পারে না, কেবল দেহযন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে। সেইজন্য পরিচালনার কাজে চাই আরেকজন:

ভেবে নীলু বলে
হালমাচালে
আছেন রামদীন কাণ্ডারী॥

এবারে চিত্রকল্প সম্পূর্ণতা পেলো। তৈরি হলো একটা চলমানতার প্রতিমা।

কিন্তু চলমানতাই চরম নয়, কেননা সামনে আছে বাধা, ঊর্মিমুখর ভ্রূকুটি।

হলেই বা রাবদীন কাণ্ডারী, তাঁর প্রতি চাই নির্ভরতা, অনন্যশরণ। এবারে আরেক গানে সেই নৌকাযাত্রার বিবরণ :

খবরদার ছেড়োনা বোঠে
কত তুফান যাবে কেটে
এইবার ধরো রামের চরণ চেপে
মন-ডোর দিয়ে বন্ধন।
খানিক সাঁতার খানিক ভড়া
স্রোতে না রেখো খাড়া
বেঁকে গিয়ে হালে মোড়া
কত জোর ধরবে তখন।
হাড়িরাম যার হিয়ায় জাগে
সেকি ডরায় জোয়ার বেগে?
রামনামেতে গাও রে সারি
সারি সদা সর্বক্ষণ॥

এখানেই অভিযানের শেষ পর্ব। সাধকের অন্তরে বলরামের স্থির প্রত্যয়, কণ্ঠে নির্ভয় সারি গান।

হাড়িরাম সম্প্রদায় শেষপর্যন্ত পৌঁছাতে চান এই নির্ভীকতায়। তার প্রয়োজনের নিত্য সাধনা যেন এক তিমির রাতের নৌকাযাত্রা। সামনে উদ্দাম কামের ঢেউ, প্রলোভনের জোয়ার উত্তাল। স্খলিত হলেই পড়তে হবে বোম্বিতনে। তাহ'লেই সামনে আসবে শমন। আর সফল নৌকাযাত্রার শেষে মিলবে নিত্যানের স্বর্ণদ্বার। হাড়িরাম সম্প্রদায়ের গানে সর্বদাই এই আতঙ্ক। দেহ, দেহধর্ম, কাম, বিন্দুক্ষয়, বোম্বিতন আর শমন। শমন মানেই মৃত্যু। মৃত্যু মানে পুনর্জন্ম থেকে বঞ্চিত হওয়া। অথচ হাড়িরাম নিত্যবস্তু 'পূর্বেও হাড়ি পরেও হাড়ি'। তাঁর বিলয় নেই। দিব্যযুগ থেকে সাম্প্রত পর্যন্ত তাঁর জীবনমরণ-ছাপানো মানবলীলা। কে না চায় ভক্তর মত সেই লীলার সাক্ষী হ'তে? তাই আশংকা আর আতঙ্ক মেশানো জীবনের আরেক প্রান্তে থাকে আশ্বাস আর সান্ত্বনা। হাড়িরামকে চিরবন্ধু চিরনির্ভর বলতে পারলেই হ'তে পারা যাবে শমনজয়ী। জন্মান্তরের পর আবার মানবদেহের গঠন পেয়ে ধন্য হওয়া যাবে। এই কথা মনে রেখে এবারে পড়া যাক দীনুর পদ। অহংকৃত আত্মবোধের দর্পিত উচ্চারণে যে পদে বলা হয় :

করি বারণ ওরে শমন আমার কাছে আসিস্ না
তোর আসামী নইরে শমন কেন করিস্ তাড়না ?
ওরে শমন জেনে শুনে তুই কেন এলি এখানে ?
আমার হাড়িরামদীন শুনলে কানে অপমানে বাঁচবি না।
সমস্ত রামপুরবাসী সেখানে নেই নিরেক বেশি
কিবা কমি কিবা বেশি মাল খাজনা মোর লাগে না।
হাড়িরাম ব্রহ্মাণ্ডের রাজা আমি তার খাসের প্রজা
তাড়ন করলে পাবি মজা তোরে রামদীন ছাড়বে না।

ভক্তি ও আত্মসমর্পণ থেকে জাত এই যে সাধকের প্রত্যয়, সব হাড়িরাম-সাধক বোধহয় সেই অভীষ্ট জায়গায় পা রাখতে চান। তখন তাঁরও দীনুর মত বলবার সাহস হয় যে,

যে সুখে বাস করি আমি না করি তো খাসের জমি
খুশিমনে দিবা নিশি করি রাম নাম জপনা।
শোন্‌রে শমন আমার কথা আমার রামদীন জগৎপিতা
হাড়িরামের থাকলে কৃপা তোর ভোগায় আর ভুলবো না।
শোনরে শমন আমার কথা দীনুর নাম উঠবে না তোর লেখা
দ্যাখ্‌গা চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার নাম খুঁজে পাবি না॥

হাড়িরামের ভূমিকা মৃত্যু-প্রতিস্পর্ধী এবং জীবন বিকাশের প্রণোদক।

সেইজন্য হাড়িরামের ভক্ত বিশ্বাসী পদকার দীনু মৃত্যুর প্রতিস্পর্ধী জীবন-বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলতে চান :

দীনু বাঞ্ছা করে সদাই
জন্মে জন্মে রামচরণ পাই
এমনই ক'রে রাম গুণ গাই।

বুঝতে হবে এই জন্মান্তরের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে মর্ত্যজীবনে আসক্ত একজন ভাবুকের। এই সঙ্গে তাঁর আরও বিশ্বাস যে :

দোহাই রামের দোহাই।
করে সাপিনী বাঘিনী রামনামের ধ্বনি—
মহাকাল নাগিনী ফণা ধরে॥

হাড়িরামের ভুবনে মানুষের সঙ্গে মহাকাল নাগিনীর এই সম্মেলক কিছু আশ্চর্যজনক নয়। সে-স্তরে হাড়িরামের অনুচরদের ঘোরাফেরা সেই স্তরের

মানুষজন খেটে-খাওয়া দীন দলিত ও তৃণমূল জীবনের গভীরে চলাফেরা করে। সেখানে আজও রয়ে গেছে কুসংস্কার, মন্ত্রশক্তি, ঝাড়ফুঁক ও নখদর্পণের মায়াবী অন্তর্বয়নের কৌম বিস্তার। লক্ষ করলে আজও দেখা যাবে, গহন জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে সাপুড়ে বাজিকর-বেদে বিষধর সাপ ধরবার আগে আউড়ে নেয় খুব গাঢ় বিশ্বাসে: 'কালনাগিনী ধরা পড়ে কার বলে? হাড়িরামের বলে'। কোটি সমুদ্র গভীর অপার হাড়িরামের নাম এই ভাবেই পায় আচরণের লোকায়তিক তুচ্ছতা। একই গ্রামে বাস ক'রে অন্তত্তর বৈশ্য ও শূদ্রসমাজ পল্লীপ্রান্তের অন্ত্যেবাসী হাড়িভক্তদের সাধনভজনকে হীনার্থে চিহ্নিত ক'রে বলেন, 'ওসব হাড়িরামদের ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে মেলে না'।

তবু এখনও মেহেরপুরের মালোপাড়ায় হাড়িরামের চত্বরে আর নিশ্চিন্তপুরের বেলতলায় তাঁর নামে সেবাপূজা হয়। আশ্চর্য আর এক প্রসারণে হাড়িরামের নাম আর সম্প্রদায় ছড়িয়ে পড়ে তার উদ্ভবস্থল থেকে অনেকদূরে। সুদূর বাঁকুড়ার শালুনি গ্রামে, পকেকোটের পাহাড়ী জঙ্গলে আর দৈকিয়ারির বাউড়িদের মধ্যে নতুন ক'রে রটে যায় হাড়িরামের ঐশী মহিমার খবর। তাদের অন্তর্জগতে আলোকবর্তিকার মত জ্বলে থাকে আরেক সম্পূর্ণ নদীর স্মৃতি। মেহেরপুরের আশ্রম থেকে মড়ুয়াভোলা অপহৃত হলেও নিশ্চিন্তপুরের মড়ুয়াভোলা টিঁকে থাকে। তাতেই হয় তেলজল সেবা মধ্যদিনে। সাঁঝসন্ধ্যায় তাঁর স্মরণে প্রদীপ জ্বালেন বিশ্বাসী ভক্ত। বৃন্দাবন হালদার প্রয়াত হয়েছেন, রাধারাণী রোগজর্জর। পূর্ণ-বিপ্র-চারু সকলেই বয়োবৃদ্ধ এবং বিদায় নিয়েছেন। মুখে মুখে তেমন ক'রে কে আর বলতে পারবেন সৃষ্টিতত্ত্বের অনুপুঙ্খ? কে আর গাইতে পারবেন সমস্ত রাত ধ'রে হাড়িরামের মহিমা গান? যে জায়গার নাম নিশ্চিন্তপুর সেখানেও কি তবে দেখা দেবে অস্বস্তিকর অনিশ্চিতি?

আবার অন্য ভাবনা থেকে আরেকটা কথা মনে হয়। নির্মোহ ইতিহাসের দৃষ্টিতে কিংবা বীক্ষণশীল সমাজবিজ্ঞানীর অন্তশ্চেতনায় উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের প্রসারণ থেকে ক্রমপতনের রেখা যখন স্পষ্ট হয় তখন মনে হয় করুণ এবং সুনিশ্চিত আত্ম-নিঃশেষই বুঝিবা এর নিয়তি। কেননা প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ ছিল যে-ধর্মসম্প্রদায়ের প্রস্তাবনা, পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশে সেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের তেমন আর প্রয়োজন থাকে না। প্রতিবাদ কেন? কারই বা বিরুদ্ধে? সমাজ বিবর্তনের এই নির্মম গতিশীলতায়

তর্ক তত্ত্ব কত মতবাদই তো এইভাবে তলিয়ে গেছে আর নির্বিকার সংকল্পবিমুখ জীবনস্রোত এগিয়ে গেছে নতুন ভাবনার স্পন্দে। সেই অভ্রান্ত নিয়মেই হাড়িরাম সম্প্রদায়কে একদিন মেনে নিতে হবে স্মৃতির শাসন আর কিংবদন্তীর আশ্রয়। জলের ছুঁচ আর পবনের সুতো দিয়ে অলৌকিক সীবনে থেকে যাবে শুধু এক আশ্চর্য জীবনশিল্প।

বাংলার বেশির ভাগ লৌকিক গৌণধর্মের মত বলাহাড়ি সম্প্রদায়েরও আত্ম-উন্মোচনের একটি উপায় হলো গান। গানের ভিতর দিয়েই তাঁদের অপ্রতিম ধর্মের ভাবসত্য সবচেয়ে সাবলীলভাবে বোঝা সম্ভব। সেইজন্য গত পনেরো বছরে তাঁদের অন্তত তিনশো গান সংগ্রহ ক'রে, সেগুলি শুনে, বুঝে, প্রাসঙ্গিকতা বিচার ক'রে, এখানে সংকলিত হলো নির্বাচিত কিছু গান। গানগুলির সুরের কাঠামো সবসময় সঠিক ভাবে রেখে গাইবার মত দীক্ষিত গায়ক এ-সম্প্রদায়ে এখনই বিরল। এ সব গান সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্নভাবে, অনেকটা ছড়ানো সময় ধ'রে, নানা অঞ্চল ঘুরে। তারমধ্যে প্রধান হলো নিশ্চিন্তপুর, ধাওয়াপাড়া ও মেহেরপুর। বাঁকুড়ায় শালুনি গ্রাম এবং পুরুলিয়ার দৈকিয়ারি থেকেও গান পাওয়া গেছে।

এখানে গানগুলির বিন্যাসে কোন বিষয়গত বা ভাবগত পর্যায় মান্য করা হয়নি। গীতিকারদের নামেই গানগুলি পরপর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংকলিত গানের মধ্যে বেশ কিছুর গীতিরূপ, সুরের ধরন ও গাইবার রীতি ধরা আছে ক্যাসেটে। সংগীতমনস্কদের মধ্যে যদি কেউ উৎসাহিত হন এই বিশেষ গানের ধরন জানতে সেই কথা ভেবে সংকলনের শেষে সংযোজিত হলো একটি গানের স্বরলিপি। স্বরলিপি প্রণয়ন করেছেন বন্ধু শ্রীতরুণকান্তি সেন। সাধারণভাবে এই সম্প্রদায়ের গায়করা গান করেন একতারা ও গ্রাম্য তালবাদ্য নিয়ে। ক্বচিৎ খোল এবং হার্মোনিয়মের ব্যবহারও দেখেছি। শেষপর্যন্ত অবশ্য বলে নেওয়া উচিত যে বেশিরভাগ লোকধর্মের গানের মত বলাহাড়িদের গানও সুরের চেয়ে ভাবের মূল্যেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রজমন্নীর নামে প্রচলিত পদ

১

কিঞ্চিৎ করিও তুমি রসনা এই উপকার ॥
নিদান সংসারকালে,
প্রাণ সংশয়কালে
রাম নাম বল বারে বার ॥
শুনে বড় লাগে ভয় কম্পিত জীবন
তোরে নাকি যেতে হবে শমন ভবন
সেই সেই দুর্গম পথে
অগাধ সলিল তাতে
কি আছে সম্বল সাথে
পাপে তনু-তরী ভার ॥
যখন আমি করিতাম অর্থ উপার্জন
আদর করিয়ে সবে করিত যতন
এক্ষণে হয়েছি জরা
নিজের সে সামর্থ্য হারা
ভাই বন্ধু সুত দারা
সবে করি তিরস্কার ।
দেহ ছেড়ে প্রাণ আমার যাইবে যখন
সবে বলবে কর্তা চললে কোথায় রেখে বিষয় ধন ।

তারা বিষয়ের করবে আশা,
কেউ দেখবে না আমার দশা
সেদিন জানা যাবে ভালবাসা
কিবা পুত্র পরিবার ॥
নিদান সংশয় আমার হইবে যখন
দারা পুত্র তারা সেদিন করিবে রোদন
কেঁদে হবে লণ্ডভণ্ড
কেউ রাখবে না একদণ্ড
যেদিন আঁধার হবে এ ব্রহ্মাণ্ড
কেঁদে কণ্ঠ হবে ভার ॥
কেঁদে ব্রহ্ম মায়ে বলে
রাম নাম থেকো না ভুলে
এই রামনাম শুনাবো এই কর্ণমূলে
আমি তোমায় দিলাম ভার ॥

দুদ্দুর পদ

২

আমার এ তরী বানালে অতি যত্নে।
শনিবার যাত্রা ক'রে
তরীর গঠন দরিয়ার মাঝখানে ॥
আনর টিপনে আড় চাপা ডালে জোড়া
তক্তা ছয় খানি
মাল ডহরা রেখেছেন খালি
কারিকর মনেরই সন্ধানে।
কত জলুই পেরেক লাগিয়েছে বাঁক
হেকমতের গুণে ॥
গাঁদ কেটে জাঁত লাগিয়েছে কষে
বানে বান গেছে মিশে
জল ঝরে ডহরার দুই পাশে
আমি তাই ভাবছি বসে বসে।
এর দিক নিরূপণ
কর দেখি মন
আপনার ধড় জেনে ॥
চন্দ্র আদি দিবা মূলাধার
তার ত্রিগুণ সঞ্চার
চোদ্দ পোয়ায় গঠন সারা তার
কারিকর গড়েছে যতনে
খেদে দুদ্দু বলে দিব্য জ্ঞানে
ঐ চরণ পড়ে আমার মনে

৩

ছাড় অন্ধ খেলাখেলি
চাড়িরামের চরণদুটি
যে জেনেছে খাঁটি
তারেই হাতের লাঠি
হবেন অর্ধশশী ॥
সতের সঙ্গ কর, অসৎ সঙ্গ যাবে
তবেই চাড়িরামের তত্ত্ব জানা হবে।
তা নইলে এই ভবে কত কষ্ট পাবে
কর বন্ধন করিবে শমনের দূত আসি ॥
যদি বল করবে তীর্থ পর্যটন
ভেবে দেখ মন, সে সব অকারণ
সবতীর্থের ফল রামদীনের চরণ
ভাব যদি মন
তোর কাজ কি গয়াকাশী ॥
ভাবিলে ভাবনা সকল দূরে যায়
মনের সুখে পঞ্চম সুরে মৃত্যুঞ্জয়
রাম গুণ গায়
শুনে প্রাণ জুড়ায়
চরণ পাবার আশে হলেন শ্মশানবাসী ॥
শ্রীমন্ত কহিছে শুনরে চন্দ্র শুন
তিনি তারক ব্রহ্মরাম বিপদ ভঞ্জন
ভক্তিভাবে ডাক সদা সর্বক্ষণ
ভক্তি থাকিলে মুক্তি হবে রে তোর দাসী ॥

সদানন্দের পদ

৪

এবার আপনার খবর আপনি জানরে মন।
মানুষ কোথায় আছে কর নিরীক্ষণ॥
আমি আমি সবাই বলে
আমি কে চেন গা তারে
তার করগা অন্বেষণ।
এমন মানব জনম পাবি যদি
ধরগা হাড়িরামের ঐ চরণ॥
লোকমধ্যে যদি মানুষ হারা হয়
তারে খুঁজেও পাওয়া যায়
আপনি হারা হলে পরে
কোথায় পাওয়া যায়
আপনাকে আপনি হতেছ হারা
খুঁজে কর গা তার অন্বেষণ॥
এই দেহেতে চোদ্দ কোঠা
যেমন শোলার পাখী করগো কথা
শতেক হাড়ে পিঁজরাটা গাঁথা
হাওয়া বল্ ছাড়া এ কল রবে গো পড়ে,
শুধু খাঁচায় কথা কবে না তোর
সদানন্দ ভাবছে বসে
কি করবি মন শেষে
ও তার করগা অন্বেষণ

এমন মানব জনম
পাবি যদি ধরগা হাড়িরামের ঐ চরণ ॥

৫

শুধু মুখের কথা বলে ভবনদী কে হয়েছে পার ?
এবার দিন গেল হোর গোলেমালে
হল আসা যাওয়া সার ॥
দেখরে তোর গেল বেলা
হাড়িরাম নামেতে বাঁধো ভেলা
ঘুচে যাবে ভবজ্বালা তুই পাইবি নিস্তার ॥
হাড়িরামের বিচার আঁটা
মেহেরপুরে হও রে গোটা
ভাব না জেনে কৌপিন আঁটা
গোপী ব্যবহার ॥
এইবার জীবে কর স্থিতি
তবে হবে ভাব প্রকৃতি
ঘুচে যাবে পুরুষ আত্তি
হবে যাবি পার ॥
সদানন্দ ভাবছে বসে
কি হবে ঐ পারের ঘাটে
ওপারের মাশুল নাইকো সাথে
কিসে হবি পার ॥

৬

বল্ হাওলাতে কয়ছে কথা
ও মন আলেক লতা
আমায় ছেড়ে যাও কোথায় ।
দেহের করব যতন
বিরাজ করেন মানুষ রতন
তাহে বাদী রিপু ছজন

তার ছজন রিপু দমন হবে
হস্তির উপর মাহুত যেমন
অঙ্কুশ পেলে হয় খাড়া।
লাল জরদ শ্বেত পীত
ষড় দলে বিকশিত
যায় সমুদ্রেতে
সে তো করে টলমল শতদল সহস্র দল
আলেক মানুষ বিরাজ করে সেই মানুষে
নিহার রেখে নিমাই চাঁদ মুড়াষ মাথা ॥
সাত দরজার কপাট এঁটে
খিড়কী দ্বার আলগা রেখে
মন প্রাণকে চৌকি রেখে
তুমি যাও কোথায়
কখন যাও কখন আসো স্বপনেতে চমকে উঠ
আজগুবী কারখানা দেখ কার সঙ্গেতে কও কথা।
মেহেরপুরকে সত্য বলি
হাড়িরামের কথায় চলি
এই দেহে চৌষট্টি কোটি কর নিরীক্ষণ—
সদানন্দ ভাবছে বসে
যেতে হবে মিশে
নব দরজায় বারাম দিয়ে
পাবার বেলায় উর্দ্ধদ্বার খোলা ॥

৭

এই মানুষে মানুষে মিশেছে
তারে চিনে নিতে হয়েছে।
দশ ইন্দ্রিয় রিপু ছজন
পঞ্চ আত্মা সঙ্গে মিলন
তারা দেহে বসে রয়েছে।

আগুন জল মাটি হাওয়া
দেহের মধ্যস্থলে রয়েছে ।
প্রাণ দারোগা দেহ থানা থানী
মন দক্ষ চৌকিদারী
দেখ এ মাল যায় না চুরি
এ মাল চুরি গেলে শমন জেলে
জবাব দিবি তুই কিসে ?
চারযুগে চার অবতারে
ভবের ভিতরে
মানুষ মেলে
এবার মন থেকো না ভুলে
এই ভাণ্ডার মানিক কারিকর
দেহে ঢেকে রেখেছে ।
[illegible] যদি থাকে [illegible]
পাবে কিছু [illegible] মিলে
মন থেকো না ভুলে
[illegible] [illegible] পরে
এ [illegible] পাবে কিসে ।

৮

[illegible] এক [illegible] নিরঞ্জন [illegible]
বল ভাই শুনে অরূপ কথা ।
হাক্কি রামদীন সৃষ্টি কর্তা
পালক পিতা
শুনতে পেলাম তারই কথা
কথা সত্য বটে নয়কো মিথ্যা ।
হাক্কি রামদীন সৃষ্টি করে
সৃষ্টি করে শক্তির পরে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে
আছে এই তিনতারে জগৎ গাঁথা ।

সদা বলে শুনরে হরি,
রামদীন আছেন পার কাণ্ডারী
বল বিনে চলে না তরী
রামের ওই চরণে রেখো মাথা॥
যথা পূর্ব তথা পরে
উদয় হলেন মেহেরপুরে
হাড়ীরামের নামটি ধরে
চরণ সেধেছিল যাতা॥

৯

রসনা, বল রাম নারায়ণ।
এমন পেয়ে মানব দুর্লভ জনম
দিন গেল রে অকারণ।
[illegible] যুগে সে হরি
[illegible] যুগে বলিহারী
[illegible] যুগে সর্বহারী
[illegible] যুগে পূর্ণব্রহ্ম
কলিযুগে সেই হাড়িরাম
প্রকাশ করলেন [illegible] নিজ নাম
মেহেরপুরে [illegible] নিজ ধাম
দেখলে জুড়ায় দু নয়ন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি
হাড়িরামদীন মহাবলী
ভক্তে করে কৃতাঞ্জলি
এই চরণে দিও স্থান।
যে চরণের লাগি
যোগী মহাদেব হন সর্বত্যাগী
গৌর হলেন অনুরাগী
করতে সেই রূপ নিরূপণ॥
ধর্ম কর্ম দুঃখ শোক

তার দিনে দিনে বাড়ে রোগ
কুপথ্য দু ভজনে
হাড়িরামদীন বল রে ভাই
মরিলে প্রাণ দান পায়
জন্মে জন্মে রাম চরণ পাই
সদা করে এই প্রার্থনা ॥

১০

আবার কবে বলবি রামনাম তাই বল দেখি রে মন।
দিনে দিনে দিন ফুরাল হলি নে চেতন ॥
চেতন হয়ে বল রাম নাম
হবে বলা হবে রামনাম
বদন ভরে বল রামনাম
বাঁচ যতক্ষণ ॥
ভবে এসে কি করিলি
বিষয় লোভে ভুলে রহিলি
অভয়পদ না ভাবিলি
থাকলি অচেতন ॥
যথা পূর্ব তথা পরে
দেখ তোমরা বিচার করে
হাড়ীরাম নামটি ধরে
জীবে করিল চেতন ॥
সদানন্দ বলে ক্ষেপা
হলি নে তুই কাজে ক্ষেপা
ক্ষেপার বাপ হারালি ক্ষেপা
জনমের মতন ॥

১১

হাড়ি রামদীন সেই কারিগর রয়েছে সতত।
তিনি আসর দরিয়ার ঘর বানায়ে
ত্রিজগতের নেয় খবর ॥

হাড় হাড্ডির খাম খুঁটি দিয়ে
হাড় হাড্ডির চার কোণা জুড়ে
ছাটুনী ক'রে
ঝাড়ঝাড়্ডির পাড় খুতনি উলা ঘর বেঁধেছে আমার কারিগর ॥
সাত পাকে সব একথা ক'রে
ঘর বেঁধেছে তারিপ ক'রে
নব দরজা ক'রে
শুধু ঘরে
কবে না কথা যখন তলব হবে তোর ॥
হাডি রামদীন তুমি বল বুঝি
হেকমৎ ক'রে করলেন সৃষ্টি
বলের হয় শক্তি
তিনি আসমান জমীন তাই বানাবে
আবিভাবে গঠন করে তোর ॥
সদানন্দের এই ভণিতে
রাত্র দিবা কর চিন্তে
রাম নাম পাই শুনতে
তুমি কর চিন্তা রবে না চিন্তা
মনের আঁধার দূরে যাবে তোর ॥

১২

হাডিরাম মানবদেহে বানিয়েছে এক আজব কল।
এই কলের সৃষ্টি বলে করা
বল বিনে চলবে না কল।
এই কলের শতেক তাই জোড়া
মানবদেহে ষড়দল পদ্মে কলের সৃষ্টি
কারিগর ফেলেছে দাঁড়া।
মাপে চোদ্দ পোয়া করা
আব আতস খাক বাত দিয়েছে জোড়া
দমে দমে চলছে এ কল
রসনা ভিতরে থেকে চলছে বল।

এই কলের দুখান চাকা বাঁকা
উপরে রেখেছে দুই পাখা
দুজন কলে চৌকি আছে
দুজন তাই দিচ্ছে পাহারা।
যেমন জলের ভিতরে আগুন
আগুনের ভিতরে সে জল
কারিকরের করা এ কল
মন আমার কখনও তা হয়না অচল॥
এ কলের পাশে চারখানা থাম আছে গো তার
দেখ দেখতে কি বাহার
থামের তিন তার আছে
কারিগর খবর নিচ্ছে তার
মানে না ডাণ্ডা ডহর
কল চলে দিল্লী লাহোর
হাড়িরাম কলমিস্ত্রী হেকমতে চালাচ্ছে কল॥
কারিগর হেকমত করে
আমি বলব কি তারে
কতশত প্যাঁচ বসালে আমার এই কলের ভিতরে।
কোন প্যাঁচে উঠায় বসায়
কোন প্যাঁচে চলায় বলায়
কোন প্যাঁচ কারিগরের হাতে কখন টিপ দিয়ে বন্ধ করবে কল॥
এ কলের কারিগর কোথায়
আমি বলব কি গো তায়
আলেকেতে বিরাজ করে যে মেহেরবাজ শুনতে পায়
সদানন্দ ভেবে বলে হাড়িরায় চরণতলে দিও স্থল॥

১৩

হাড়িরামদীন মানবদেহ গঠন করে গো
পাঠায়েছে এ সংসারে।

এবার কুসঙ্গ কুপাকে প'ড়ে
চিনলাম না সেই কারিগরে ॥
ওরে আমিও যায়
সকলে তায়
ভেবে দেখো যে জন সৃষ্টি করে ।
কেবল আমার আমার আমার ব'লে
দখল করে জীব দিনান্তরে
কাল নিদ্রা এসে ভুলায় যখন তখন দখল তোমার
আর কে করে গো আর কে করে ॥
আমার জীবন নিশির স্বপন,
পদ্মপত্রে জল টলমল করে
রামদীন আলেক পতি,
জীবের গতি
অভয়চরণ দেন গো যারে ॥
জলের সুঁই পবনের সুতো
গড়লেন দেহ সেলাই ক'রে
দিলেন পঞ্চপদ্ম
বত্রিশ দন্ত
হস্ত পদ কর্ণ নাসা করে ॥
সদানন্দ ভেবে বলে
এইবার চল মন মেহেরপুরে
নিলে রামের স্মরণ
হয় না মরণ
রামদীন চরণ দেন গো যারে ॥

১৪

হাড়িরাম নাম বলো
দিন ফুরালো
এমন দিন আর হবে না ॥

এমন মানব জনম পেয়ে

রামতত্ত্ব ছেড়ে

কোন পথে যাবা বল না ॥

এসেছ এই ভবে

কি লাভ তোর হবে

হিসাব করে কেন দেখ না ॥

করতে এলি সাধুসঙ্গ

করলি রসরঙ্গ

ভক্তি পথে ভঙ্গ দিও না ॥

তারে কেউ বলে শ্লেচ্ছ কেউ বলে দাড়ী

তিনি তারকব্রহ্ম রাম সারঙ্গধারী

আহা মরি মরি

কি নামের মাধুরী

চরণ ছাড়া যেন করো না ॥

ভক্তি ভাবে তিনি চণ্ডালের হয়

অভক্তিতে তিনি ব্রাহ্মণের নয়

সে যে বড় দয়াময়

দয়ার সীমা নাই

অধম ব'লে হেলা করো না ॥

সদানন্দ বলে শুন শুন হরি

তিনি তারকব্রহ্ম রাম আনন্দবিহারী

যদি যাবা ভবপারে

সদাই ডাক ওরে

কারও কথায় যেন ভুলো না ॥

১৫

হাড়িরাম তত্ত্ব নিগূঢ় অর্থ বেদবেদান্ত ছাড়া।

করে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য সেই পেয়েছে ধরা ॥

সেই তত্ত্ব জেনে শিব শ্মশানবাসী

সেই তত্ত্ব জেনে শচীর গোরা নিমাই সন্ন্যাসী।

(ও) সেই ত্যজে মাতাপিতা সোনার বিষ্ণুপ্রিয়া,
তার দু নয়নে বয় ধারা ॥
চতুর্বেদ আর চোদ্দশাস্ত্র কয়
দেখো তার উপরে মানুষলীলা করেছেন গোসাই।
তিনি আবির্ভাবে সর্বজীবে বল হাওয়া,
আছে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া ॥
হাড়িরামের তত্ত্ব যে ধরে
এবার হিসাব দিতে যেতে হবে ঐ মেহেরপুরে
বলরামদীন যারে কৃপা করে
ভবে জন্মে পাবে ঐ ধারা ॥
সদানন্দ বলে রে হরি
যে হাড়ির ঝি হৈমাবতী সেও তো এই হাড়ী
তিনি হাড় হাড্ডির থাম খুঁটি দিয়ে
চাম দিয়ে আছে ঘেরা ॥

১৬

আমার হাড়িরামের চরণ কৃপাতে
মিলে সব জাতে ॥
ও তার শুদ্ধ আচার
সত্য বিচার
ভাইরে তা দেখলাম সাধুসঙ্গেতে ॥
তিনি এক ব্রহ্ম সারাৎসার
সর্বঘটে জ্যোতি তার
রামদীন জানালেন এইবার
তার সর্বজীবে সমান দয়া ভাইরে
তাতো দেখলাম চৈতন্যের হাটে ॥
হাড়িরাম নিত্য কারিগর
গঠন করেছে আমার
কিন্তু যে ভাবে হয় তার

সেইভাবে ভাবে যেতে হবে ভাইরে
ভাব ছাড়া লাভ নাই সে পথে ॥
ভব জলে পাক অন্ন
ভেদ নাই ছত্রিশ বর্ণ
এ সংসারে আর কে পারে হাড়িরাম ভিন্ন
দেখ সে যে ব্যাসের কলম নাইকো মালম ভাইরে
তা তো দেখলাম মেহেরপুরেতে ॥
বিচার করেছেন ভাল
শুনে কর্ণ জুড়াল
মুখে হাড়িরাম বল
এবার সেই বিচারে ঠেকে গেলাম
ভাইরে পারলাম না হাত ছাড়াতে ॥
হরি ভাবছে নিরন্তর
গতি কি হবে আমার
আমি অধম দুরাচার
সদানন্দ বলে হরি ভয় কি আছে আর
হাড়িরাম এসেছেন জীব তরাতে ॥

১৭

চল গো যাই ভবপারে হাড়িরাম ব'লে।
কেশে ধ'রে এই হাড়িরাম নিচ্ছে সব নায়ে তুলে ॥
ভবপারে যাব ব'লে
দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে
হাড়িরামের কৃপা যাকে সেই তো ভবে পার পেলে ॥
ভব পারাবারে যেতে
সম্বল কি আছে সাথে
হাড়িরামের চরণ পেলে,
কাজ কি আমার ছার কুলে ॥
এ ভব সমুদ্র ভারী.

ভাঙা নায়ে দিচ্ছে পাড়ি
বলিহারী দর্পহারী দিয়েছে বাদাবকূলে ॥
সদানন্দ বলে হরি
রামনামে কি মাধুরী
এসো রে ভাই তাড়াতাড়ি,
পিছিও না গোলেমালে ॥

নীলুর গান

১৮

মানসিক নিলে একবার চমৎকার ।
নিত্যলীলে করলে কতবার ॥
শুনে যায় বলিহারী
তিনি পূর্বে যেই হাড়ী
বলিহারী দর্পহারী
পরেও সেই হাড়ি
হাঘরি শক্তিতে এল অধমতারণ নামটি তার ॥
এমন লীলে কভু দেখি নাই
লীলে করলে অবু´ সাঁই
যোগী যবান ছয় ছত্রিশ জাত
করেন একটি ঠাঁই
কত পণ্ডিত এসে ভ্রান্ত হল দেখে এই যাচক বিচার ॥
তব জলে পাক অন্ন
ভেদ নাই ছত্রিশ বর্ণ
এ সংসারে আর কে পারে হাড়িরাম ভিন্ন
তোর ব্যাসের কলম নাইকো মালুম
আমরা দেখলাম একাকার ॥
নীলু করে নিবেদন
তোমরা শোন মর্মীগণ
অন্তিম কালে রামদীন বলে করাও স্মরণ
আমার কথায় কসুর কাজে কসুর
আমি কিরূপে পাব নিস্তার ॥

১৯

মানুষী লীলা এইবার চমৎকার।
এমন নিত্যলীলা করলে কতবার ॥
এমন কভু দেখি নাই
যে লীলা করলেন গোঁসাই
যুগী যবন ছয় ছত্রিশ জাত এসে
করলে একই ঠাঁই
কত পণ্ডিত এসে হলো ভ্রান্ত
দেখে এই বাচক বিচার ॥
গুণের যাই বলিহারী
তিনি পূর্বে সেই হাড়ী
বলিহারি দর্পহারী পরেও সেই হাড়ি
হাবড়ি সহিত এলো অধমতারণ নামটি তার ॥
নীলু করে নিবেদন
শোনো শোনো মমিকগণ
অন্তিমকালে রামদীন বলে যেন
করি গো স্মরণ
আমার কথায় কসুর কাজে কসুর
আমি কিরূপে পাবো নিস্তার।*

২০

যার এলাহী বারাম দিয়েছে
সুখের মেহের এসেছে ॥
জীবের মুক্তি পাবার জন্যে এসেছে অবণো
ঐ দেখ পাঁচ পঞ্জাতন তার চরণে সেটেছে ॥
হাড়ি আল্লার নাম মুখে বল বারে বারে
অনায়াসে তরে যাবা ভবপারে
শমনের ভয় কিরে
তার নামটি হাড়ি আল্লা

---

* পাঠান্তর

আয়েরে বিলবিল্লা
এবার এই নাম দিল্লা
কই তোদের কাছে ।
হাড়িরামের আজব লীলা বোঝে সাধ্য কার
আপনার ভক্তি আপনি বোঝা ভার
জীবের লাগে চমৎকার ।
নীলু কহিছে কাতরে
হাড়ি আমার কৃপার জোরে
ঐ দেখ নিত্যানন্দ সত্য উদয় হয়েছে ।

১

মনমোহন রামদীন দয়াময়
তারে ভক্তিভাবে জানতে হয় ।
তিনি আপনারেতে
হিসাব নিয়ে
মেহেরপুরে হন উদয় ।
এক ব্রহ্ম দুইয়ে নাস্তি হয়
তিনি সবজীবের জীবনকর্তা সবঘটে রয়
তার করণ ভারী নিদকারী রে
করণ শুনলে জীবের লাগে ভয় ।
হাড়ি রামদীন সৃষ্টি করেছেন
তিনি আবির্ভাবে এই সংসারে বলে বলাইছেন
তিনি বলে বলায়
চলে চালায় রে
দেহের বল গেলে কল পড়ে রয় ।।
রাম নামেতে তরে যায়গো জীব
কোনদিন আঁধার হবে
নিভে যাবে এ ঘরের প্রদীপ ।
তাইতে রামনাম বলতে বলি রে
রামনাম বললে তাপিত প্রাণ জুড়ায় ।।

চোদ্দ পোয়ার গঠন সারা তার
তিনি শুকলো ডাঙায়
চালায় তরী আজব চমৎকার
নীলু জেবে বলে
বললো কারে রে তার রূপে ভুবন আলো হয় ॥

২২

আজব কলে বানিয়েছে তরী
গড়নদার হাড়ি রামদীন মিস্ত্রী ॥
শোণিত শুক্রর তরীর গঠন
চার চিজে চার তক্তা দিয়ে করলে পাটাতন
তরী পবন ভরে আপনি চলে
কিবা তার কারিকুরি ॥
মানবতরী মাস্তুলের গোড়া
বানের উপর বান দিয়েছে সহস্র জোড়া
কপিকলে কল ঝুলায়ে টানছে তিনজন গুণারী ॥
মানবতরী চাম দিয়ে ছাওয়া
আড়ে দীঘে চোদ্দ পোয়া
তার ভিতর হাওয়া
জেবে নীলু বলে হালমাচালে
আছেন রামদীন কাণ্ডারী ॥

২৩

রাম নাম বল মন রসনা।
রাম নাম সুধাপান
করে পরিত্রাণ
বিষপান করে বিশ্বনাথ মলো না ॥
এক প্রমাণ আমি বেদপুরাণে শুনি
মহাপাপের পাপী ছিল অজামিল
রাম নারায়ণ বলে পাপী মুক্তি পেলে
শেষে গেল গো তার যমযন্ত্রণা ॥

রামনামেতে সদাই ছাড় রে জিগিরি
যে বলেতে কৃষ্ণ ধরেছিলেন গিরি
গিরি গোবর্ধন করিয়ে ধারণ
গোকুল বৃন্দাবনে রেখেছেন গোপদল ॥
দীনু বলে রামের আজব নিত্য লীলা
বুঝবে কে তার খেলা
জলে ডোবে শোলা
নামে শমন জ্বালা
দূরে যায় থাকে না ॥

২৪

এই ব্রহ্মাণ্ডে রামনামে পাপখণ্ড শত দণ্ডে দণ্ডে রাম নারায়ণ ॥
ও যে জানবে নিগূঢ় ভাব
তারই হবে লাভ
জানলে তত্ত্ব হবে অর্থ উপার্জন ॥
এক প্রমাণ আমি রামায়ণে শুনি
মহাপাপী ছিল অহল্যা পাষাণী
পাষাণ মানব করে বনের ভিতরে
দিয়ে রামদীন তারে অভয়চরণ ॥
আর এক প্রমাণ ধ্রুব গিয়ে বনান্তরে
পদ্মপলাশলোচন ব'লে ডাকেন বারে বারে
ধ্রুব ভক্তিভাবে ডাকায় রামদীন করলেন কৃপা
ভক্তি বাঁকা হলে দিলেন দরশন ॥
আর এক প্রমাণ প্রহ্লাদ পড়ে হস্তির পদে
কোথায় আছ গো রাম আমায় রাখ বা বিপদে
তোমায় পদের পদার্থ জানালেন তাই সত্য
তর্ক করার কি আছে প্রয়োজন ॥
সাধে কি ঐ চরণ করি গো প্রার্থনা
যে চরণ স্পর্শে হয় কাঠের তরী সোনা
তাই জানলে জানা শোনা তত্ত্ব উপাসনা
দীনুর যমযন্ত্রণা করবেন নিবারণ ॥

২৫

হাড়িরামের নাম পেয়েছ ভুলো না।
পেয়েছ মানব জনম, দুর্লভ জনম এমন জনম হবে না॥
যে নামে শিব শ্মশানবাসী
সেই নামে নিমাই সন্ন্যাসী
সর্বদা নদে আসি
করে রাম নাম যাপনা।
কত মুনিঋষি যোগ তাপসী ধ্যানে জানতে পারলে না॥
হাড়িরাম অগতির গতি
তিনি সৃষ্টির প্রলয় করেন স্থিতি
যা করেন হয় আকৃতি
সাকৃতি যন্ত্রণা।
ঐ নাম প্রহ্লাদ জপে দণ্ডে দণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে মলো না॥
হাড়িরামের অভয় চরণ,
সে চরণ করলে স্মরণ
হয় না মরণ
ঐ পদে রেখে নয়ন
কর আরাধনা।
নীলু বলে রামনাম নিলে যমযন্ত্রণা থাকবে না॥

২৬

হাড়িরাম তত্ত্ব কি সবাই জানে।
রামের গুণের কথা শোন গো কানে॥
মলয় পর্বত বিনে
চন্দন হয় কি অন্য বনে
প্রেমের প্রেমিক যারা
জানে তারা
তারাই আছে আরাধনে॥

কোকিল কুৎসিত পাখী তার স্বরে প্রাণ হরে কেনে।
রামপদে মতি না থাকলে কি করবে তার রূপ-যৌবনে॥
রামনামেতে প্রেমে বাঁধা লক্ষ্মণ ছিল তত্ত্ব জেনে।
হয়ে দ্বারের দ্বারী অনাহারী চোদ্দ বৎসর ফেরে বনে॥
দাস হয়ে প্রার্থনা করে
ব্যক্ত আছে ত্রিসংসারে
পুরাণে আছে লেখা নয়কো মিছে
প্রহ্লাদ বাঁচে হুতাশনে॥
হয়গো যে জন প্রেমের প্রেমী জগৎস্বামী
তারাই চেনে আছে কোন প্রেমেতে কোন পদার্থ
নীলু সে সব তত্ত্বহীনে॥

২৭

লাড়িরাম চিনতে পারে কে তোমারে॥
তুমি সার উদ্ধার
ভবের কাণ্ডার
যারে কর পার
সেই যাবে পারে॥
তোমার ঐ চরণ জীবের ধ্যানজ্ঞান
দিব্যজ্ঞানে তোমায় যে করে স্মরণ—
দিয়ে অভয় দান
কর পরিত্রাণ
বিপদে সম্পদে রাখ গো তারে॥
তুমি হও ঐশ্বর্য
তুমি হও মাধুর্য
দুষ্ট দমন কর বিচার তোমার কার্য্য
দেখে নিত্য কার্য
ব্রহ্মা করেন পূজা
সেই ব্রহ্মপুরে॥

মুনির মন হয় পয়দা কলমদার
পদ বেয়ে তোমার গঙ্গা হয় প্রচার।
চিনতে পারা তার
চেনে সাধ্য কার
জানেন মহেশ্বর
অতি দুষ্করে।
রামদীন তুমি নিত্য পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের পতি
তোমা ভিন্ন জীবের নাইকো অন্য গতি
সৃষ্টির কর স্থিতি
ওহে পিতাপতি
নীলুর এই দুর্গতি
আর জানাই কারে॥

২৮

হাড়িরাম কৃপা ক'রে এই পামরে
ভুলাইলেন মায়াজালে।
নইলে মোর মানবজনম দুর্লভজনম
এ জনম গেল বিফলে॥
আমি এই ভবে এসে রঙ্গরসে
তব চরণ রইলাম ভুলে
যগুপি ভুলেও থাকি তাই বলে কি
ফাঁকি দেবে অধম ব'লে?
তোমার নাম অধমতারণ পতিতপাবন
অভয় চরণ যদি মেলে।
ঐ নামে ক'রে রুচি আশায় আছি
বাঁচি তোমার কৃপা বলে॥
হাড়িরাম পাপীর পক্ষে কর রক্ষে
চক্ষে দেখলে সুফল ফলে।
কত যে করেছি পাপ করগো মাপ
মনস্তাপে মলাম জ'লে॥
ভক্ত কভু মরেনা আছে শোনা
পাষাণ বেঁধে দিলে গলে।
রামদীনের পদরেণু পেয়ে দীনু
যত্নে রাখে হৃদ্ কমলে॥

২৯

চিরদিন কাঁচা বাঁশের খাঁচা থাকবে না।
পাখি যাবে উড়ে থাকবে পড়ে
হাড়িরামের নাম ভুলোনা॥

আছে বহুৎ জোড়া নয়টি কোঠা
কারিগরের গড়না।
খাঁচার উত্তম সাজ কি খাসা কাজ
এমন কাজ কেউ পারবে না॥
খাঁচার ভিত্‌রি কোঠা মণি আঁটা
রূপের ছটা দেখনা।
তার ভিতর থেকে উড়ে গেল
অধর পাখি চন্দনা॥
কোন্ পাখি দিবে ফাঁকি
সদাই মনে ভাবনা।
ভক্তিভাবে যে জন পাবে
তারই হবে প্রার্থনা॥
ভণিতা দিলে শুনতে পাবা
কোন্ অধীনের রচনা।
দীনু কয় চিন্তে পারলা চিনতে
মোর ভ্রান্তিতে ঘুচলো না॥

৩০

রামদীন অন্তিমকালে কিরূপে দিন যাবে।
এ ভবে এসে হারিয়ে দীনে বেমালুম ভুলে গিয়ে বিষয় লোভে
কান থাকতে শুনতে পাবনা, চোখ থাকতে দেখতে পাব না—
আমার থাকিতে মুখ বাক্য সরবে না॥
যারা আমায় ভালবাসে
তারা শ্মশানবাসে লয়ে যাবে॥
যখন শ্মশানে গড়াবে মাথা কোথায় রবে পিতামাতা।
কোথায় রবে ভাই বন্ধু দারা সুত তারা মায়ার কান্না সবাই কাঁদে
তখন সন্ন্যাসীর বেশ সাজাইবে॥
যখন বিনে হাওয়ায় লাগবে ঢেউ তখন রক্ষা করবেনা কেউ—
পিছে আছে শমনেরি কেউ বারিহীন কাণ্ডারীহীন গো
আমায় সেই নদী পার করতে হবে॥

অধমতারণ নাম শুনেছি, তাইতে চরণ সার করেছি
রামদীন কৃপা করে বাঁচালে বাঁচি দীনু করে এই নিবেদন
মিছে মানব দেহের গৌরব কদিন রবে।

৩১

ছাড় অসৎ সঙ্গ কুটিনাটি।
যেন ভুল না রে মন এবার
হাড়িরামের চরণ ছুটিয়ে চরণ ছুটি ॥
বন্দী হয়ে বন্দী ফাঁদে মায়ার বেড়ী কিসে কাটে।
রামের স্মরণ লয়ে পাষাণ হয়ে
অন্ধ জেনে মন হওরে খাঁটি মন হওরে খাঁটি ॥
হাড়িরামের অভয় চরণ যাবৎ জীবন হাতের লাঠি।
হাতের লাঠি হাতে ক'রে অন্ধকারে খোলসাতে
পথে হাঁটিয়ে পথে হাঁটি ॥
এবার ধররে মন অভয়চরণ বিনে ত্রিভুবন শুকায় টাটি।
আবার ধররে মন অভয় চরণ
তবে হবেরে কর্ম খাঁটিয়ে কর্ম খাঁটি ॥
ব্রজ বলে ওরে দীনে কোনদিন আসবে তোর ডাকের চিঠি
যেদিন আসবে বাঁধবে কসে
তুই কি সেদিন করবি কাঁদাকাটিরে কাঁদাকাটি ॥

৩২

শুধু রাম নামের জোরে গো রাম নামের জোরে।
নইলে হনুমান কি আসতে পারে লঙ্কা দগ্ধ ক'রে
জেনে কত কারিকরে পবনপুত্র চরণ ধরে ॥
রাম আজ্ঞা অনুসারে পরিচর্যা করে
পেয়ে রামের পদ জোড়।
কতশত বানর বলে আমার পাবার সাধ্যরে ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ জানেন কেবল হনুমান।

আর জানেন ত্রিলোচন জানেন বিভীষণ আর জানে দুই এক জনে
শুনেছি পুরাণে হুতাশনে প্রহ্লাদ নাহি মরে ॥
হাড়িরামের নিত্যলীলে দেখবি যদি আয় সকলে
মুখে ডাক রামদীন বলে থেকো না কেউ ভুলে ।
নিত্যলীলে যে দেখরে তাঁরই বিশ্বাস আছে
তার কাছে কি শমন আসতে পারে ॥
দীনু বাঞ্ছা করে সদাই জন্মে জন্মে রামচরণ পাই
এমনি করে রামগুণ গাই ।
দোহাই রামের দোহাই করে সাপিনী রাগিণী
রামনামের ধ্বনি
মহাকাল নাগিনী ফণা ধরে ॥

৩৩

রামের নিত্যলীলা জীবের বোঝা ভার ।
লীলা কেউ কেউ জানে সবায় না জানে
কোটি সমুদ্র গভীর পার ॥
জানলে রামের নিগূঢ় মর্ম, হবে জীবের পুনর্জন্ম—
জেনো নিত্যর এই কর্ম তাওতো জীবে নিলে নারে
(ও) তা শুনলে জীবের হয় চমৎকার ॥
যথাপূর্ব তথা পরে দেখ তোমরা বিচার ক'রে
উদয় হয় হাঘরির ঘরে ।
কৃপা করে জানাও যদি নইলে জীবের নাইকো গতি এইবার ॥
রামের চরণ পাবার আশে ।
নিমাই পণ্ডিত নদে এসে নয়ন জলেতে ভাসে
দীন দীন বলে কেঁদেছিল মুখে বাক্য নাই ছিল গো তার ॥
দীনু করে এই নিবেদন পাইবেন রাম তোমার চরণ—
তুমি অধমতারণ দেখলে চরণ জুড়োয় নয়ন
তোমার অতুল চরণ করেছি সার ॥

ও হাজিআল্লা তোমার মত দয়াল আর কেউ নাই।
জীবের দশা মলিন দেখে
মেহের মাঝে হলেন উদয় ॥
হাজিআল্লা তোমায় কে চিনতে পারে—
তুমি যারে জানাও সেই জানতে পারে
নইলে জানতে না পারে ॥
মহাপাপ সব যায় গো দূরে
যে তোমার নামটি করে—
আমি পাপী ভবের মাঝে কিরূপে তব চরণ পাই ॥
দুঃখী তাপী পাপী সব তোমার হাতে।
কাজী হ'য়ে যাচক বিচার
করলেন রোজ কিয়ামতে ॥
আমি পাপী আমি বধির
ঐ জনম পেয়ে অপরাধী।
কৃপা ক'রে তরাও যদি ভবনদী তরে যাই ॥
হাজি আল্লা বান্দা নবীর দুই রহমৎ—
হাজিআল্লা হাজিআল্লা বলে
সদাই করি ইবাদৎ ॥
আমি পাপী অধম
যেন তোমার নামটি বলি মুদম—
জুলিনা রাম তোমার কদম দর্শনে তব পান পাই ॥
জ্ঞাক যাবে জ্ঞাক পথে বধির হইবে কানা।
বধির প্রতি নিঠুর হবেন
আপনি বোবা কানা ॥
চিনবো কিসে চর্মচক্ষু
জ্ঞানচক্ষু নাই অভিক্ষুদ্র।
দীনুর যোচে মনদুখ যদি অতুল চরণ পাই ॥

৬৫

রাসের পদে নেহার রাখো দেখতে পাবে নজরে।
যিনি বর্ত্তমানে ত্রিভুবনে ফিরিছেন আম সদরে।।
রামদীন আমার জগৎজোড়া
তার রূপ ধ'রে রূপ করো নেহারা
তাহলে সে রূপ যাবে ধরা ভক্তির জোরে।।
হকতালা সে বারিতালা
আছে হকের হাকিম সদর আলা
মানুষ রূপে করছে খেলা এই জগৎ সংসারে।।
এক প্রমাণ দলিলে শুনি
ইসমাইলকে দেয় কুরবানি
ফকির বেশে কাদের গণি
এসে দেখা দেয় তারে।।
না করিয়ে বৈষ্ণব সেবা •
নিস্তার পেয়েছে কেবা
ভক্তি করলে মুক্তি পাবে বলি তোমারে।।
ঐ মানুষের অভয়পদ
চিনলাম না যে মায়ার বন্ধ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মেনে গিয়েছে দ্বন্দ্ব
পায়না তারা ধ্যানে।
এমন সাধের তরী পাপে ভারী
পাপের বোঝা বহিতে নারী
হাড়িরামদীন দেবেন চরণ তরী
যাই চলে ভবপারে।
দীনু করে এই নিবেদন
রাখবেন রামদীন যাবৎজীবন
হাড়িরামের অভয় চরণ
রেখো আমার ঐ পদেরে।।

৩৬

ভুলনা মন গোলেমালে যেন রসনাতে হাড়িরাম বলে।
ভুললে পরে পড়বা ফেরে ও ভোলামন ভুমণ্ডলে
যে জন অহর্নিশি রামনাম বলে তার ডিঙ্গি ডাঙ্গায় চলে ॥
বিষপানে প্রহ্লাদ বাঁচে রামনামের বলে।
পুরাণে আছে প্রমাণ করি আসান পাষাণ ভেসেছিল জলে
যে জানে না নিগূঢ় মর্ম তার জন্ম যাবে বিফলে ॥
এবার অর্থলোভে মত্ত হয়ে রাম তত্ত্ব যেও না ভুলে।
মন রসনা কর প্রার্থনা অভয় চরণ যদি মেলে
দীনুর এই আরাধনা জুড়ায় জীবন হাড়িরামের চরণ পেলে ॥

৩৭

মন কেন তুই নৈরাশ হলি।
কেন মিথ্যা কাজে মরতে গেলি
ধর্মতলায় গিয়ে তলিয়ে কেন না বুঝিলি ॥
তোর বক্ষে বইছে চক্ষের ধারা
কার কাছে এ শিক্ষা নিলি
করতে গেলি সাধুসঙ্গ সে সঙ্গ তুই ভঙ্গ দিলি ॥
আপন মাতৃধনে লুব্ধ হ'য়ে
পিতৃধন সব খুয়াইলি
ক্রমে ক্রমে মনের ভ্রমে তুই মরলি আমারে মেলি ॥
পড়ে সঙ্গ দোষে রঙ্গ রসে
সদাই করলি রসকেলি
মন রসনা ভাব জানলা সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ॥
দীনুর কর্মদোষে
সবাই দোষে
সেই দোষেতে দোষী হলি ॥

৩৮

কল্ থিলে কি চলেরে মানব গাড়ী।
বলহীন সব অচল হবে চলবে না বল থাকিলে চলে ক্রত
বল গেলে বুদ্ধি হত পরমার্থতত্ত্ব জেনে বুঝ না॥
আর বলের সঙ্গে চলে রিপু ছয় জনা।
গাড়ী চলে বলে পরিপাটি রোখ পাড়া রয়েছে মাটি
সতত হাওয়া বহিছে খাঁটি নাসিকায় ধীরে ধীরে॥
গাড়ী কলে বলে চলে অতি চমৎকার নবগুণ তার নবদ্বারে।
মালেকান তার মালের ঘরে তিন তারেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
সকলের উপরে নিত্য কারিকর গাড়ীর কাল উপস্থিত হ'লে পড়ে॥
খবর চলে তিন তারে আগুন পানি কলের ঘরে নীচে তার সয় বারি।
গাড়ির কলের ঘরে বলের কত কারখানা সৃষ্টি করলেন সৃষ্টিকর্তা
বসাইলেন মহাআত্মা জগৎকর্তা কি যোগেতে গঠেছে॥
গাড়ীর হস্তপদ চাকা আদি দিয়েছে গাড়ী ঠিকঠাক গড়েছে ঠিকে
রংখিলে সেরেছে লিখে চলেছে সুখে বলছে সুখে
হাড়িরাম নাম ঘড়ি ঘড়ি॥
গাড়ির ষড়দল পদ্মেতে যখন হয় স্থিতি নি-আকারে
নিরাকারে গড়েন নিত্য কারিকরে অন্ধকারে করেন গাড়ীর আকৃতি
আর দশমাস দশদিন কূপ শহরে বসতি॥
দেখ বল যদি মা নাহি ধরে।
সে বোঝা কি বইতে পারে
দীনু দেখে তারিখ করে বলের যায় বলিহারী॥

৩৯

পারের কর্তা তারণ কর্তা আছেন রামদীন নারায়ণ
রাম নামেতে মার ডঙ্কা
শঙ্কা কিরে অবোধ মন॥
খবরদার ছেড় না বোঠে।
কত তুফান যাবে কেটে ধর রামের চরণ এঁটে
মন-ডোরে দিয়ে বন্ধন॥
হাড়িরাম পারের কাণ্ডারী।

তবে ভাসায় তরী হাড়িমাঝেতে পাওরে পাড়ি
পাড়ি দেয় সর্বক্ষণ ।
খানিক সাঁতার খানিক চড়া ।
স্রোতে নৌকা রেখে খাড়া বেঁকে দিও হালে মোড়া
কত জোর ধরবে তখন ।
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনা—
একটি নদীর ত্রিমোহান তা দেখে মন ভয় পেও না
শুদ্ধ রাগের করণ ।
হাড়িরাম যার হিয়ায় জাগে ।
সে কি ডরায় জোয়ার বেগে
ভাবরে দীনু নিরবধি হাড়িরামের এ চরণ ।

৪০

জানলাম ধ ন্য নাম কারিগর ।
ঘরের ছাটনি ছে.
রেখেছে নবদ্বার ।
কারিগরের কি খোদকারি ।
গড়াছেন ঘর বরাবরি
ঘরের গড়নদারের বলিহারি কিবা কারি কুরি ।
ঘরের ফেলে ধোকাকাটি
চার চিজে চার খুঁটি
গড়লেন পরিপাটি কি চমৎকার ।
ধন্য বলি কারিগরে
ঘর বাঁধে ঘরের ভিতরে
ব্রহ্মা বিষ্ণুর অগোচরে ।
গিয়ে অন্তঃপুরে ঘর বাঁধলেন অধের হাটে
আমথা সাজ কেটে নেপলেন চালে
পাটে কি তারিফ তার ।
চার খুঁটির উপরে আড়া

মায়ার ঘর প্রবোধের বেড়া
স্থানে স্থানে দিয়ে জোড়া রেখেছেন ঘর খাড়া ॥
ঘরে কত মহামায়া
চাল দিয়ে ঘর ছাওয়া
দীর্ঘে চোদ্দ পোওয়া কি খাসা ঘর।
গড়ালেন ঘর আনখা সাজে
চেনাভার সেই দ্বিজরাজে
ভুলে রইলাম বিষয় কাজে পড়ে ভবের মাঝে ॥
ভেবে দীনু বলে
আমি না চিনলাম ঘরামি
ত্রিজগতের স্বামী গড়নদার ॥

৪১

সাঁই-এর আজব কারখানা গো,
সাঁয়ের আজব কারখানা ৷৷
তিনি নিত্য হাতে ত্রিজগতে দিচ্ছে খানা দানা ॥
সাঁইজি আমার সকল পারে
খোরাক দিচ্ছে ঘরে ঘরে।
আবির্ভাবে এ সংসারে রেখেছে একতারে ॥
কিরে পাথরেতে থাকে,
জলের ভিতর রেখে খোরাক
দিচ্ছে তারে চিনির দানা ॥
অধমতারণ নাম তিনার,
আজব লীলে কি চমৎকার
কোটি সমুদ্র গভীর পার জীবের বোঝা ভার ॥
জীবে জানতে পারতো যদি
জীবের গতি হাইরে হৈমবতী
সেও জানে না ॥
সাঁইজী আমার বিরাজ করে বেদবিধির অগোচরে।

দেবাদিদেব চিনতে নারে
নিত্য কারিগরে ॥
তিনি জীবের জীব কর্তা
সপ্তভূতের কর্তা
কিঞ্চিৎ জানে শিব সব জানে না ॥
দেখে দীনুর বাঞ্ছা করা,
অধর মানুষ যায় না ধরা
তবু হয় সাধক পাইয়া তারে সভাধর ॥
তবুর খাটুনি জিয়াদা
সেই পেয়েছে সদা ব্রজের
কৃষ্ণধারা এই ভজনা ॥

৪২

শুধু কথায় কি হবে অধরকে ধরা ।
ধর তারে ভক্তি করে
যদি কৃপা করে দেন ধরা ॥
অধর মানুষ ধরবা যদি আগে ছাড় বৈদিক বিধি
তবে মিলবে কত রত্ননিধি
ওগো সার করণ বেদ ছাড়া ॥
অধর মানুষ ধরবা কিসে
নয়ন জলে যায় গো ভেসে
নিমাই পণ্ডিত নদে এসে কেঁদে গেল শচীর গোরা ॥
ত্রেতা যুগে ছিল হনু
মেহেরপুরে নাম তার তনু
পেয়ে রামের পদরেণু চার যুগে তার সঙ্গে ফেরা ॥
দীনুর আশা না হল এবার
কিঞ্চিৎ জানেন মহেশ্বর
ব্রহ্মা করলেন দাসত্ব স্বীকার সত্য মিথ্যা দেখ তোরা ॥

করি বারণ তোরে শমন আমার কাছে আসিস না।
তোর আসামী নইরে শমন
কেন করিস তাড়না ॥
মেহেরপুরে করিরে বাস আমার নামটি রামের দাস—
আমার মনের কি অভিলাষ
তাও কি জাননা ॥
ওরে শমন জেনে শুনে তুই কেন এলি এখানে।
আমার হাড়িরাম দীন শুনলে কানে
অপমানে বাঁচবি না ॥
সতত রামপুরবাসী সেখানে নাই নিরেক বেশি—
কিবা কমি কিবা বেশী
মালে খাজনা মোর লাগে না ॥
হাড়িরাম ব্রহ্মাণ্ডের রাজা।
আমি তার খাসের জমি,
খুশী মনে দিবা করি রাম নাম জপনা ॥
শুনরে শমন আমার কথা—
হাড়িরাম আমার জগৎ পিতা
হাড়িরামের থাকলে কৃপা তোর ভোগায় আর ভুলব না ॥
শোনরে শমন আমার কথা—
দীনুর নাম তাঁর খাতায় লেখা
জাখ্‌গা চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার নাম খুঁজে পাবি না ॥

৪৪

নবদ্বীপেতে এসে
ছিন্নবেশে
কেঁদে গেল শচীর গোরা ॥
আলেকের চরণ লাগি
অনুরাগী
বৈরাগ্য বেশে দণ্ডীধরা ॥
চাঁদ মুখে নাইকো হাসি
দিবানিশি
প্রতিবাসী দেখ সে তোরা ॥
শতধার বইছে চক্ষে
পড়ছে বক্ষে
কোন মানুষকে হয়ে হারা ॥
যার ভাবে সবাই ভাবে
দেখগো ভেবে
সে জন ভাবে সেই অধরা ॥
কত মুনি ঋষি
যোগ তপসী
দিবানিশি ভাবছে তারা ॥
কাজী হয়ে ব'সে
দেশ বিদেশে
বিচার করে পড়ল সাড়া ॥
বাবু কয় কলিকালে
মেহেরপুরে
পূর্ণ মানুষ দেখ সে তোরা ॥

মানুষ রূপেতে আল্লা করছে খেলা
বাগিতালা মেহেরপুরে।
আখেরেতে জীবের তরে
বারাম দিলে তত্ত্ব দেখলে নজর করে।
স্বাভাবিক মানুষ বেশে
সৃষ্টির আগে
এক দেহ সে পত্তন করে।
কুদরতি আদম ছবি
হজরত নবী বরকৎ বিবি হাইয়ে কারে॥
মা সদাই থাকে বসে
হর্ষ চিত্তে গঙ্গাধর তুই দেখসে আয়রে॥
এখন আর কি করিব
কোথায় যাইব
যার জীবন সে এসেছে রে॥
যার হাইয়ে হৈমাবতী
আভাশক্তি সৃষ্টি স্থিতি
প্রলয় করে
সে মহারাগের ফকির
মারলে জিগির
কোটি সমুদ্র গভীর পারে।
বাবু কয় সাঁইয়ের কদম জপ মুদোম
হরদমে কেউ ভুল নারে।

৪৬

ওরে আমার মন ত্রিতাপে থেক না।
ত্রিতাপে থাকলে আর মানব হলে না ॥
ত্রিতাপ কাহারে বলে
জানে না তা সকলে
সুখ দুঃখ মোহ ঘরে ভুলে থেকো না ॥
ত্রিতাপে থাকলে পরে
পড়বি রে চারযুগের ফেরে
ঘুরে মরবি ভব ঘোরে
পাবি যন্ত্রণা ॥
কেন থাক মায়ায় ভুলে
আমার আমার আমার ব'লে
শেষদিন এসব কোথায় ফেলে
যাবা বল না ॥
শ্রীমন্ত কয় ওরে গোষ্ঠ
হাড়িরাম ত্রিজগতের ইষ্ট
আমি তোরে বলি স্পষ্ট
হাড়ির চরণ ভুল না ॥

৪৭

কে বুঝিতে পারে হাড়িরাম তব মহিমা।
তুমি যদি জানাও তব নইলে জানতে পারে না ॥
শুনি ব্রহ্মা হন সৃষ্টি কর্তা
বিষ্ণু হন পালন কর্তা
শিব হন সংসার কর্তা
তবে এক ব্রহ্ম থাকে না।

তুমি এক ব্রহ্ম দুইয়ে নাস্তি
তোমার ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি
তব হাইয়ে হৈমাবতী সৃষ্টি
সেও তো জানে না।
জানালেন তত্ত্ব গঙ্গাধরে
তারা এ নাম প্রচার করে
কোটী সমুদ্র গভীর পারে
জীব শুনেও নিলে না॥
গোষ্ঠদাস অতি অভাজন
সদা যেন থাকে চেতন
নিজ গুণে করবেন তারা
এই প্রার্থনা॥

৪৮

হাড়িরামের চরণবিনে গতি নাইরে আর।
অধমতারণ
দুঃখ নিবারণ
পতিতপাবন
নামটি তার॥
হক হাকিম হক বিচার
মেহেররাজে করলেন প্রচার
আখেরি এইবার ভক্তিভাবে ডাক তারে।
যদি বোধিতনে হবি উদ্ধার
নইলে উপায় নাইকো আর॥
বোধিতনে থাকলে পড়ে
পড়বি রে চার যুগের ফেরে
দেখ বিচারে—
আর বোধিতনে বদ্ধ হয়ে
থেকনাকো রে মন আমার॥

হাড়িরাজের চরণ বিনে
আর আমি উপায় দেখি নে
থাক এদিনে—
পুন যদি হবি মানব হাড়ির চরণ কর সার ॥
গোঁইদাসের বুদ্ধি শক্তি
ভবে যেন না হয় ভ্রান্তি
ওগো দীনপতি
তব পদে যেন থাকে মতি
এই মিনতি বারবার ॥

৪৯

হাড়ি রামদীন চক্রচন্দ্র সর্বোপরে রয়।
তিনি আখেরিতে
হিসাব নিতে
মেহেররাজে হলেন উদয়।
হাড়ি রামদীন ইচ্ছা করে
আসমান জমিন পয়দা করে
চালায় এক জোরে—
হেউং মউং রিশিং দোলুং এই চারখানা হাতে রয়।
হাড়ি রামদীন কৃপা করে
জানালেন যাচক বিচারে
এ সংসারে
তিনি পূর্বে হাড়ি পরে হাড়ি হাড়ি রামদীন ইচ্ছাময়।
হাড়িরাজের অভয়চরণ
দিবানিশি কর প্রার্থনা
ওরে, আমার মন
ভব ভয় হতে মুক্ত করবেন হাড়ি রামদীন দয়াময়।
গোঁইদাসের ভবে আশা
কেবল ঐ চরণ ভরসা
যেন না হয় নিরাশা
তব কৃপা সুধাপানে সদা যেন মতি রয়।

জলধরের পদ

৫০

দেখ আজব তরফ কথা শুনে
প্রাণে বাঁচি নি প্রাণে বাঁচি নি গো মোরা প্রাণে বাঁচি নি ॥
যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে
তাই আছে ভাণ্ডে
বলে সর্বজনে এমন ভাণ্ড সাজানো থাকলে
চিরকাল পতন হয় কেনে।
বলে রাধাকৃষ্ণ থাকেন সহস্রদলথানে
এক ব্রহ্ম দুইয়ে নাস্তি বলে শুনি কানে
দেখ রাধাকৃষ্ণ দুইয়ে প'ল আর প'ল তিনে ॥
সাধ্য সাধনা ভিতরে কয় সাধক গণে
যেমন একাদশী পূর্ণিমার চাঁদ তাই ভাব মনে ॥
জলধর অতি মূঢ় ভাবতে জানি নি
তুমি এক ব্রহ্ম দয়াল হাড়ীরাম
রেখো গো চরণে ॥

৫১

দেখ মানুস মানুষ ভিতরী
মানুষ বল গো বল রে।
আলেক মানুষ বাহিরে বসে বিরাজ করে ॥
জীব আত্মা পরম আত্মা
আত্মা রামেশ্বরে
তাদের হাসায় কাঁদায় দয়াল হাড়ীরাম
নাচায় এক তারে ॥
রজ বীজ চার রং ধার্য আছে ঘরে ঘরে
দেখ ঐশ্বর্য মাধুর্য নিরাপন হাড়ীরাম যা করে

দেখ পুরুষ প্রকৃতি দুইটি খাটি বলছেন আছে মণিপুরে
হাড়ীরাম এক খাঁটিতে ধরায় দুই ফল
উচ্ছা যা করে।
দেখ আর আতস খাক বাত
খুঁটি আছে চাম হাড়ে গেড়ে দেখ
স্থানে স্থানে রক্ত হাড়িরাম দিয়েছেন জুড়ে।
মানুষ মানুষ সবাই বলে
মানুষ অন্বেষণ কে করে
দেখ এক ব্রহ্ম দয়াল হাড়িরাম
কয় জলধরে।

৫২

দয়াল হাড়িরাম পুরাও মনস্কাম।
ফেলেছ ভবে মায়াতে।
হাড়িরাম যারে কর দয়া দাও পদছায়া
পূর্ণ কর তার মনস্কাম।
তুমি হাড়িরাম পয়দাকারী
একশো আট হাড় দিলেন জুড়ি
মাংস হাড়ে চাম তার উপরি
আসা যাওয়া করান ভবেতে।
মহাদেব তার তত্ত্ব জেনে
একশো আট হাড় নেয়গো গুণে
হাড়িরাম বলে নিশিদিনে
হাড়ের মালা পরে গলেতে।
ত্রেতাযুগে রামজী
সেথে ছিল দেখ হাড়ির কি
শক্তি লয়ে রণে সাজি
বধিল রাবণ লঙ্কাতে।
সত্য ত্রেতা ত্যজ্য করি
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরাম ধরি

তার চিহ্ন রাখলেন পদভরী
শ্রীকৃষ্ণের ঐ বুকেতে।
দেখ কলিতে গৌরহরি
দুই নয়নে বয় তার বারি
হাড়িরাম চরণ নেহার করি
কেঁদে গেল নবদ্বীপেতে।
যারে বল আদ্যাশক্তি
সেই হাড়ির ঝি হৈমবতী
তার প্রমাণ আছে ভাগবত পুঁথি
আর দেখ গা চণ্ডীতে।
ভেবে বলে দীনহীন জলধরে
ভক্তি নাই মোর হৃদ্ পিঞ্জরে
হাড়িরামদীন কৃপা করে
রেখ অভয় পদেতে।

চারু মণ্ডলের গান

৫৩

রামনাম বল জীবন হবে সফল।
যে আশায় ভবে আসা আমার ফলবে ভাল॥
হাড়িরাম পৃথিবী মাতা
হাড়িরাম জগতের পিতা
হাড়িরাম জ্ঞানদাতা
হাড়িরাম শিবকূমণ্ডল॥
ওঁ সত্য ব্রহ্মা বেদ
সাধনায় যায় বাসনা খেদ
থাকে না সংশয় ভেদাভেদ
অভেদ আত্মা দেখে সকল॥
রামনামে কোরো না হেলা
যতনে পান কর দু বেলা
থাকবে না আর ত্রিতাপ জ্বালা
তাপিত প্রাণ হবে শীতল॥
চিনলে না মন আপনারে
হাড়িরাম চিনবে কেমন ক'রে
তুমি প্রণাম কর যে মন্তরে
দীনহীন চারু বলে তারে
আদি অক্ষর অখণ্ডল॥

৫৪

সাধের মেহেরপুর বল কে করেছে নামকরণ।
যেমন বৃন্দাবন নাম হয়েছিল
সেথা উদয়কৃষ্ণ নারায়ণ॥

যুগান্ত সময় হলো হাড়িরাম যে এলো
মধুর ব্রহ্মনাম যে প্রচারিল
(ভাইরে) জীবের মুক্তির কারণ ॥
আহা প্রণব মন্ত্র বিলাইতে
এল মেহেরপুরেতে
দেখ জাতির বিচার করে না।
সে সদাই মহামন্ত্র করায় স্মরণ
মেহেরপুর আজ সত্য হ'ল
হাড়িরাম যে এল
ব্রহ্মমাতা সঙ্গে এলো
হাড়িরাম সেবার কারণ ॥
নাম বিলাতে হাড়িরাম এলো
তার ব্রহ্মমাতা নাম যে হলো
সদা ব্রহ্ম রাখে রাম ভবন ॥
অধীন চারুদাসে ভণে
রামচরণ পড়ে মনে
কৃপা করে শেষের দিনে
যেন হয় স্মরণ ॥

৫৫

ওরে হাড়িরামের তরী ভেসেছে
পার হবি কে আয়রে আয়।
ভব-নদীতে তুফান ভারী
পার হওয়া আজি বিষম দায় ॥
যুগের রাম দয়াময় এসেছে রে
মাথায় করে ঘরে নেরে
দারা সুত সবাই মিলে
রাম নাম বলে নেচে আয়।
হিংসা নিন্দা থাকবে না রে
মৃত্যুকে জয় করবি আয় ॥

অধীন চারুদাসে ভণে
রামনাম ছাড়া গতি নাই রে—
ভেবে দেখ দেখি মন
পারের কর্তা রামদীন দয়াময় ।
প্রাণটা প্রাণে মিশিয়ে দে রে
মরণের ভয় রবে না রে
মৃত্যুকে জয় করবি আর ।।

বিপ্রদাসের গান

৫৬

হাড়িরাম নাম হাড়িরাম বল রে রসনা।
এবার পেয়েছ মানব জনম হেলায় হারায়ো না ॥
হাড়িরাম নাম বললে পরে
সকল জ্বালা যাবে দূরে
মিছে ভবঘোরে বেড়াস ঘুরে
শেষের ভাবনা ভাবলি না ।
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল
একবার হাড়িরাম নাম বল
গোলেমালে দিন ফুরাল
হাড়িরাম নাম বললি না।
দিব্যযুগে যে হাড়িরাম
মেহেরপুরে তার নিত্যধাম
একবার পূর্ণ কর রে তার মনস্কাম
কেন ডাকবার মত ডাক না ॥
বিপ্রদাসের এই নিবেদন
ঘুচাও আমার ভবের বন্ধন
আবার নিজের গুণে করবেন তারণ
এই আমার প্রার্থনা ॥

নারায়ণদাসের পদ

৫৭

হাড়িরাম তত্ত্ব সমুদ্র পাথার মন তুমি ডুবে মর।
মুখে হাড়িরাম নাম

হাড়িরাম ব'লে নিত্যধামে যাত্রা কর॥
চারবেদ আঠার পুরাণ
চৌদ্দ শাস্ত্রে নাই তার সন্ধান
মনের দেখ তাহার প্রমাণ

ক্ষণেকে কাঁদে আবার॥
যদি বল সেই কৃষ্ণধন
তবে ঘট পুজে কিসের কারণ
তার কোন্ অভাবটা করলে পূরণ

বুকে চিহ্ন আছে আবার॥
আমি বলি বারেবার
কে করে তাহার বিচার
এই বিচার যদি কেউ না পার
তবে চৌরাশিতে আয়ণা কর॥
নারাণদাস বলে অভাগের ঘরে
হাড়িরাম নাম বল বারে বারে
বিপ্র আমি বলি তোরে
হাড়িরাম চরণ হৃদয়ে ধর॥

৫৮

কোন তত্ত্বে পাব বল সেই হাড়িরামে
আছে পঞ্চতত্ত্ব তপনকৃষ্ণ

সেই তত্ত্বে রাম মিলবে কেনে॥

আর আছে চৌষট্টি তত্ত্ব
সেই তত্ত্ব হয় রসতত্ত্ব
তাতে রসিক ভক্ত হয়ে মত্ত
রসতত্ত্ব কিবা জানে ॥
এক তত্ত্বে নিমাই সন্ন্যাসী
দুই তত্ত্বে হাতে বাঁশী
তিন তত্ত্বে রাম বনবাসী
চারতত্ত্ব রয় নারায়ণে ॥
একশ আট মানুষ তত্ত্ব
কোন তত্ত্বে রাম বিরাজিত
কোন তত্ত্বে কৃষ্ণ মোহিত
একেশ্বরবাদ কে এখানে ।
দাস নারায়ণ কয় কাতরে
হাড়িরাম তত্ত্ব নাম সবার উপরে
হাড়ি রামদীন বল বারে বারে
নিরানন্দ নাই যেখানে ॥

মদনের পদ

৫৯

প্রেমিক না হ'লে রে মন প্রেমিক না হ'লে
সে প্রেম কিসে মেলে ॥
অপ্রেমিক যারা
প্রেম জানে না তারা
প্রেম ফল পায় কি প্রেমে হাত বাড়ালে ॥
প্রেম কথাটি শুনে যে হয় অচেতন
তাতে আছে শুধু প্রেম বরিষণ
সে যে নয়ন প্রেমের ভক্তি কর ফুল
সে প্রেম গাঁথা আছে ঐ দেখ ফুলে আর ফলে ॥
ত্রেতাযুগে রাম অযোধ্যাভুবনে
প্রেমে বাঁধা আছে পবননন্দনে
সে প্রেম জানে গুহক যাতে চণ্ডাল হয়
ও তার ভক্তি চণ্ডাল নয়
নিজ দেহ দিয়ে রামকে পেলে ॥
মদন বলে সে প্রেম বুঝতে নারি
চরণ পাবার আশায় কাঁদেন বংশীধারী
সে মুরারি
চরণ পাবার আশায়
আসি এ নদীয়ায়
কটিতে কৌপীন পড়িলেন ॥

রামদাসের পদ

৬০

মানুষ মানুষ সবাই বলে কে করে তার অন্বেষণ।
পঞ্চম স্বরে মনের সুখে ডাকেন তারে ত্রিলোচন ॥
চৌদ্দশাস্ত্র অষ্টাদশ পুরাণ
চার বেদের উপরে সরান
কদাচিৎ কেউ পায় তার সন্ধান
যার আছে উদ্দীপন ॥
কোটি সমুদ্র গভীর অপার
যে জানে সে নিকট হয় তার
কলমেতে না পায় আকার
শুদ্ধ রাগের করণ ॥
রাষ্ট্র আছে ভূমণ্ডলে
মথুরাতে জন্ম নিলে
কত লীলা প্রকাশিলে
সেই কৃষ্ণধন ॥
রাসলীলা হয় বৃন্দাবনে
জানে কোন ভাগ্যবানে
রাধাকৃষ্ণ নাহি জানে
জানে না সে গোপীগণ ॥
নন্দসুত বল যারে
সেই এসে এই নদেপুরে
হরিনাম দেয় ঘরে ঘরে
শচীর নন্দন ॥
রাধা ঋণ শুধিবে বলে

রাই অঙ্গে অঙ্গ মিশায়ে হরি হ'য়ে হরি বলে
কোন হরিতে হরলে মন ॥
রামদাসে কয় শুনে এসে
সব হারালাম কর্মদোষে
দেখে শুনে পাগল দিশে
এই অকারণ ॥
পিতা আমায় যে ধন দিলে
রত্নমণি তারে বলে
ভবকূপে দিলাম ঢেলে
ছড়াইলাম অকারণ ॥

অক্রূরের পদ

৬১

হাড়িরাম বল রসনা সময় বয়ে গেল রে
সময় বয়ে গেল রে তোর দিন বয়ে গেল রে ॥
বাল্যকালে বাল্যখেলা
যৌবনকালে রাগের বেলা
বৃদ্ধ হলে ঘটবে জ্বালা
শমন ফিরিবে রে ॥
নিয়ে এলি ষোল আনা
কত দেনা কত পাওনা
হিসাবে তোর ঠিক মিলে না
হাড়িরাম কি ছাড়বে রে ॥
ভাই বন্ধু সুত দারা
সঙ্গের সঙ্গী কেউ নয় তারা
আমার আমার বলবে তারা
কেউ সঙ্গে যাবে নারে ॥
সেখানে কি বলে এলি
বিষয় পেয়ে ভুলে রইলি
অভয় পদ না ভাবিলি
অন্তিমে কি হবে রে ॥
অক্রূর বলে শোন গঙ্গাধর
আমিও যার সকাল তার
ঐ চরণে রেখো নেহার
কুলের গৌরব করো না রে ॥

মহেন্দ্রনাথের পদ

৩২

ছাড়িয়াম কে বুঝিবে মহিমা তোমার
তুমি কখন যে কি কর কারে বোঝে সাধ্যকার ॥
কাউকে কর ছত্রধারী কাউকে কর দিনভিখারী
রামদীন গো কাউকে কর বনচারী
গাছের তলা সার ॥
কাউকে খাওয়াও মাখন ছানা
কারও ভাতে নুন জোটে না
আবার কারেও খেতে একবার দাও না
কাউকে দশবার ॥
শতপুত্র দাও গো কারে
কত সুখে রেখেছ তারে
একটি পুত্র দিয়েও কারে
কেড়ে লও আবার ॥
শুনি সমান দয়া সবজীবে
এমন কেন কর তবে
মূঢ়মতি আমি ভেবে
ঠিক পেলাম না তার ॥
মায়ামদে হয়ে মত্ত
না বুঝিলাম তব তত্ত্ব
ত্যাজ্য করে এমন নিত্য
অনিত্য করলাম সার ॥
মহেন্দ্রনাথের আশা মনে
স্থান যেন পাই শ্রীচরণে
যেন ভুলায়ে মায়ার বন্ধনে
রেখ না গো আর ॥

মেগুর পদ

৬৩

ওগো হাড়িরামদীন আমায় দয়া করে দাও সুদিন।
অধমতারণ নামটি তোমার ডাকি আমি দীনহীন॥
যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে
ভুলে ছিল রাধাসনে
রামদীন তারে চেতনা করলো বক্ষে দিয়ে পদচিন॥
তোমার ঐ চরণ লাগি
নিমাই পণ্ডিত অনুরাগী
নবদ্বীপে কেঁদেছিল হয়ে অতি দীনহীন॥
যে তোমারে ভক্তি করে
সে তরিবে তোমার জোরে
আপন তারণ আপনি তরে
প্রার্থনা আছে প্রবীণ॥
দিব্যযুগের দিব্য বিচার
মেহেরপুরে করলে প্রচার
মেগু বলে ওরে ভাগ্য রামচরণে হও একদিন॥

অপ্রকাশিত রচনা

৬

এবার সত্য বল হাড়িরামের পদে রাখো রতিমতি ॥
দয়া করেন অতি সবাকার প্রতি
সে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
সত্য সত্য সত্য বল
সত্য পথে সদা চল—
তবে সত্য হবে রে সত্য
এবার সত্য নাম ধর
সত্য নাম সদাই কর।
সত্য নামে রাখলে ভক্তি
তবে হবে প্রাপ্তি
সত্য নামে হবে থাকা সতি ॥
সবাকার যে চিন্তামণি
সবার চিন্তা করেন তিনি
পতিতপাবন অন্তর্যামী
আলেকনাথ আলেকেতে
থাকেন সব ঘটে ঘটে
ও মন দুগ্ধে যেমন ঘৃত
তেমনি মিশ্রিত
বুঝতে নারে কেউ তাহার রীতি ॥
যেয়ে দেখ মেহেরপুরে
টাকশাল খাঁটা ঘরে
সত্য মানুষের দরকারে
সত্য মানুষ নিক্তি ধরে
কমবেশী ওজন করে

গহি দিয়ে পরখ করে
ষোল আনা খাঁটি করে
দূর করে ফেলায় তামা মেকি ॥

৬৫

যদি রাম গুণ গান গাবি
তবে অমূল্যধন কতই পাবি ॥
হাড়ি রামদীন পুরুষ আর সব নারী
তিনি সকলের হয় অধিকারী
বলিহারী দর্পহারী
ঐ চরণে হ'গা রে লোভী ॥
রাম নামটি কর আরাধন
তবে রসনায় পাবি আস্বাদন
রাম নাম করিলে শ্রবণ
তুই তাপিত অঙ্গ জুড়াইবি ॥
যেমন রে তুই অপরাধী
হাড়িরাম নাম নে নিরবধি
মিলবে রে অমূল্য নিধি
তুই ভবনদী তরে যাবি ॥
পাবো ব'লে চরণে স্থান
মর্মিকগণ সব করে প্রার্থনা
গাবি যদি হাড়িরাম গুণ গান
তবে মানবদেহের গঠন পাবি ॥

৬৬

বল হাড়িরাম বদন ভরে
অনায়াসে ভব পারে যাবি রে ॥
হাড়িরামের পদধূলা এই অঙ্গে মাখোরে
একাগত অনুগত হাড়িরামের নাম সত্য রে ॥

হাড়িরামের নামে তরে গেল ভক্ত গদাধর
আর শিবাস্থলে যে হাড়ি
মেহেরপুরে অবতরি
হাড়ি ব'লে ঘৃণা ক'রে
কেউ নিলে কেউ নিলে না
ব্রহ্মা আদি দেবগণে
ধ্যানে না পায় মুনিগণে রে
ও হ'ল হৈমবতীর ঘরে উদয় সেতো জানে না ।।

৬৭

হাড়িরামের নাম ভুলো না রে মন ।
কোনদিন যেতে হবে রে
কোনদিন তলব দিয়ে লয়ে যাবে বেঁধে কাল শমন ।।
তোর আবালবৃদ্ধ যুবাকাল গেল অকারণ
মন তুমি জেগে দেখ রে পিছে দাঁড়িয়ে কাল শমন ।।
তোর আঠারো মোকাম ঘর খালি যে হবে
যেদিন মালেকের মউত এসে জানকে বাঁধিবে
সেদিন ভাই বন্ধু মাতাপিতা কাঁদবে রে তখন ।।

৬৮

হাড়িরামের চরণ চিন্তা যে জন করে ।
তার অন্য চিন্তা রবে না রে আর রবে না রে ।।
চরণ চিন্তা কর রে মন অন্য চিন্তা যাবে দূরে
তিনি বলিহারী দর্পহারী
তিনি ভিন্ন কৃপা আর কে করে ।।
মন হয়েছে জীবন মন্ত্রী
মনে মনে মন্ত্রণা করে
দেখ জন্মালে মরণ আছে
রাম নাম বলো বদন ভরে গো বদন ভরে ।।
রাম নাম যদি সত্য না হবে

কাঠবিড়ালী কি হয় সাগর বাঁধে
দেখ বনের পশু সেই হনুমান
লঙ্কা পুড়ায়ে ছারখার করে গো ছারখার করে ॥
সদাই শিব যে রাম নাম করে
মৃত্যুঞ্জয়ী নামটি ধরে
রাম নামের গুণ জানে
সেই শিব পঞ্চম স্বরে রাম নাম করে গো রাম নাম করে ॥
চিন্তা করে গিয়েছিল নদেপুরে
দীনের অধীন হয় উদাসীন
ছেঁড়া কাঁথা গলে পড়ে গো গলে পড়ে ॥
রত্নাকর যে মহাপাপী অসংখ্য পাপ কতই করে
সে যে মরা বলে রামনামে
পাপ বিনাশ করে গো বিনাশ করে ॥

৬৯

হাড়িরাম বল বদনে গো *
হাড়িরাম বল বদনে।
আপন একিনে
ভবপদ অতি সযতনে ॥
এসেছ মন এই ব্রহ্মাণ্ডে
ভুলে রইলি কর্মকাণ্ডে
মহাপাপ রাম নামে খণ্ডে
বল দণ্ডে দণ্ডে।
কখন ল'য়ে তার হুকুম
আসবে নিতে যম
করবে ব্যতিক্রম কাল শমনে ॥
মনে প্রাণে যুক্তি বাঁধ
ছাড় অন্য পরিবাদ
হাড়িরামের অভয় পদ
মনের সাধে সাধ।

চাঁদে ঘুচায় অন্ধকার

তিন চাঁদের মূলাধার

কোটি চন্দ্র তার নখের কোণে ॥

সহজে মানুষ না যায় দেখা

কে করবে তার গুণের ব্যাখ্যা

মরি কি তাই গুনি শিক্ষা

নিলেন অন্তিকা।

তিনি সর্বগুণের গুণী

মনের চিন্তামণি

হলো সুরধনী তার চরণে ॥

ভক্ত রাম কয় ক'রে ভক্তি

তুমি গো রাম পিতাপতি

কৃপা করে ভক্তের প্রতি

ঘুচাও গো দুর্গতি

আমি রামের চরণ ভিন্ন জানি না

কেন অক্ত কয় বাঞ্ছা পূর্ণ নিজ গুণে ॥

৭০

বুঝতে নারি হাড়িরাম মহিমা তোমার।

বুঝবে সে সাধ্য আছে কার ॥

বুঝতে নারি তোমার খেলা

ও হাড়িরাম উপরওয়ালা

কারে দাও গো দুঃখ জ্বালা

কার সুখোদয় কারে দাও গো অট্টালিকা।

কারও বিপদ চারিদিকে

তোমার সূক্ষ্ম বিচার দেখে

এসেছি এবার ॥

তুমি রামদীন দয়াময়

যে হয় তোমার পদানত

তারই মানবজনম সত্য
ওগো দীননাথ।
তোমারই পদজোরে
পক্ষী সে আসমানে ওড়ে
জলের ভিতর পাথর জোগাচ্ছে আহার ॥
যে করে রাম তোমার আশা
তারে ঘটাও দশম দশা
এমনি তোমার ভালবাসা।
ওগো হাড়িরাম তুমি সকলই করিতে পারো
ডাঙ্গাতে ডুবায়ে মার
হাঁটু জল কাক সাঁতার
কারও দিবসে আঁধার ॥

৭১

একি আজব কারখানা সাঁই
দিন দুনিয়ার মালিক যে তার ঘর ডাঙ্গা।
মনের অনুরাগে বাও হে তরী
ষোল ঘাটে ষোল জনা ॥
হাড়িনামে তরী উজান চলে
পরমেশ্বর তার গুণটানা।
চারযুগের উপরে আমার
আলেকের বারামখানা।
আলেক পরে আহ্লাদিনী
সদাই করে মন্ত্রণা ॥

ধনা ধা পা পা ॥ পা পা পা পা | ধা পা মা মা ॥ পা া া া | া া া পা ||
ছা - য়া - পূ - র্ব ক র তার ম নন্ কা - - - - - - র্

া া পা পা ॥ পা া পর্সা র্সা | া া া া ॥ র্রা া র্গা র্গা | র্গা া র্রগা ॥
- - তু মি নি জে ক পা ক - রে - এ সে যে ছে্র পু - রে -

॥ র্রা র্রা র্রা র্গা | র্রা র্সা র্সা র্রা ॥ না র্সা া া | না ধা পা পা ||
- ক রে ছ নি - ত্ ত ব - - - - র্ অ বোধ
পা পা ধর্সা র্সা |
জী ব কে ত

র্সা া া া ॥ র্সর্রা র্সা া না | ধনা না ধা পা ॥ পা া া পা | ধা পা মা মা ॥
রা - তে - স্থি তি হ লে ধ রা তে - প্র কা শ ক রে ছ নি জ
পা া া া |
না - - য়্

া পা পা পা ॥ পা পা ধর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা র্রা ॥ র্রা পা া র্গা |
এ দা স জ ন ধ রে্ আ - শা - য়ু চা ও দ

র্গা া র্গা র্মা ॥ র্সা র্রা র্রা র্রা | র্গা র্সা র্সা র্রা ॥ র্রা া া া |
শ ম্ দ শা - - ও গো - হা ড়ি - রা - - -

র্রা া পা পা ॥ পা পা ধর্সা র্সা | র্সা া া া ॥ র্রা র্সা না ধা |
য্ - তো মার্ ডা কি নি শি দি - নে - শ য় নে ষ

ধনা ধা পা পা ॥ ধপা পা পধা ধা | পা ধা পা মা ॥
প - নে - ক রি গো - - - তো মার্
পা পা া া |
না - - য়

পরিশিষ্ট ১

বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল নদীয়াজেলার অন্তর্গত মেহের-পুরে। এখন মেহেরপুর বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। নানা ঘাত প্রতিঘাতে ও রাজনৈতিক পালা-বদলের চাপে এবং বিশেষত সংখ্যালঘু হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগের কারণে বর্তমানে সেখানে বলরামীদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। মেহেরপুরে বলরামের আখড়া, তার সংলগ্ন মন্দির ও গৃহ এখন জরাজীর্ণ, ভগ্নদশাগ্রস্ত। কোনরকমে বিশ্বাসী সংখ্যায় কিছু নরনারী প্রতি সায়ংসন্ধ্যা সেখানে বলরামের ভজনা ক'রে চলেছেন।

এখন তাই বলরামীদের সম্পর্কে জানতে গেলে যেতে হবে প্রধানত নদীয়া-জেলার তেহট্ট ব্লকের অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর গ্রামে, পুরুলিয়ার আদ্রার সংলগ্ন দৈকিয়ারী গ্রামে এবং বাঁকুড়ার কাঁটিপাহাড়ির কাছাকাছি শালুনি গ্রামে। এই তিন জায়গায় এখনও বলরামীদের সাধনক্ষেত্র, দৈনিক উপাসনা, নবদীক্ষা এবং বাৎসরিক উৎসবগুলি অটুট আছে। সাম্প্রদায়িক বিশেষ গানগুলি এখনও এসব জায়গায় গাওয়া হয়। অবশ্য দৈকিয়ারি ও শালুনি গ্রামে এ-সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে নিতান্ত আধুনিককালে, ষাটের দশকের গোড়ায়। এছাড়া পুরুলিয়ার শঙ্কোটে জঙ্গলাকীর্ণ এক উচ্চভূমির দুর্গমতায় আছে একটি বলরামী আখড়া এবং আরেকটি ঐ জেলার ডাঙ্গারিয়ায়। এই শেষোক্ত দুটি জায়গায় আমরা সরেজমিন যেতে পারিনি।

নিশ্চিন্তপুর, দৈকিয়ারি ও শালুনির আখড়া বিষয়ে যথাসম্ভব এবং প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য এখানে পেশ করছি—উৎসাহী গবেষক, সন্ধিৎসু মানুষ ভবিষ্যতে এসব জায়গা থেকে আরও কিছু তথ্য ও বিবরণ পেতে পারবেন কিংবা নিছক কৌতূহলবশত সেখানে যেতে পারবেন এই ভেবে।

কৃষ্ণনগর শহর থেকে বাসযোগে যেতে হয় নিশ্চিন্তপুর। কৃষ্ণনগর-পাটকেবাড়ি বাস রুটে হেহট্ট ছাড়িয়ে মোনাকষা মোড়ে নামতে হয়। সেখান থেকে হাটা-পথে দুই কিলোমিটার পরে নিশ্চিন্তপুর আশ্রম। এই আশ্রম একশো বছরের বেশি পুরানো। স্বয়ং হাড়িরাম এ-আশ্রমের বেলতলায় বসবাস ক'রে গেছেন এমন প্রসিদ্ধি আছে। কেউ কেউ মনে করেন হাড়িরামের প্রথম সারির প্রত্যক্ষ শিষ্য তন্থু মণ্ডল এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। নিশ্চিন্তপুর গ্রাম ও তার আশপাশের অগণিত পল্লীবাসী এই আশ্রম, বেলতলা ও হাড়িরাম বিষয়ে গভীরে শ্রদ্ধাশীল। এখানে আছে বলরামের ব্যবহৃত পবিত্র খড়ম। তার নিত্যসেবা হয়।

গ্রামের বেশিরভাগ অধিবাসী মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এছাড়া আছেন গোপ সম্প্রদায়, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। কৃষিকাজ ও মৎস্যচাষ মূল উপজীবিকা। চাকুরীজীবীও আছেন কিছু।

বেলতলায় বছরে তিনটি উৎসব সম্পন্ন হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, কার্তিক মাসের একাদশী আর চৈত্র মাসের বারুণীতে মহোৎসব হয়। বারুণীর উৎসব সবচেয়ে ধুমধাম ক'রে হয়। নদীয়ার বহু গ্রাম থেকে বিশ্বাসী ও সম্প্রদায়ী বহু মানুষ সমাবেত হন এই উপলক্ষে। এছাড়া শুধু এখানেই ১লা মাঘ আলাদাভাবে একটি উৎসব হয় যা অন্যান্য আশ্রমে হয় না। ১লা মাঘ গ্রামের সমস্ত মানুষ (সম্প্রদায়ী ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে) বেলতলায় সমবেত হয়ে রান্না ক'রে খান। ঐ দিন গ্রামে কোন বাড়ি রান্না হয় না।

এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য হাড়িরাম ভক্তদের নাম: নেপালচন্দ্র হালদার, সুশান্ত হালদার, গঙ্গাধর হালদার, বীরেন হালদার, রাধারাণী, নারায়ণচন্দ্র সরকার, নিতাইচন্দ্র সরকার, ধর্মদাস ঘোষ, হরেন মণ্ডল, মহাদেব বিশ্বাস, বিভূতি বিশ্বাস, ধরণীধর বিশ্বাস।

গ্রামে ঢোকার মুখে পড়ে সেখানকার হাড়িরামী আশ্রম। মাঝখানে একটা ছোট পাকা ঘর। তারমধ্যে আছে বলরামের খড়ম এবং কাঠের খাটিয়ায় সুবিন্যস্ত শয্যা। আশ্রমের পশ্চিমদিকে আছে এই সম্প্রদায়ের সমাধিস্থান। কবরের পাশে এক ছোটখাট বাগুড়, স্নানের জায়গা। পূর্ব দিকে একটি বটগাছ। তার তলায় একটি মাটির ঘর। সেখানে ব'সে ভক্তরা প্রত্যহ গান করেন। আশ্রম সংলগ্ন অংশে আছে দুর্গাদাস মোহান্ত-র সমাধি। ষাটের দশকের গোড়ায় তিনি মেহেরপুরের রাখাল বাউলের কাছে হাড়িরামী-মতে দীক্ষিত হয়ে এই অঞ্চলে গ'ড়ে তোলেন আশ্রম ও ভক্ত সম্প্রদায়।

দুর্গাদাস পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের ব্যাপক অংশের মধ্যে, বিশেষত হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের কাছে, এক জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নাম। এসব অঞ্চলে হাড়িরামের নাম তিনিই বয়ে আনেন। দৈকিয়ারী আশ্রম তাঁরই অসামান্য কীর্তি। শিষ্যসংগ্রহ ও হাড়িরামীদের সংগঠনে দুর্গাদাস খুব উদ্যমী ছিলেন। অনেক গানও তিনি লেখেন নানা বিষয়ে। মূলত গান্ধীবাদী মানুষটি হরিজন আন্দোলনে দীর্ঘদিন ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৮২ সালে ৫৮ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়। দুর্গাদাসের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে 'সরকার' হন তাঁরও অকালমৃত্যু ঘটে। এখন দৈকিয়ারি আশ্রম পরিচালনা করেন দুর্গাদাসের কনিষ্ঠ সন্তান কান্ত বাউড়ি ও পুত্রবধূ রমা বাউড়ি। বছর বছর গড়ে ৫/৬ জন এঁদের উদ্যমে হাড়িরামের ধর্মে দীক্ষিত হন। এখানকার হাড়িরামের আশ্রম খুব জমজমাট। সেবা, পূজা, উৎসব ও নামকীর্তন খুব সমারোহে চলে। বিশ্বাস ও ভক্তি এখানে দেখার মত। এখানে প্রতিবছর তিনটি মহোৎসব হয়। জ্যৈষ্ঠ একাদশীতে ফলের উৎসব, কার্তিক একাদশীতে নবান্ন এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে মহামিলন।

দৈকিয়ারি গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ বাউড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত, বাকিরা জাতে কুর্মি। অধিকাংশ মানুষ দিনমজুর। সামান্য চাষবাসের জমি কারুর কারুর আছে। ইদানিং কেউ কেউ পাচ্ছেন রেশনের ডাবরি। গ্রামের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ নয়।

এখানকার উল্লেখযোগ্য হাড়িরামীদের নাম: প্রকাশ, বিকাশ, সুভাষ রামসেবক, কান্ত, ব্রজদাস, জগন্নাথ, সদানন্দ, বসন্ত, বিবেচনা, খোকন, রমা কল্যাণী, বিমল, যুধিষ্ঠির, বালিকা, গান্ধারী, গোবিন্দ, বলরাম, কড়িপদ, করুণা, তরুবালা। সকলেরই উপাধি হলো বাউড়ি।

শালুনি

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার রাস্তা গাড়ি দিয়ে পৌঁছানো যায় কাঁটিপাহাড়ি। সেখান থেকে পাকা সড়ক ধ'রে তিন কিলোমিটার হাঁটলে পাওয়া যায় শালুনি গ্রাম। এখানে হাড়িরামের আশ্রম স্থাপন করেছেন রামনাথ গোপাল সাধু। শালুনির মানুষজন জানান: রামনাথ নিশ্চিন্তপুর ও ধাওয়াপাড়া থেকে অনুমতি এনে আশ্রম খোলেন। দৈকিয়ারি থেকে জানা যায় অন্যরকম তথ্য। রামনাথ ওরফে রামগোপাল সাধু মূলে ছিলেন দুর্গাদাস মোহান্ত-র শিষ্য এবং শালুনির বাসস্থান ছেড়ে তিনি চলে যান দৈকিয়ারি। সেখানে তিনি পুনর্বিবাহ করেন তারপর দুর্গাদাস-রামনাথ এই দুই গুরু-শিষ্য বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বর্ধমানে বহু দুর্গম গ্রাম পরিক্রমা ক'রে হাড়িরামের ভক্ত শিষ্য জোগাড় করেন। অনেক সভাসমিতিও করেন আদিবাসী অন্ত্যজদের উন্নয়নের স্বার্থে। তাতে কিছুটা রাজনৈতিক রং ছিল। দুর্গাদাস ও রামনাথ ছিলেন কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট। রাজনৈতিক কিছু দল তাঁদের বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন। কারণ দুর্গাদাসদের হাতে ছিল ভোট ব্যাঙ্ক। পরে কোন কারণে গুরু-শিষ্যে বিবাদ হয়। তার ফলে রামনাথ দৈকিয়ারি আশ্রম ত্যাগ ক'রে এসে শালুনিতে আলাদা হাড়িরামের আশ্রম গড়েন ষাটের দশকে। পরিত্যক্ত সংসারের সঙ্গে সংযোগ ঘটে আবার। অবিলম্বে সারা গ্রামে তাঁর প্রভাব খুব ব্যাপক হলো। অনায়াসে বাউড়ি সম্প্রদায়কে তিনি দীক্ষিত করলেন বলরামের মতে। রামনাথ মারা যান সত্তর দশকের মাঝামাঝি। এখন এখানকার 'সরকার' প্রেমচন্দ্র। এখানকার আশ্রমে নিয়মমত তিনটি বাৎসরিক উৎসব হয়।

শালুনিতে বাউড়ি ছাড়া আছেন কিছু সাঁওতাল পরিবার। স্বাভাবিক জীবিকা দিন-মজুরী। জমি সাধারণভাবে চাষের উপযোগী নয় বলে এখানকার মানুষজন রাস্তা তৈরি ও বাড়ি তৈরির কাজে শ্রমজীবী। তবে সকলেই বিশ্বাসী হাড়িরাম ভক্ত। প্রতিসন্ধ্যায় হাড়িরামের নাম গান তাঁদের অবশ্যকৃত্য। নতুন শিষ্য করা হয় একমাত্র উৎসব উপলক্ষে।

শালুনির শ'তুয়েক নারীপুরুষের মধ্যে উৎসাহী উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম: অনিল, জ্যোতি, মন্মথ, নবল, অজিত, সুধীর, মন্টু, বীরেন। সকলেই বাউড়ি। এছাড়া আরেকজন বিশিষ্ট হাড়িরামের ভক্তের নাম: হিংমাত মাল।

বিশেষ মন্তব্য

ইতিহাসের আশ্চর্য পরিহাসে মেহেরপুর নিশ্চিন্তপুরের মূল আশ্রম এখন ধ্বংসপ্রায়। আধুনিক সভ্যতা ও নগরজীবনের সংক্রামে এই দুই জায়গায় হাড়িরামীদের সংখ্যা কমছে। অন্যদিকে সেই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার তপসিলীদের মধ্যে। হাড়িরামকে তাঁরা নিয়েছেন পরিত্রাতার ভূমিকায়। এমনকি তাঁর নাম ও স্থানমাহাত্ম্যে রোগ আরোগ্যের কিংবদন্তী বেশ প্রচলিত এ অঞ্চলে।

বলরাম তাঁর ধর্মমত গ'ড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজ অঞ্চলের কিছু অন্ত্যজ অবমানিত মানুষদের নিয়ে। এক শতকের ব্যবধানে সেই মানুষ আর তাঁর পরিকল্পিত ধর্মতত্ত্ব ভক্তিভরে পরম বিশ্বাসে জীবনে গ্রহণ করেছেন সম্পূর্ণ আরেক সুদূর অঞ্চলের অনুন্নত জনসমাজের একটি অংশ। বাংলার লৌকিক গৌণধর্মের ক্ষেত্রে এমন ভ্রাম্যমানতার অন্য উদাহরণ আর নেই। দৈকিয়ারি ও শালুনিগ্রামের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের হাড়িরাম মন্ত্রে কিভাবে সমাজ ও রাজনীতি বিষয়েও টেনে আনার চেষ্টা হয়েছে তার এক কৌতূহলপ্রদ প্রতিবেদন পাওয়া যাবে নীচের দুটি বিজ্ঞপ্তিতে। বিজ্ঞপ্তি দুটি যথাক্রমে ১৩৫২ আর ১৩৫৩ সালের দুটি সভানুষ্ঠানের। এতে উল্লিখিত মানুষগুলির নাম, পদবী ও বাসস্থানের নাম এমন কি বানান বহুকিছুর দ্যোতক।

বিজ্ঞপ্তি ১

হাড়ি ও সত্য একক ব্রহ্ম

হাড়িরামকে

"চাওয়ার মত চাইলে পাও"

এই উক্ত উক্তি অধুনা নয়। তাই কায়মন হৃদয় আত্মার একান্ত মর্মীক প্রাণ নিয়ে বলতে হবে সাধনায়।

"কায়মন ভরি যত দুঃখ দিবে দাও,
তবু তোমায় যেন পাই সাধনায়।"

পরমাত্মা হাড়িরাম বাবা, যুগে যুগে আবির্ভূতা হয়েছেন যখনি এই সংসাররূপ জগতে দীনের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার অকথ্য উক্তি তখনি আবার দর্শন পেয়েছি। এমনি এক আবির্ভূত দিনে প্রাতঃস্মরণীয় ও বরণীয় হাড়িরাম বাবাকে দর্শন করিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছি। সেইদিন যেদিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন যাহা বহু কষ্ট অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। ৯ই চৈত্র হইতে ১১ই চৈত্র ১৩৮৬ সাল এই তিন দিন ব্যাপিয়া হাড়িরাম বাবার মহোৎসব হইবে।

অতএব এই উৎসবে আপনারা দলে দলে সবান্ধবে যোগদান করিয়া শত শত জীবনকে আনন্দময় ও সার্থক করিয়া তুলুন। আপনাদিগকে প্রত্যেককে সাদর আহ্বান করিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র জ্ঞাপন।

নিবেদন ইতি

শ্রী দুর্গাদাস মাহাত (পরিচালক), শ্রীরামনাথ গোপাল সাধু (পূজারী)
শ্রীযতি বাউল, শ্রীরামেশ্বর বাউল, শ্রী শ্রীপতি বাউল (গায়ক), শ্রীরাম বাউল।

প্রেসিডেন্ট—হারাধন মাঝি
সেক্রেটারী—ধরণীধর মাঝি
প্রাধ্যক্ষিক—প্রফুল্ল মাঝি
পোস্ট-পককোটরাজ কাশীপুর
দৈকেয়ারী আশ্রম, জেলা পুরুলিয়া
হরিজন কেন্দ্র।

বিজ্ঞপ্তি ২

ওঁ

হরিবোল

"ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মৈক সত্য সনাতনঃ"

জগতের মহাত্মন সহোদরগণের প্রতি বিনীত নিবেদন, এতদ্বারা জানাই ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শালুনী গ্রামে জগতের মানব সমাজের মধ্যে হরিজন সমাজের একটি বিরাট দীন সভার আয়োজন করিয়াছি। ছত্রিশ বর্ণের পদবীর ভাই ভগ্নীগণ ও মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণকে উক্ত সভাতে দলে দলে যোগদান করিতে অনুরোধ জানাই। উক্ত সভাতে ধর্ম, শিক্ষা, দীক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। উক্ত সভাতে আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

উক্ত সভাতে যোগদানকারীগণ :—বাঁকুড়া জিলাশাসক, কংগ্রেস কমিটির সভাপতি (বাঁকুড়া) সেক্রেটারী, ডাঃ রামগতি ব্যানার্জি এম. পি, ডাঃ অনাথবন্ধু রায় (স্বাস্থ্যমন্ত্রী), শ্রী নেপালচন্দ্র বাউরি এম. এল. এ, কমলাকান্ত হেমব্রম এম. এল. এ, বাঁকুড়া স্পেশাল অফিসার। ইনারা রাজনৈতিক আলোচনা করিবেন।

সত্য সনাতন দেঘুরিয়া (ছাতনা), অনিলবরণ মুখার্জী (বাঁশিপাহাড়ী), রাইচরণ মণ্ডল (পেচাশিমুল), দুর্গাদাস মহান্ত (বৈকেয়ারী) ইহারা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

শক্তিপদ কুণ্ডু (বাঁশিপাহাড়ী), মহাদেব কুণ্ডু (ঐ), আশুতোষ কুণ্ডু (ঐ), তারাপদ কুণ্ডু (ঐ) অনাথবন্ধু দেশমুখ (আড়রা) মন্মথ বাজপেয়ী (শালুনি) নারান সেন (ছাতনা), হীরালাল চট্টোপাধ্যায় (জোড়হিড়া), বলরাম মণ্ডল (ঐ), ডাঃ জ্যোতিলাল চৌধুরী (শুশুনিয়া) শিদির কর্মকার (ঐ), ফণীনাথ চট্টোপাধ্যায় (বেলাকুড়ি), রমানাথ চক্রবর্তী (জোড়হীড়া এম. পি. হাইস্কুল) ইনারা বেদনীতি আলোচনা করিবেন।

আনন্দ বাউরী (বাশিডি) মধু বাউরী (ফুলকড়া) রাধানাথ বাউরী (জোনানী) কালিদাস বাউরী (আমপাহাড়ী) হরিপদ বাউরী (গোয়ালডাঙ্গা) বারাণসী বাউরী (আলিকাড়া) ভবতারণ বাউরী (ফুলদা) রামনাথ বাউরী (এখ্যানী)

লক্ষণ বাউরী (তত্তনিয়া) সূর্য্য বাউরী (ছাতনা) নকুল বাউরী (জিড়রা)
গোরাচাঁদ বাউরী (কমলপুর) গোষ্ঠ বাউরী (বান্দরডিহা) গৌউর বাউরী
(আড়রা) গোপাল বাউরী (বিজনা) শংকর বাউরী (কাঁটিপাহাড়ী) রবি
বাউরী (করকটা) জয়রাম বাউরী (রাতড়া) রামেশ্বর বাউরী (শালুনী)
ক্ষুদিরাম বাউরী (শালুনী) রবি লোহার (শালুনী) মঙ্গল মাল (খড়বনা)
ভবতারণ মুচি (বেষড়া) সাধুচরণ লোহার (ঘোলবনা) মন্টু বাউরী (শালুনী)
কারানচন্দ্র হেমব্রম (মালবেড়্যা) তারাপদ হাঁসদা (জামথোল) দশরথ মাণ্ডি
(শালুনি) মূনসের সরেন (জয়নগর) নন্দলাল মুর্মু (সিহিকা) কালিচরণ
হাঁসদা (গোপীনাথপুর) ইহারা উৎসাহ দাতা।

দুর্গাদাস মহান্ত (দৈকেয়ারী) সিপতি বাউল (মেট্যালশহর) সিবাস বাউল
(বেসড়া) মল্লিকা মহান্ত (গুরুমাতা) মথুর লোহার (শালুনী) আকুল লোহার
(শালুনী) বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার (শালুনী) ইহারা হাড়িরামের গুণগান গীত
গাহিবেন।

সময় সূচী :—২৫শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৬টা হইতে ২৬শে সকাল ৭টা পর্যন্ত রাম
রাম নাম সংকীর্তন।

২৫শে ৭টা হইতে ৮টা হাড়িরাম গুণাগুণ গীত। (সভামধ্যে)
৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত সভাকার্য্য অনুষ্ঠিত।

সভাস্থল :—শালুনী হাসপাতাল প্রাঙ্গন। রোড পার্শ্ববর্তী।

নিবেদন ইতি—
গুরুর শ্রীচরণের দাস

আমার গুরুজী—	শ্রী রামগোপাল সাধু।
দুর্গাদাস মহন্ত	গ্রাম—শালুনী।
আশ্রম—দৈকিয়ারী।	পোঃ—কাঁটিপাহাড়ী।
	জেলা—বাঁকুড়া।

পরিশিষ্ট ২

উনিশ শতকের প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলায় বলরাম হাড়ি যে-গৌণ ধর্মের পরিকল্পনা করেছিলেন তার উদ্ভবের কারণ যাই হোক, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন প্রতিবাদের একটি স্পষ্ট লক্ষণ। বলরামের মত একজন অন্ত্যজ দরিদ্র মানুষের পক্ষে উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজে প্রতিবাদী চরিত্র গ'ড়ে-তোলা বা টিঁকিয়ে রাখা কঠিন ছিল। তবে বলরাম-সংক্রান্ত জনশ্রুতিমূলক কাহিনীগুলি গূঢ়ভাবে পর্যালোচনা করলে একধরনের প্রতিবাদ, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, উদ্যত দেখা যায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ১৯৫৫ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে 'Socio-Religious Movements of Protest in Medieval India : a synoptical view' নামে যে-নিবন্ধ পেশ করেন তাতে বলরামী ধর্মের প্রতিবাদ প্রবণতার উল্লেখ করেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত হলো।

> There was in the eighteenth century too, a good number of heterodox, protestant sects, all more or less critical of caste distinctions spread all over northern India : The Kartabhajas and Balaramis of Bengal, Daria Sahebs of Bihar, the Sivanarayanis of Balia, the Satnamis of Oudh and Madhya Pradesh, Charandasi of Delhi and Alwar, for instance, (pp LXIV)

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায় ১ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় দীনেন্দ্রকুমার রায় 'নদীয়া জেলার সিদ্ধযোগী' শিরোনামে বলরাম হাড়ি সম্পর্কে যে-নিবন্ধ লেখেন তাতে বলাহাড়ির ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষ ও উচ্চবর্ণের জাতি সংস্কার বিষয়ে প্রচ্ছন্ন কৌতুক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দুটি কাহিনীতে। কাহিনী দুটির ঘটনাস্থল মেহেরপুর। দীনেন্দ্রকুমার সেই মেহেরপুরের সন্তান। কাহিনী দুটি

তাঁর সংগৃহীত। এখানে তাঁর লেখার ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রেখে কাহিনী দুটি পুনর্মুদ্রিত হলো।

প্রথম কাহিনী

বলরামচন্দ্র বিদ্রূপপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্রূপে তীব্রতা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহাতে মনে আঘাত পাইত না। মেহেরপুরের অনতিদূরে ভৈরব নদের পশ্চিম পারে সুবল চৌধুরী নামক এক চর্মকার বাস করিত। কর্মচারিগণের সহায়তায় সে চর্মের ব্যবসায় করিত। দেব-দ্বিজে তাহার ভক্তি ছিল, এবং তাহার অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। সুবল চৌধুরী বৎসরান্তে কালী-পূজা করিত, এই উপলক্ষে সে তাহার প্রতিবেশী কোন উচ্চবর্ণের ভদ্র লোকের বাড়িতে গ্রাম্য-ভদ্রলোকদিগের আহারাদির আয়োজন করিত, কিন্তু সে-সময় সমাজের বন্ধন এ কাল অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল বলিয়া, ভদ্রলোকের বাড়িতে ফলা-হারের আয়োজন হইলেও, হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। একদিন বলরামচন্দ্র কালীপূজার পরে একজন ব্রাহ্মণবংশীয় প্রৌঢ়কে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুবল চৌধুরী এবার আপনাদের খাওয়াইল কেমন?' বলরামের কথা শুনিয়া তিনি সরোষে বলিলেন, 'বলাই, তুমি কোন্ সাহসে আমাকে এমন জাতিনাশা কথা বলিতেছ? তুমি কি মনে কর, চামারের নিমন্ত্রণ লইয়া আমি তথায় খাইতে যাইব?' বলরামচন্দ্র বলিলেন 'ঠাকুর এত চটিলে চলিবে কেন? আপনার জাতি নষ্ট হইতে পারে, এমন কথা কি বলিয়াছি? আপনার মা, যাহার বাড়িতে গিয়া অনায়াসে খাইয়া আসিতে পারেন, তাহার বাড়িতে পাত পাড়িলে আপনার জাতি যাইবে, এ কিরূপ কথা? জাতি যাইবার ভয় যদি এত অধিক হয়, তাহা হইলে আগে মা কালীকে একঘরে করুন, তিনি যখন সুবল চৌধুরীর বাড়িতে গিয়া পূজা খাইয়াছেন, তখন আর তাঁহার পূজা করা আপনাদের উচিত নহে।'

দ্বিতীয় কাহিনী

মেহেরপুরের মালোপাড়ার নদীতীরবর্ত্তী নির্জ্জন ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া বলরামচন্দ্র যে সময় পরমার্থচিন্তায় রত ছিলেন, সেই সময় মেহেরপুরের কোন জমীদারের অত্যন্ত প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, সে সময় তাঁহার সদর দেউড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণে বা পাল্কী চড়িয়া যাইতে সাহস করিত না। কথিত আছে, তিনি একে ব্রাহ্মণ তাহাতে জমীদার; সুতরাং কেহ তাঁহার সম্মুখে পড়িলে, সে অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইত না। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহ্ণে তাঁহার অট্টালিকা-দেউড়ীর বাহিরে কাষ্ঠাসনে বসিয়া বায়ুসেবন করিতে করিতে পারিষদবর্গের সহিত নানাবিধ গল্প করিতেন। এক দিন প্রভাতে পারিষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া যথাস্থানে বসিয়াছিলেন, সেই সময় বলাই নামক বলরামের একজন শিষ্য আখড়া হইতে বাহির হইয়া দেউড়ীর সম্মুখ দিয়া কার্য্যোপলক্ষে বাজারে যাইতেছিল। বলাই জমীদার মহাশয়কে প্রণাম না করায় তাঁহার একজন পারিষদ তাঁহাকে বলিল "হুজুর, বলা হাড়ীর চেলাদের আস্পর্দ্ধা বড় বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ দেখুন, তা'র একটা চেলা, আপনার সম্মুখ দিয়া গেল, অথচ আপনাকে দেখিয়া মাথাটা পর্য্যন্ত নোয়াইল না; ঘোর কলি উপস্থিত!" জমীদার বাবুর আদেশে তাঁহার দুইজন বলবান পাইক বলাইকে ধরিল, এবং তাহার দুই কর্ণ ধরিয়া তাহাকে বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। বলাই অত্যন্ত বলবান ছিল; কিন্তু সে বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ করিল না। সে পূর্ব্ববৎ উন্নত মস্তকে জমীদার বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সে কেন জমীদার বাবুকে প্রণাম করে নাই এই প্রশ্নের উত্তরে সে অত্যন্ত সংযত ভাবে বলিল "আপনি জমীদার, অন্যে আপনাকে প্রণাম করিতে পারে, কিন্তু আমি বলরামচন্দ্রের দাসানুদাস, তাঁহার পায়ে আমি মাথা রাখিয়াছি, তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি প্রণাম করি না, আর কাহারও চরণে এ মাথা নোয়াইব না।" বলরামের অনুচরের এই কথা শুনিয়া জমীদারবাবু ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে ভৃত্যগণ বলাইকে ধরাধরি করিয়া বংশদণ্ড দ্বারা তাহাকে এমন প্রহার করিল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। তথাপি সে জমীদারবাবুকে প্রণাম

করিল না। অনেক ক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলাই অতি কষ্টে বলরামের আখড়ায় ফিরিয়া গেল।

বলরামচন্দ্র তাঁহার প্রিয় শিষ্যের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলাই তোর কি হইয়াছে? সর্ব্বাঙ্গে ধূলা, শরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে, তুই চলিতে পারিতেছিস না, এমন অবস্থা তোর কে করিল?"

বলাই বলরামের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল; কাঁদিয়া সকল কথা বলিল। বলরামের বিস্ময় সমধিক বর্দ্ধিত হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি করিয়াছিস যে তাহারা তোর প্রতি এমন অত্যাচার করিল?"

বলাই বলিল, "অন্যায় কিছু করি নাই, আমাকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া আমাকে প্রণাম করিতে বলিয়াছিল, আমি প্রণাম করি নাই। আমি ইচ্ছা করিলে তাহার মুণ্ড ছিঁড়িয়া আনিতে পারিতাম, কিন্তু আপনার আদেশ ভিন্ন আমি কিছুই করিতে পারি না। এখনও আপনার আদেশ পাইলে দলবল লইয়া তাহার বাড়ী লুট করিতে পারি। আপনার কি আদেশ বলুন; আপনি প্রভু, আপনাকে ইহার বিচার করিতে হইবে।"

বলরামচন্দ্র বলাইকে শান্ত করিবার জন্য মধুর বাক্যে বলিলেন, "বলাই, তুমি আজ বড় যাতনা পাইয়াছ, তাই তোমার কষ্ট হইয়াছে। জমীদার বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছে। তুমি আমার কাছে এই অন্যায়ের বিচার প্রার্থনা করিতেছ; কিন্তু আমি কি বিচার করিব? মানুষ কি মানুষকে এমন করিয়া মারিতে পারে? এমন অত্যাচার কি মানুষের কায? আমি ত তোমাদের অনেকবার বলিয়াছি, মানুষ মানুষকে ভালবাসে, অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করে, সদ্ব্যবহারে অন্যের হৃদয় জয় করে; অন্যের দুঃখমোচন, অন্যের উপকারসাধন মানুষের ধর্ম্ম; মানুষের দেহ লইয়া যে সেই ধর্ম্ম পালন না করে, সে মানুষ নহে। তাহার বিচার কি করিব? আজ যদি তুমি কোন বনে গিয়া বাঘের হাতে পড়িতে, সেই বাঘ যদি তোমাকে কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিত, তাহা হইলে কি তুমি, আমার কাছে সেই বাঘের নামে নালিশ করিতে আসিতে? তুমিও মনে কর, তোমাকে বাঘে ধরিয়াছিল। তুমিও সকল ক্ষোভ ত্যাগ কর, কখনও তাহারও কোন ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিও না। অন্যের ক্ষতি করা মানুষের ধর্ম্ম নহে। আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম, তুমিও তাহাকে ক্ষমা কর।"

বলরামচন্দ্র সস্নেহে বলাইকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলেন; বলাই মনঃক্ষোভ ত্যাগ করিল।

নির্দেশিকা